ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

অষ্টম বর্ষ ■ শারদ সংখ্যা ■ আশ্বিন ১৪২৫ ■ অক্টোবর ২০১৮

অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি

- ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক
- নিপা ভাইরাস সংক্রমণ
- নিষ্কৃতি মৃত্যু
- গোরু কেন্দ্রিক রাজনীতি
- বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

- গোরিলাদের দেশে
- ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক
- গণিতজ্ঞ শ্রেষ্ঠা হাইপাসিয়া
- তিন তালাক বিষয়ে
- শোনপুর মেলা

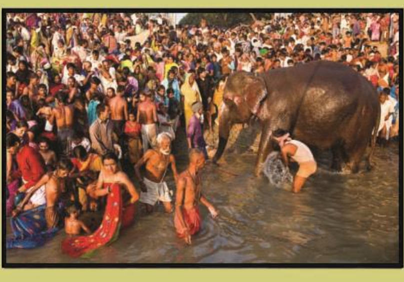

দেশদ্রোহী ?

সুধীর ধাওয়ালে
দলিত নেতা ও প্রকাশক

সুরেন্দ্র গ্যাডলিঙ
মানবাধিকার আইনজীবী

অধ্যাপিকা সোমা সেন
সমাজসেবী

অধ্যাপক রোনা উইলসন
মানবাধিকার কর্মী

সুধা ভরদ্বাজ
মানবাধিকার ও সমাজকর্মী

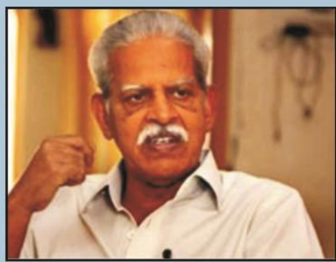

অধ্যাপক ভারভারা রাও
কবি ও সমাজকর্মী

অধ্যাপক মহেশ রাউত
জনজাতি সংগঠক

ফাদার স্ট্যান স্বামী
মানবাধিকার ও উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের নেতা

গৌতম নওলাখা
সাংবাদিক ও গবেষক

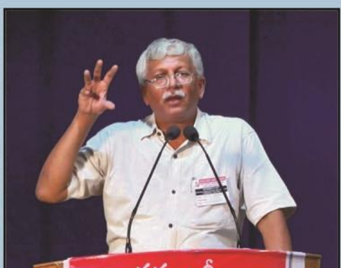

অধ্যাপক ভার্নন গনজালভেস
লেখক ও সমাজকর্মী

অধ্যাপক অরুণ ফেরেইরা
আইনজীবী ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী সংগঠক

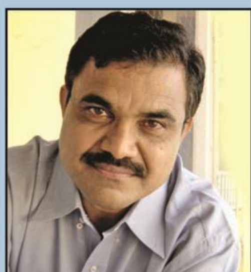

অধ্যাপক আনন্দ তেলতুম্বড়ে
দলিত আনেন্দালনের সংগঠক

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

ISSN : 13660

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

অষ্টম বর্ষ ● শারদ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪২৫ ● অক্টোবর ২০১৮

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভময় দত্ত, সোমনাথ চৌধুরী, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, অরণি সেন

উপদেষ্টামণ্ডলী : সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, ৩৮ ইউ সুলতান আলম রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩
অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, এস-১৮ বিদ্যাসাগর ভবন, ১০ রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
রূপক ঘোষ, পশ্চিমপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম-৭৩১২৩৫
সনৎ রায়চৌধুরী, ফুলপুকুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১
জয়া মিত্র, এ.এস.-৩/২৮/২ কল্যাণপুর হাউসিং বোর্ড, আসানসোল-৭১৩৩০৫
কমলেন্দু চক্রবর্তী, ২৩৩ পীরগাছা, বামুনমুড়া রোড, পোঃ বাদু, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৮
কমল চক্রবর্তী, ভালোপাহাড়, পোঃ লতা, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া-৭২২১৩৬
পীযুষ সরকার, আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, বাঁকুড়া-৭২২১৩৬
অনিতা মজুমদার, ২৫ডি.এল.রায় সরণী, মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০১
তৃপ্তি সান্ত্রা, এয়ারভিউ কমপ্লেক্স, মহেশমাটি, ইংরেজ বাজার, মালদা-৭৩২১০১
মৈনাক মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডুপুকুর, বর্ধমান-৭১৩১০১
দেবাশিষ দত্ত, ৮, রাজা গুরুদাস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
পুণ্যব্রত গুণ, এইচ. এ.৪৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৭
সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮/৩, সমবায় পথ, পোঃ নবনগর, হুগলী-৭১২২৪৬
বরুণ সাহা, চৌপথি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার-৭৩৬১৪৬
সুমন গোস্বামী, কলেজ রোড, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২
জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪
সুদেব সাহা, মিলন পাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪
পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেণ সেন সরণী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
শুভম ভট্টাচার্য্য, গীতাঞ্জলি মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
সুমনা গুপ্ত, ৩৬/১, মধুপুর রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
সুদেষ্ণা রায় চৌধুরী, ১৯/১ বি.এ.সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
সুনীল সোরেন, লাল কুঠি পাড়া, সিউড়ি, বীরভূম-৭৩১১০১
অরুণ সেন, সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৩২৯
বিজন ভট্টাচার্য্য, রেলওয়ে নিউমার্কেট, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩২৯
ষড়ানন পাণ্ডা, গ্রাম : এঁড়াল, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৪৪
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য, গ্রাম : কাঁঠালপুলি, পোস্ট - চাকদহ, নদীয়া-৭৪১২২২
প্রবীর পাল, ১৯/২, ভোলানাথ নন্দী রোড, হাওড়া-৭১১১০৪
ফণিগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প, ৫, জি.টি. রোড, হাওড়া-৭১১২০২
ভবানী প্রসাদ সাহু, গ্রাম : ঘোলে, পো : চাউলপট্টি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৫৫
জাতিশ্বর ভারতী, সুখসাগর এপার্টমেন্টস্, শিয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
রঞ্জন আচার্য্য, রবীন্দ্রপল্লী, পুরুলিয়া-৭২৩১০১
নির্মলেন্দু নাথ, ১০৮ ব্যানার্জী পাড়া রোড, নৈহাটি, উঃ ২৪ পরগনা- ৭৪৩১৬৫
প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, বিজলি চক, কালিবাড়ি, রায়পুর, ছত্তিশগড়-৪৯২০০১
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বি/এল ৭৬, ভি.এস.এস. নগর, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা-৭৫১০০৭
সমিত কুমার কর, ১০১১ শতলেজ বিজয়া শতাব্দী, সোনারী, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড-৮৩১০১১
সোমেন চক্রবর্তী, পি৫৩, সুরুচি অ্যাপার্টমেন্টস্, দ্বারকা, নিউ দিল্লী-১০০০৭৫
রাহুল মুখোপাধ্যায়, বি ৯৫ এস. এস., বার্মিংহাম হার্টল্যান্ডস্ হসপিটাল, বার্জসলে গ্রীন ইস্ট, ইউ. কে.
কৌশিক সেন, স্পোর্টিং ক্লাব ড্রাইভ, র‍্যালে, নর্থ ক্যারোলিনা, ইউ.এস.এ.

প্রচ্ছদ : কলাভবন; **বর্ণসংস্থাপন :** তন্ময় ভট্টাচার্য্য

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, সৌমিত্র সাহা, অর্ঘ্য মিত্র ও নয়নতারা বিশ্বাস

পরিবেশনা : অমিতাভ সেনগুপ্ত, প্রদীপন গাঙ্গুলী, অয়ন ঘোষ, শাহজাহান সিরাজ, অভিজিৎ সেন, সূরজ দাস, নীলকণ্ঠ আচার্য

যোগাযোগ : **ssunnayan@gmail.com || www.ssu2011.com**

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৩
- নোট বন্দী, কি যে ফন্দি?
- আরবান নকশাল?
- বোমারু বাংলা?
- সমকাম অপরাধ নয়!

স্মরণিকা ৫
- উইনি মাদিকিজেলা ম্যাণ্ডেলা ● লিণ্ডা ক্যরল ব্রাউন ● সৈয়দ শুজাত বুখারি ● রমাপদ চৌধুরী ● মাদিহা গওহর ● বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নয়পল ● রাজিন্দার সাচার ● সামির আমিন ● কুলদীপ নায়ার ● ভাস্কর নন্দী ● বেলাল চৌধুরী ● সুরেন্দ্র নিহাল সিং ● অশোক মিত্র ● অরবিন্দ গুহ ● সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ● মাধাই সামন্ত

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ১১
- দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ● করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ● দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রধান রচনা ১২
- ট্যারেন্টুলা : রজ্জুতে সর্পভ্রম — শুভেন্দু বাগ
- নিপা ভাইরাস রোগ নিয়ে কিছু কথা — স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মৃধা

বিশেষ রচনা ১৭
- অসমীয়া জাতিসত্তা রক্ষা বনাম নাগরিকত্ব রক্ষা — অমিতাভ সেনগুপ্ত
- অসমে এন.আর সি : বিজেপি বনাম আসু, অগপ ও অন্যরা — হিমন্ত হইকিয়া
- সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় সংহতির বিকৃত মডেল— ভারতের বুকে পুনর্বিভাজনের পূর্বাভাস — বাপ্পাদিত্য রায়

ব্যক্তিত্ব ২৪
- অটলবিহারী বাজপেয়ী
- মুথুভেল করুণানিধি
- কোফি আট্টা আনান

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ২৬
- হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে লড়াই এখনই — এস. কে. সারিন
- শিশুর মনোবিকাশ জনিত জটিলতা অটিজম — কুন্তল বিশ্বাস
- পশ্চিবাংলার একটি সাপের বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র অবশ্যক কেন? — দয়াল বন্ধু মজুমদার
- LEGAL RECOGNITION OF PASSIVE EUTHANASIA - A CATECHISM — Tapas Bhattacharya

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৩৭
- ছাত্র ও শিক্ষক যেন ফুল ও ফুলবাগানের মালি — দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
- একটি প্রাচীন আলাপচারিতা — জয়দেব গুপ্ত
- কলিম খান : এক অনন্য তপস্বী — অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৪৩
- মৃত্যুপুরিতে জন্ম নেওয়া এক ইতিহাস — অমিতাভ চক্রবতী ও সোমনাথ চৌধুরী
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা : গোড়ার কথা — দীপককুমার দাঁ
- সাপের কামড় সংক্রান্ত চিকিৎসা নিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি — দীপককুমার দাঁ

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৪৯
- পাহাড়ি গোরিলার দেশে— মিতালি সরন ● দার্জিলিং-কালিম্পং-এর বনবাসী আন্দোলন : উন্নয়ন বনাম অধিকার — সুমন গোস্বামী
- ভাঙতে ভাঙতে গড়ার বাঁধনে বিপন্ন সুন্দরবন — সুভাষ মিস্ত্রী
- National Convention on Save River Save Life – A Report— Tapas Das & Tapan K. Mishra

অর্ধেক আকাশ ৬১
- বর্বরতার আঁধারে শিহরিত আলোকশিখা : হাইপাসিয়া এবং ... — অঙ্কিতা সেনগুপ্ত ● তিন-তালাক বন্ধে স্বস্তি, তবে আরো লড়াই বাকি — খাদিজা বানু ● মুক্তি সংগ্রামের উপেক্ষিত নায়িকা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার — ফটিক চন্দ্র দে

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৬৭
- পোশাক শিল্প : বাংলাদেশ — নির্ম্মলেন্দু নাথ
- গোরু কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিপন্ন ভারতীয় সমাজ ও মানবিক ঐতিহ্য— প্রশান্ত সেন
- মানবতাবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাই ধর্মীয় বর্বরতা দূর করার একমাত্র পথ — ভবানীপ্রসাদ সাহু

অর্থনীতি ৭৯
- অর্থনীতির হালহকিকৎ — সংকলন : বুনো রামনাথ

কবিতা ৮১
- মিছিলের মাঝপথে — মুঁকুল বসু
- এ দেশ তোমার নয়.... : উৎসর্গ আসিফা বানো —মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া
- একটি গানের কথা — রেহান কৌশিক

মেডিকেলের অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের

সাহিত্য ৮২
- পোষ্য — মূলরচনা : ভগবতী চরণ বর্মা ভাষান্তর : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ভ্রমণ ৮৫
- পুরুচোখে দেখা পুরুলিয়া — পার্থময় চট্টোপাধ্যায়
- পণ্যভূমে পুণ্যমেলা প্রাঙ্গণে — দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
- মেঘালয় : স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটনে এক নতুন দৃষ্টান্ত — শুভময় দত্ত

শিল্প-সংস্কৃতি ৯৫
- জনতার সাহিত্য উৎসব : বস্তার সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (কলকাতা চ্যাপ্টার -২০১৮) — মৃদুল কান্তি সরকার

চিঠিপত্র, রিপোর্ট ৯৭
- Citizens' Statement on Police Violence Against Sterlite Protestors in Thoothukudi
- Trade Unions Meet to Counter Trade and Investment Liberalisation
- Joint Statement condemning arrest of activists and public intellectuals
- Solidarity to the Students Movement in Bangladesh

খবরাখবর ১০৩

সম্পাদকীয়

নোট বন্দী, কি যে ফন্দি?

''সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে - সব নদী-ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;...''

— জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতা থেকে

''ফুলগুলি কেথায় গেল
কতদিন কেটে গেল
ফুলগুলি কোথায় গেল
কতদিন হল...
বল আর কবে খুঁজিবে...''

— পিট সীগারের 'হোয়ার অল দ্য ফ্লাওয়ার্স হ্যাভ গন' অবলম্বনে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ফুলগুলি কেথায় গেল' গান থেকে

কালো টাকা কোথায় গেল? জাল টাকার কি হল? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কবে উত্তর দেবেন? 'ধনী, সম্ভ্রান্ত' কাশ্মীরী পন্ডিত গান্ধী পরিবারের 'জনপ্রিয়' 'ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ' পদক্ষেপের সাথে একদা দরিদ্র পিছড়ে বর্গের চা বিক্রেতার 'বিমুদ্রাকরণ' চমকের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতা আমাদের জানা নেই, জানার প্রয়োজনও নেই। আমরা চাই সুস্থির ও শক্তিশালী অর্থনীতি। সেই লক্ষ্যে নোটবন্দী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর যা ছিল স্বগর্ব ঘোষণা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে তা অসাড় প্রমাণিত হয়েছে। কার্যত দেশের অর্থনীতি হয়ে গেছে নাকাবন্দী। আর্থিক বৃদ্ধি ব্যাহত, বিদেশী লগ্নী অনুপস্থিত, ব্যাপক কর্মসংকোচন ও বেকারত্ব, মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি। ১৫.৪১ লক্ষ কোটি টাকার পুরনো নোট প্রায় পুরোটাই ফেরত এসেছে। জাল নোটের পরিমাণ অতি নগন্য। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কালো ও জাল নোটগুলি কোথায় গেল? বিরোধীরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর লোকেরাই সাদা করিয়ে দিয়েছে অথবা বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। ডিজিটাল লেনদেনের ঢক্কানিনাদ অস্তমিত, নগদের ব্যবহার বেড়েছে ৩৮%। আর্থিক বৃদ্ধির হার থমকে সর্বকালীন কম। পূর্বতন ইউপিএ্ সরকারের নীতিপঙ্গুতার মধ্যে যেখানে ৮%-র বেশী থাকত সেখানে অনেক 'এক্সট্রাপোলেট' করেও ৭%-র আশপাশে ঘুরছে। মাঝখান থেকে নতুন টাকা ছাপাতেই ইতিমধ্যে ১৩,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। সেই টাকাও স্থানীয় সাইবার কাফেতে নকল হয়ে যাচ্ছে, পাকিস্তান বা সুইজারল্যান্ডের টাঁকশাল অবধি যেতে হচ্ছে না। ১৫ কোটি দিন মজুর রুজি হারিয়ে পথে বসেছেন, তাতেই ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি। বন্ধ হয়ে গেছে অগুন্তি ছোটশিল্প, মুখ থুবড়ে পড়েছে ছোট ব্যবসা। কাশ্মীরের 'সন্ত্রাসবাদ' বেড়ে গেছে। আর মোদির পুলিশ কর্তার জবানবন্দীতে 'মাওবাদ' দণ্ডকারণ্যের জঙ্গল থেকে মোদির অলিন্দে চলে এসেছে। এ টি এমে-র দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মারা গেছেন ১০০-র বেশী মানুষ। অসংখ্য পরিবার অতান্তরে পড়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মীদের নাভিঃশ্বাস উঠেছে। ধরাশায়ী হয়ে গেছে ভারতের কৃষিক্ষেত্র। তবে মুনাফার পাহাড় গড়েছেন অসাধু শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, নেতা, ব্যাঙ্কার, হাওলা অপারেটর, মাফিয়ারা। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ্-র ব্যাঙ্কেই জমা পড়েছে ১,০০০ কোটি টাকার বেশী। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি লাভবান হয়েছে। তাই বোধহয় শতাব্দীর ওপার থেকে পাগলা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক হাসছেন।

আরবান নকশাল?

''যে সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা।''

''হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকলে ঘুমের ঘোরে,
অম্নি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলে বেলের কষে
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে।''

— সুকুমার রায়ের 'একুশে আইন' ছড়া থেকে।

লোকসভা নির্বাচনের আগের বছরে দেশজুড়ে বিরোধীদের খণ্ডিত বিরোধিতার চাইতেও অনেক জ্বালাময়— প্রতিবাদী সাংবাদিক, গবেষক, অধ্যাপক, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবীদের ক্ষুরধার আক্রমণ যা 'জুমলা সম্রাটে'র লোক ঠকানো ভেল্কিবাজির স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরছে। কিংবা দেশজুড়ে, বিশেষত নিজেদের গর্ভগৃহ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ব্যাপক দলিত উত্থান ও প্রতিরোধ যা কোনভাবে সামলানো যাচ্ছে না। সামলানো যাচ্ছে না দাভালকার-পানসারে-কালবুর্গি-গৌরী লঙ্কেশদের হত্যার প্রতিক্রিয়া। তাই বিরুদ্ধস্বরকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে টপাটপ জেলে ভরো। সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র-যুবকদের দমন করো। আম্বেদকরের নাতি দলিত প্রতিবাদের নেতা প্রকাশ আম্বেদকরকে মাওবাদী আখ্যা দাও। বাকীদের 'আরবান নকশাল'। রাফাল দুর্নীতি, নোট বাতিল, জি এস টি, বেকারত্ব, দলিত এবং মুসলমান ও খ্রীস্টানদের ওপর গোরক্ষক, হিন্দু সেনা, বজরঙ দলদের তাণ্ডব, কৃষক অসন্তোষ ও আত্মহত্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার কারণে

দেশবাসীর নজর ঘুরিয়ে দিতে এই মিথ্যা প্রচারের দাপট, সহানুভূতির ঢেউ, জাতীয়তাবাদী মোড়ক, ধর্মীয় ও জাতপাতের মেরুকরণের মাধ্যমে নির্বাচনী বৈতরণী পেরোনোর চেষ্টা। নির্বাচনের ফল মোদির বিপক্ষে যাবে কিনা এখনি বলা যাচ্ছে না তবে এটুকু বলা যায় দন্ডকারণ্যের কিছু এলাকায় ভারতীয় ফৌজের তীব্র আক্রমণের মধ্যে কষ্ট করে টিকে থাকা এবং অন্যত্র অপসৃয়মান তথাকথিত 'মাওবাদ'কে মোদি অনেকটা মাইলেজ দিলেন।

বোমারু বাংলা?

''সভায় কেন চেঁচায় রাজা 'হুক্কা হুয়া' বলে?
মন্ত্রী কেন কলসী বাজায় ব'সে রাজার কোলে?''

—সুকুমার রায়ের 'বোম্বাগড়ের রাজা' ছড়া থেকে

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি সভায় সজোরে তার 'বিশ্ব বাংলা'র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছেন। তার সাথে পাল্লা দিয়ে মন্ত্রী, আমলা, নেতা, সভাসদরা এবং পোষিত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র শিল্পীরা। অথচ বিশ্ব আজ বাংলাকে চিনছে হিংসা আর সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর, খাগড়াগড় কান্ডের প্রধান অভিযুক্ত বোমারু মিজানদের উল্লাসক্ষেত্র হিসাবে। ভোটার লিষ্ট থেকে নাম বাদ, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাস, গণনায় কারচুপি প্রভৃতি পূর্বসূরীদের যাবতীয় কৌশল শিশুসুলভ প্রমাণ করে 'গুড়জল' তত্ত্ব বা সাম্প্রতিক 'উন্নয়ন'-র পথ আটকানোর মত অভিনব পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের অস্তিত্বহীন করে দিয়েছে। বেশীরভাগ আসনে ভোট করার প্রয়োজনই হয়নি, কারণ বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেন নি। রাজ্যের বেশীরভাগ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতেই বিরোধী শূন্য। বিরোধীদের নিকেশ করার পর এবার ক্ষমতার মধুভাণ্ডটি দখল করতে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় নিজেদের মধ্যেই নারদ-নারদ। বাংলার বর্ষাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডের নিজস্ব কুটির শিল্প বোমা-বন্দুকের গুলির তুমুল বৃষ্টি। যার থেকে বাদ পড়ছে না নিরাপরাধ গরীব গ্রামবাসী, গৃহবধূ মহিলা ও দুধের শিশু। নয়ানজুলি রক্তে ভেসে এখন ঘরের দাওয়া অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথদের আত্মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছেন।

সমকাম অপরাধ নয়!

''আমি যা আমি তা...''
—জোহান উলফগ্যাং ভন গ্যয়টে

''কেউ তার ব্যক্তিসত্বাকে অস্বীকার করতে পারে না।''
—আর্থার শোপেনহাওয়ার

'গোলাপকে যে নামেই ডাকো' — উইলিয়াম শেকস্পীয়রের লেখা থেকে

১৮৬১ সালের ভারতীয় দন্ডবিধির ধারায় পুরুষ-পুরুষ, নারী-নারী সমকাম সহ সমস্ত 'অপ্রকৃত' যৌনতা আজ অবধি অপরাধ বলে গণ্য হত। এর বিরুদ্ধে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী এককথায় 'এল জি বি টি' সম্প্রদায়, দীর্ঘদিন ধরে যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের নিপীড়নের শিকার, আন্দোলন করে আসছেন। 'নাজ ফাউন্ডেশন' প্রথম ২০০১ সালে এর বিরুদ্ধে দিল্লী হাইকোর্টে মামলা করে। বহু জল গড়ানোর পর অবশেষে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও মহিলা বিচারপতি ইন্দু মালহোত্র সহ পাঁচ জনের বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়ে দিলেন যে সমকাম অপরাধ নয় এবং এল জি বি টি সম্প্রদায়ের মানুষেরও নিজের পছন্দ মত সঙ্গী বেছে নেওয়ার, ভালবাসার ও যৌন তৃপ্তি পাওয়ার অধিকার আছে। ধর্মান্ধ সামন্ত অবশেষ যুক্ত ভারতীয় সমাজ কি এই রায় এখনি গ্রহণ করবে? সমকামী বিয়ে, সন্তানের আইনি জটিলতা এগুলি তো এখনও নির্ধারিত হল না? কেন্দ্র ও এগারটি রাজ্যের শাসক দল বিজেপি কিভাবে বিষয়টি হজম করবে? 'সঙ্ঘ পরিবার' প্রথম দিন থেকে এর বিরোধিতা করে এসেছে এবং এই রায়ের বিরুদ্ধাচরণ ঘোষণা করেছে। এল জি বি টিরা বড় আইনী জয় পেলেন, কিন্তু তাদের আরও বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই বাকী রইল।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

● বন্যা, ঝড়, মরুঝড়, বজ্রাঘাত, পথ দুর্ঘটনায় মৃত দেশবাসীদের প্রতি ● পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে নিহত থুদিকুড়ির (তুতিকোরিন) নিহতদের প্রতি ● নির্বাচন সঞ্চালন করতে গিয়ে সরকারি শিক্ষক রাজকুমার রায় সহ নিহতদের প্রতি ● নিপা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সেবা করতে গিয়ে মৃত কেরলের নার্স লিপি পুতুসেরিকে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট ক্রিকেটার অজিত ওয়াড়েকর ও গোপাল বসু; সাহিত্যিক ফিলিপ রথ উলফ; বিজ্ঞানী ই.সি.জি. সুদর্শন; চিত্রশিল্পী রাম কুমার; অভিনেত্রী ললিতা চট্টোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী; চিত্রপরিচালক ভীম সেন খুরানা; রাজনৈতিক নেত্রী সুরমা ঘটক; প্রতিবাদী ছাত্রী আমরিন জাভেদ; সঙ্গীত শিল্পী আরেথা ফ্রাঙ্কলিন; নাট্যকার নিল সাইমন; 'একাত্তরের জননী' সাহিত্যিক রমা চৌধুরি; ফুটবলার সুকল্যাণ ঘোষ দস্তিদার

স্মরণিকা

উইনি মাদিকিজেলা ম্যাণ্ডেলা (১৯৩৬-২০১৮)

শ্বেতাঙ্গ শাসিত দঃ আফ্রিকার ইষ্টার্ন কেপ প্রভিন্সের এক শিক্ষক-শিক্ষিকা পিতা- মাতার নয় সন্তানের পঞ্চম উইনি হাইস্কুল শেষে সমাজসেবায় ডিগ্রি এবং তারপর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাতক হয়ে বারাগওয়ানথ হাসপাতাল সহ দঃ আফ্রিকার বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সমাজসেবা সংক্রান্ত চাকরি করেন। এরপর তিনি বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক ও আইনজীবী নেলসন ম্যান্ডেলা ২২ বছরের তরুণী উইনির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রথম পত্নীকে ত্যাগ করে ১৯৫৮-ত উইনিকে বিয়ে করেন। নেলসন-উইনির দুটি কন্যা সন্তান হয়। ১৯৬৩ তে নেলসন ধরা পড়লে এবং ১৯৯০ অবধি দীর্ঘ ২৮ বছর কারাবরণ করার পর্যায়ে উইনি হয়ে ওঠেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য অবসান এবং ‘ফ্রি ম্যান্ডেলা’ আন্দোলনের অন্যতম মুখ। এই সময় তিনি বারবার গ্রেফতার ও অত্যাচারিত হন, জেল খাটেন, তাকে সলিটারি কনফাইনমেন্টে রাখা হয়। অন্যদিকে এই সময় তাঁর নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ‘ম্যান্ডেলা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব’-র সদস্যদের দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানো, বিরোধীদের অপহরণ, অত্যাচার, হত্যার অভিযোগ আসতে থাকে। এরজন্য তাঁর বিচারও হয়। ম্যান্ডেলা ১৯৯০ এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান। ’৯২ তে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। উইনি ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ এবং ২০০৯ থেকে আমৃত্যু সংসদ সদস্যা, ১৯৯৪-৯৬ অবধি দঃ আফ্রিকা সরকারের ডেপুটি মিনিষ্টার ছিলেন। ছিলেন ‘আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ.এন.সি.)-র ‘উইমেন লীগে’র প্রধান নেত্রী। ২০০৩ সালে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। আবার কারাবাস, তারপর রায়ে মুক্তি। ২০০৭-এর এ.এন.সি.-র জাতীয় সমিতিতে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন। ২০০৮-এ জোহানেসবার্গ ও অন্যত্র অভিভাসীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় তিনি শান্তি ও ত্রাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০০৯-তে সাধারণ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে পঞ্চম স্থান পান। সেইসময় এবং তার আগে থেকেই গোষ্ঠী দীর্ণ এ.এন.সি. তাকে অনেকটা ব্রাত্য করে রেখেছিল। সেইসময় বাণ্টু উপজাতি নেতা হোলোমিসা, জুলিয়াস মালেমার নেতৃত্বাধীন ‘ইকনমিক ফ্রিডম ফাইটারস্’ প্রমুখ সংগঠন তাকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ২০১৮ তে চিরনিদ্রায় গেলেন দঃ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনের অগ্নিকন্যা।

লিণ্ডা ক্যারল ব্রাউন (১৯৪৩-২০১৮)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস প্রদেশের টোপেকার এক কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমজীবী দম্পতির ইচ্ছে হয়েছিল তাদের প্রথম সন্তান লিন্ডাকে স্থানীয় নামী সামনার এলিমেন্টারি স্কুলে ভর্তি করার। স্কুল কর্তৃপক্ষ কালো চামড়ার পরিবারকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। ব্রাউন দম্পতী এন.এ.এ.সি.পি. প্রমুখ নাগরিক অধিকার সংগঠনের সাহায্যে আইনি লড়াই শুরু করলেন। সেই সময় সুপ্রীম কোর্টে চলা ‘ব্রাউন ভার্সেস বোর্ড অফ এডুকেশন’ মামলাটি সাড়া জাগিয়েছিল। লিন্ডার আর সামনার স্কুলে পড়া হল না। ১৯৫৪ তে লিন্ডার পক্ষে যখন রায় বেরোল সে তখন অন্য স্কুলে পাঠরত। পরে সে ওয়াশবার্ন এবং কানসাস প্রাদেশিক বিশ্ব বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। আর শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি শিক্ষার সমানাধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেন। তৈরি করেন ব্রাউন ফাউন্ডেশন। তিনি তাঁর সন্তানদের টোপেকার স্কুলে পড়ানোর সময় বর্ণবৈষম্যের অবশেষ এবং চাপা জাতিবিদ্বেষ ভালভাবে উপলব্ধি করেন। এর বিরুদ্ধে আবার তিনি আইনি লড়াই শুরু করেন। এবারও ১৯৯৩ সালে তিনি আদালতে জয়ী হন। তাঁর এই সুদীর্ঘ লড়াই মার্কিন সমাজে বিশেষত শিক্ষা ও আইনি ব্যবস্থায় সমানাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবল গুরুত্ব বহন করে।

সৈয়দ শুজাত বুখারি (১৯৬৭-২০১৮)

দীর্ঘ ৭০ বছরেরর বেশি অশান্তিতে থাকা এবং উপ মহাদেশের সবচাইতে যুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত কাশ্মীরি ও কাশ্মীরের অন্যতম গ্রহণযোগ্য স্বতন্ত্র্য মধ্যপন্থী শান্তিকামী ও আলোচনাপ্রয়াসী ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বর। তাই এই জিইয়ে রাখা সমস্যায় দু'হাত ভরে রাজনীতির ফসল তোলা সীমান্তের দু'পাড়ের ঘোরেল খেলোয়াড়দের উগ্রতা ও নৃশংতার বলি। কাশ্মীরের অকুতোভয় সন্তান শুজাত ছিলেন শিক্ষিত সংস্কৃতিবান কাশ্মীরিয়াতের দূত। কাশ্মীরি, উর্দু ও ইংরেজি তিনটি ভাষায় প্রবল দখলদারী, সুবক্তা সুজাত ছিলেন কাশ্মীরি ও উর্দু কাব্য ও সাহিত্যের একজন সমজদার পৃষ্ঠপোষক। দেবনাগরী বা সারদার পরিবর্তে কাশ্মীরি জনতার পারসিক-আরবীয় ‘নাস্তালিক’ বর্ণমালাকে কাশ্মীরি বর্ণমালা হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং প্রায় তিন দশক বন্ধ থাকার পর কাশ্মীরি ভাষাকে প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি অবধি ২০০৮ থেকে ২০১৭-র মধ্যে পুনঃপ্রচলনে তাঁর এবং তাদের সংস্কৃতিক গোষ্ঠী ‘আবদে মারকাজ কামরাজ’ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ছিল বিশেষ প্রচেষ্টা ও অবদান। এছাড়াও তিনি কাশ্মীরিতে বই প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৯০তে ‘কাশ্মীর টাইমস্’ এ সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। এরপর দীর্ঘদিন ‘দ্য হিন্দু’-র বিশেষ সংবাদদাতা ছিলেন। তারপর নিজে শুরু করলেন ‘রাইজিং কাশ্মীর’ ইংরেজি দৈনিক। এর সাথে কাশ্মীরি দৈনিক ‘বুলান্দ কাশ্মীর’ ও একটি উর্দু সাপ্তাহিক, এ ছাড়াও তিনি দেশ বিদেশের বহু কাগজে লিখতেন এবং সোস্যাল মিডিয়াতে সক্রিয় অংশ নিতেন। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন উদারপন্থী মুসলমান। নিহত সাংবাদিক পারভেজ সুলতানের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে ২০১৪-র বন্যায় ত্রাণে সক্রিয় অংশ নেওয়া সহ বহু সমাজসেবামূলক কাজে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি একদিকে উগ্রপন্থী

কাশ্মীরি জঙ্গীবাদের অন্যদিকে ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদ ও বলপ্রয়োগের তীব্র সমালোচক ছিলেন। বিভিন্ন মঞ্চে বারবার তিনি ভারত-পাকিস্তানকে আলোচনার টেবিলে বসে শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীর সমস্যা মেটানোর কথা বলে এসেছেন। তাইতো গৌরী লঙ্কেশের পর এই অমূল্য প্রাণকে চলে যেতে হল।

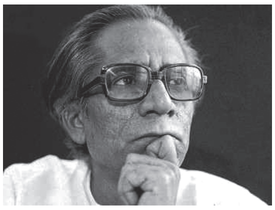

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮)

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক— তিন বিখ্যাত বাড়ুয্যের এবং সমরেশ বসুর পর বাংলা ভাষার অগ্রণী গদ্যকার। এক স্বল্পভাষী সংযমী ব্যক্তিত্ববান বিরল লেখক যিনি লিখতেন খুব কম, কিন্তু যা লিখতেন তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। তিনি মূলত মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির পরিজীবন চর্চার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু এই স্তরের সুগভীর পর্যবেক্ষণ, অনুভব, মনন, অনুপুঙ্খ আচরণ তাঁর কথা শিল্পের জাদুতে আমাদের চমকে দেয়। রেলশহর খড়্গপুরের রেল কলোনিতে বেড়ে ওঠা, শিক্ষা, রেলওয়ে ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরিতে বিশ্ব সাহিত্যের আস্বাদ এবং বাবার রেল চাকরির সুবাদে কৈশোরেই ভারত দর্শন। এরপর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র রমাপদ চৌধুরী কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ও হিন্দু হস্টেলে থাকতে শুরু করেন। চল্লিশের দশকে বের করেছিলেন ছোট পত্রিকা 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা'। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি শুরু করেন। তাঁর সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দীর্ঘ জীবনে তিনি দেড়শর মত ছোটগল্প ও পঞ্চাশের মত উপন্যাস লিখেছেন। এর মধ্যে 'খারিজ, 'একদিন অচানক', 'অভিমন্যু', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'লালবাঈ', 'দ্বীপের নাম টিয়া রং' প্রমুখ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উপন্যাসের মধ্যে 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে', 'এখনই', 'বাড়ি বদলে যায়', 'হারানো খাতা', 'দরবারী', 'বাহিরি', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'প্রথম প্রহর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'ঋষি, দস্যু ও এক কিশোর বালক', 'উদয়াস্ত', 'ট্রাজেডি', 'বিষ্ণুরামের গল্প', 'বীজ' প্রভৃতি ছোট গল্প আমাদের মন টানে। তিনি আত্মমুখীন মানুষ ছিলেন, মিশতেনও একটি ক্ষুদ্র বলয়ের মধ্য। শেষদিকে বছরে মাত্র একটি উপন্যাস লিখতেন শারদীয়া দেশের জন্য। সাহিত্যের স্বীকৃতিতে পেয়েছেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'আকাদেমী পুরস্কার', 'জগত্তারিণী পুরস্কার', 'ডিলিট' প্রভৃতি।

মাদিহা গওহর (১৯৫৬-২০১৮)

বিশিষ্ট অভিনেত্রী, পরিচালক, প্রযোজক, মহিলা আন্দোলনের নেত্রী, সমাজকর্মী এবং পাকিস্তানের নাট্য জগতের প্রাণভোমরা। জন্ম করাচীতে। ইংরেজিতে এম.এ. করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিজ্ঞান নিয়ে উচ্চশিক্ষা নেন। এবার দেশে ফিরে নাটকের জন্য লড়াই শুরু করেন। সঙ্গে ছিলেন নাট্যকার, পরিচালক, জীবনসঙ্গী শাহিদ নাদীম। দেশভাগ, দাঙ্গা, যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, সীমান্ত সঙ্ঘর্ষ, ঘৃণা, রাজনীতি, দমন পীড়ন, নারী নির্যাতন, মৌলবাদ, দারিদ্র্য, অশিক্ষার বিপ্রতীপে মুক্তচিন্তা, সুস্থজীবন, সুবিচার, মানবতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য, নারী স্বাধীনতা, শান্তি সচেতনতার পতাকা তুলে ধরে যাত্রা শুরু স্বাধীন থিয়েটারের। ১৯৮৪ তে তৈরি করলেন 'আজোকা' নাট্য দল। সমস্ত বাধা বিপত্তির মধ্যে শিরদাঁড়া সোজা রেখে, সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে বলে যেতে লাগলেন মানুষের কথা, পৌঁছতে চাইলেন মানুষের কাছে। মোল্লা তন্ত্র- মিলিটারি- সাম্রাজ্যবাদী চক্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এ যে কি কঠিন কাজ বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য নাটকের ফর্ম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন জনপ্রিয় 'ভান্ড' অথবা 'নৌটঙ্কি'। তাঁদের বিখ্যাত প্রযোজনাগুলির মধ্যে 'বুরকাভাগানসা', 'মেরে রং দে বাসন্তী চোলা (বিপ্লবী ভগৎ সিং সম্পর্কিত)', 'দারা', 'তোবা টেকসিং', 'এক থি নানি', 'লেটারস্ টু আঙ্কল শ্যাম', 'হোটেল মহেঞ্জোদাড়ো' প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কয়েকটি নাটক নিষিদ্ধ ও বন্ধ করা হয়। এই সমস্ত শক্তিশালী নাটক নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে, শহরের রাস্তায়, বস্তিতে, খোলা আকাশের নীচে ছুটে বেড়িয়েছেন। এছাড়াও গেছেন ভারতের বিভিন্ন শহর, ইরাণ, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে। পাকিস্তান— ভারতের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সেতু নির্মাণের চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর নাটক দেশে বিদেশে সমাদৃতও হয়েছে। পাকিস্তানে পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, তমঘা-এ-ইমতিয়াজ, ফতিমা জিন্না এওয়ার্ড। নেদারল্যান্ডস্ দিয়েছে 'প্রিন্স ক্লস অ্যাওয়ার্ড'। শেষে ক্যানসার এসে প্রাণ কেড়ে নিল এই অমূল্য প্রাণ অক্লান্ত যোদ্ধার।

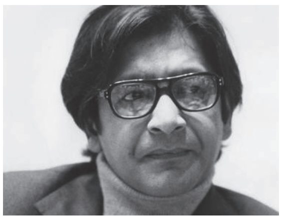

বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নয়পল (১৯৩২-২০১৮)

উন্নাসিক ঠোটকাঁটা খিটখিটে জটিল স্বভাবের নয়পলকে অনেকেই অপছন্দ করতেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আফ্রিকার ভবিষ্যত,ইসলাম ধর্ম, উপনিবেশবাদ, জাতিবাদ প্রভৃতি নিয়ে কিংবা নিজের জীবনের পরকীয়া, অবসাদ নিয়ে তাঁর একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তিনি অনেকের কাছেই অপ্রিয় হয়েছেন। কিন্তু তার লেখা এক মহাকাব্যিক আখ্যানে তিন মহাদেশের পটভূমিতে অভিবাসী ভারতীয় শ্রমিকদের বংশধরদের জীবনস্রোত ও যাপনকে যেভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছেন, তাঁর ইংরেজি ভাষা যেভাবে ক্যারিবিয়ান আখ ক্ষেতের ভারতীয় বংশোদ্ভুত অভিবাষী শ্রমিকদের কথ্য ভাষাকে প্রাণ দিয়েছে কেউ তা হেলাফেলা করতে পারবে না। তাইতো তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত বই 'এ হাউজ ফর মিস্টার বিশ্বাস'— পাঁচটি ভাষায় ২৩৮টি সংস্করণ, 'এ বেন্ড ইন দ্য রিভার' — আটটি ভাষায় ১৬৮টি সংস্করণ, 'ইন্ডিয়া : এ উন্ডেড সিভিলাইজেশন'— চারটি ভাষায় ১০৫টি সংস্করণ,

'গেরিলাস' — ছয়টি ভাষায় ১০১ টি সংস্করণ, 'হাফ এ লাইফ'— ছয়টি ভাষায় ৮১টি সংস্করণ এবং 'ম্যাজিক সীডস্'— ছয়টি ভাষায় ৫৯টি সংস্করণ বেরোয়। 'মিগুয়েল স্ট্রীট', 'দ্য মিমিক মেন', 'সাফরেজ অফ ইলভেরা', 'এ স্টোন অ্যান্ড দ্য নাইটস্ কমপেনিয়ন', 'দ্য লস অফ এলডোরাডো' প্রমুখ তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ৩০টির মত গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে অনেকগুলি তাঁর বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতার ওপর। ভারত নিয়ে তাঁর ট্রিলজি : 'অ্যান এরিয়া অফ ডার্কনেস' (১৯৬৪), 'দ্য এনিগমা অফ অ্যারাইভাল' (১৯৮৭) ও 'এ মিলিয়ন মিউটিনিজ নাও' (১৯৯০)।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপ ত্রিনিদাদে কয়েক পুরুষ আগে বিহার থেকে কলকাতা হয়ে জাহাজের খোলে কুলিগিরি করতে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের বংশধর ভি.এস. নয়পলের জন্ম, ছোটবেলা সব ত্রিনিদাদে। তাঁর দিদিমার ছিল অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তাদের আবার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। জামাইদের শর্ত ছিল ঘর জামাই হতে হবে। বিশাল পরিবারে ঝগড়াঝাটি, গালিগালাজ, মারধোরের মধ্যে তাঁর শৈশব ও বাল্য কাটে। বাবা ছিলেন অসফল সাংবাদিক ও লেখক। তখন থেকেই স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা বড় লেখক হওয়া। পরে বৃত্তি পেয়ে অক্সফোর্ডে ইংরেজি ভাষা নিয়ে পড়তে যান। কিন্তু বিপর্যয় ও দীর্ঘ অবসাদের মধ্যে পড়েন। সেই থেকে সহপাঠী পরবর্তীকালে পত্নী প্যাট্রিসিয়া অ্যান হালের সহযোগিতা ও সমর্থন পেয়ে এসেছেন। ১৯৫৩-এ জটিলতার মধ্যে স্নাতক হয়ে কিছু সময়ের জন্য সাংবাদিকতা করেন। ১৯৫৭ তে প্রথম গ্রন্থ 'মিসটিক মাসাউর' বেরোয়। ১৯৬১ তে 'এ হাউজ ফর মিস্টার বিশ্বাস' বেরোনোর পর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কখনও স্ত্রীকে নিয়ে, কখনও বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন একের পর এক দেশ। ১৯৭১-এ বুকার ও ১৯৮৯-তে নাইট হুড পান। ৪১ বছরের বিবাহিত জীবনের পর স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া ১৯৯৬-এ মারা গেলে পাক সাংবাদিক নাদিয়া খান্নুমকে বিয়ে করেন। ২০০১-এ সাহিত্যে নোবেল পান। পান আরও অনেক সম্মাননা। পার্কিনসন্স রোগে ভুগছিলেন।

রাজিন্দার সাচার (১৯২৩-২০১৮)

বিশিষ্ট আইনজীবী, বিচারপতি ও মানবাধিকার যোদ্ধা। পিতামত অবিভক্ত পাঞ্জাবের লাহোরের নামকরা আইনজীবী ছিলেন। লাহোরেই শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও আইনি ডিগ্রি লাভ। দেশভাগের পর ১৯৫২ তে সিমলা কোর্টে আইনজীবী হিসাবে পেশা শুরু করেন। ১৯৬০ থেকে দিল্লী হাইকোর্টে। ১৯৬৩ তে কংগ্রেস থেকে একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে 'প্রজাতন্ত্র পার্টি' গঠন করে পাঞ্জাবের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ আনে এবং যা প্রমাণিত হয় তার আইনি খসড়াটি সাচারের করে দেওয়া। ১৯৭০-এ সাচার দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি নির্বাচিত হন। জরুরি অবস্থার স্বৈরাচারী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে কজন বিচারপতি বিরোধিতা করেছিলেন তার মধ্যে সাচার অগ্রগণ্য। তাঁকে প্রথমে সিকিমে, পরে রাজস্থানে বদলি করা হয়। জরুরি অবস্থার অবসানে ১৯৭৭ এ তিনি আবার দিল্লী হাইকোর্টে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৫-র আগস্টে প্রধান বিচারপতি হয়ে ওই বছরের ডিসেম্বরে অবসর নেন। ১৯৭৭-এ তিনি ভারতের 'কোম্পানী অ্যাক্টের' সংশোধনের ক্ষেত্রে, ১৯৮৪-তে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্টের' পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং '৮৪ তেই দিল্লীতে শিখ বিরোধী দাঙ্গায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর-এর নির্দেশ দিয়ে নজর কাড়েন। ১৯৯০-এ 'পিপল্স ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (পি ইউ সি এল)'-র তরফ থেকে 'কাশ্মীর প্রসঙ্গে রিপোর্ট' তৈরি করেন এবং ২০০৩-এ কালা আইন 'পোটা' তুলে নেওয়ার জন্য জোরালো সওয়াল করেন। এছাড়াও তিনি বাসস্থানের অধিকার সহ মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদগুলিতে অংশ নেন। ২০০৫-এ ভারতের জনসংখ্যার মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রকৃত দুরবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তুলে ধরা তাঁর ঐতিহাসিক 'রিপোর্ট জন সোস্যাল, ইকনমিক অ্যান্ড এডুকেশনাল স্টেটাস অফ মুসলিম কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া' ব্যাপক আলোড়ন ফেলে। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বেসরকারি ও বিলগ্নিকরণ, পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতি, মার্কিনের ইরাক দখল, মহিলাদের উপর নিপীড়ন, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদে সরব ছিলেন। ২০১১ তে ৮৮ বছর বয়সেও দিল্লীতে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনরত অন্না হাজারের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গ্রেফতার হন।

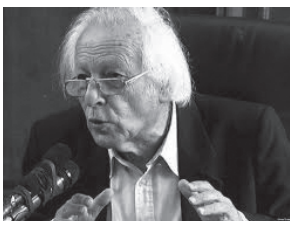

সামির আমিন (১৯৩২-২০১৮)

মিশরীয় চিকিৎসক বাবা ও ফরাসী চিকিৎসক মায়ের সন্তান সামির আমিনের জন্ম কায়রোতে, বাল্য কাটে পোর্ট সৈয়দে। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিস চলে আসেন। স্ট্যাটিসটিক্স ও অর্থনীতিতে স্নাতক। ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন ও পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফরাসী কমিউনিস্ট দলে (পিসিএফ) যোগ দেন যদিও সোভিয়েত ঘরানার মার্কসবাদ এবং মাওবাদী গোষ্ঠীগুলি থেকে নিজের অবস্থান পৃথক করেন। অনেক সরকারি ও আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর মূল অবদান আধুনিক ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যামালা। পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক এই মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ ইউরোপ— সেন্ট্রিজম শব্দ বন্ধন প্রণয়ন করেন। আজকের পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়েও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছিল। অনেক থিসিস, প্রবন্ধ ও বই লিখে গেছেন তিনি। যার মধ্যে 'দ্য লিবারাল ভাইরাস', 'অ্যাকুমুলেশন অব এ ওয়ার্ল্ড স্কেল', 'ক্যাপিটালিজম ইন দ্য এজ অফ গ্লোবালাইজেশন', 'দ্য ইমপ্লোশন অফ কনটেমপোরারি ক্যাপিটালিজম' প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

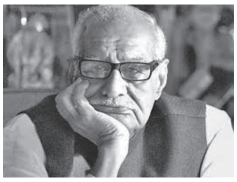

কুলদীপ নায়ার
(১৯২৩-২০১৮)

বিশিষ্ট ও নির্ভীক সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠক, লেখক, শান্তিপ্রয়াসী এবং কূটনীতিক। জন্ম অবিভক্ত ভারতের শিয়ালকোটে। উচ্চশিক্ষার পর উর্দু পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু। তারপর বহু পত্রিকায়, বহু পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা। বহু ইতিহাস ও সংগ্রামের সাক্ষী। তারপর সম্পাদনা করেছেন বহু পত্রপত্রিকা যার মধ্যে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও 'দ্য স্টেটসম্যান' উল্লেখযোগ্য। জরুরি অবস্থার সময় তাঁর জোরালো প্রতিবাদী ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে যার জন্য তাঁর জেল হয়। রাজীব সরকারের 'ডিফেমেশন বিল' সহ মানবাধিকারের প্রতিটি প্রশ্নে আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। ভারত-পাকিস্তান শান্তিপ্রয়াসে তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ যুক্ত রাজ্যে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'বিয়ন্ড দা লাইনস্', 'ইন্ডিয়া আফটার নেহরু,' 'ইমারজেন্সি রিটোল্ড', 'ইন্ডিয়া দা ক্রিটিকাল ইয়ারস্ অ্যান্ড ডিসট্যান্ট নেইবারস্—এ টেল অফ দ্য সাব কন্টিনেন্ট'।

ভাস্কর নন্দী
(১৯৩৮ - ২০১৮)

প্রয়াত হলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা ভাস্কর নন্দী। ধনী পরিবারে তাঁর জন্ম, দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে নন্দীরা জলপাইগুড়িতে চলে আসেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি গলার ক্যান্সারে ভুগছিলেন। জীবনের শেষ সময়টা তিনি জলপাইগুড়িতেই কাটিয়েছেন।

শিলিগুড়ি থেকে মাত্র আধঘন্টার রাস্তা পেরিয়েই নকশালবাড়ি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মনোরম পরিবেশ রয়েছে এখানে। চা-বাগান, সোনালি সূর্যের আলো সবই যেন ছবির মতন। কিন্তু ইতিহাসে নকশালবাড়ির গুরুত্ব অন্য জায়গায়। নকশালবাড়ির তরাই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এই বিদ্রোহ। ইতিহাস বলছে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছিল দশ হাজারেরও বেশি মানুষের। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও মানুষের চোখে নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্মৃতি তরতাজা হয়ে রয়েছে। এই আন্দোলনের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল অসমেও। অসমের এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ভাস্কর নন্দী। লন্ডনে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ছেড়ে শুধুমাত্র এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভাস্কর নন্দী কলকাতায় আসেন। তিনি একসময় বলেছিলেন, 'স্বাধীনতার পর এই আন্দোলন এমন একটা আন্দোলন, যার জের দেশের ইতিহাস ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন করতে পারে।' লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি লাভ করে ভাস্কর নন্দী আমেরিকায় যান। সেখানকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে ডক্টরেট করে পড়াতে শুরু করেন। এখানে এসেই তিনি মাওবাদ নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখি পড়েন এবং মাওবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভাস্কর নন্দীর মনে হয়েছিল, একমাত্র মাওবাদই পারে দেশে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রধান নায়ক চারু মজুমদারের প্রিয়পাত্র ছিলেন ভাস্কর। তাঁর সঙ্গে চারু মজুমদারের প্রথম দেখা হয় ১৯৬৫ সালে। তখনও কলকাতায় অতটা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব এসে আছড়ে পড়েনি। কিন্তু ভাস্কর নন্দী আগে থেকেই এই আন্দোলনের বিষয়ে কিছুটা শুনেছিলেন এবং অন্যদের থেকে এই ব্যাপারে জানতে চাইলে সকলেই চারু মজুমদারের নাম করেন। ভাস্কর নন্দী জানতেন, বাংলার উত্তরদিকে এই আন্দোলনের মূল কান্ডারি ছিলেন চারু মজুমদার। একদিন এক তরুণ নেতা এসে ভাস্কর নন্দীকে জানান যে চারু মজুমদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। চারু মজুমদারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই ভাস্কর নন্দীর জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তাঁর জীবনের গতিপথই বদলে যায়। চারু মজুমদারের কথা মতোই তিনি প্রথমে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ও তারপর অসমের আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তারপর কৃষকদের ঘরের লোক হয়ে উঠতে সময় লাগেনি তাঁর। এরপর তিনি চা শ্রমিক ও প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। এরপর তিনি অসমের দায়িত্ব নিয়ে সেখানে চলে যান এবং অসমে নকশাল আন্দোলনের প্রসার ঘটান। অসমের চা শ্রমিক, আদিবাসী ও উপজাতি কৃষকদের প্রাণের মানুষ হয়ে যান। অসমের মাটিতে বসে বোড়ো গণহত্যা ও অহমিয়া জ্যাতাভিমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তিনি পিসিসি সিপি আই এম এল-র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, ত্রিপুরা ও বিহারে সংগঠন বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং প্রান্তিক জনজাতি, দলিত ও আদিবাসীদের সংগঠিত করতে ৮০-র দশকে URMCA গঠন করেন। তিনি ভাঙ্গরের কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ নকশালবাড়ি এবং তাঁর সাথী ও পরিজনেরা। তবে রেখে গেলেন অধিকার আদায়ের প্রতিবাদ ও আন্দোলন।

বেলাল চৌধুরী
(১৯৩৮-২০১৮)

বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক। অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি জেলার ফেনিতে জন্ম। তাঁর বহু কবিতা এপার ওপার দুই বাংলার বহু পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 'হাংরি জেনারেশনে'র কবিদের এবং ইন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ বইপ্রেমিক প্রকাশকদের সঙ্গী ছিলেন। এক সময় তিনি কলকাতার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আবার ঢাকায় রূপালী গোষ্ঠীর 'সাপ্তাহিক সন্দীপ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদনা করেছেন ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস থেকে প্রকাশিত 'ভারত বিচিত্রা' পত্রিকা। তাঁর কবিতায় একই সাথে এসেছে স্বদেশ প্রেম, জীবনের অস্তিত্ব, যাপিত জীবন, প্রেম, প্রকৃতি ও নিঃসর্গের প্রতি ভালোবাসা ও উচ্ছ্বাস, মানবিকতা এবং রাজনীতি। তাঁকে পথিকৃত কবিও বলা হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'সেলাই করা ছায়া', 'আত্মপ্রকৃতি', '৩২ নং',

‘স্থিরজীবন ও নিসর্গ’, ‘মুক্তির মাস’, ‘যাবজ্জীবন’ উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, একুশে পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হন।

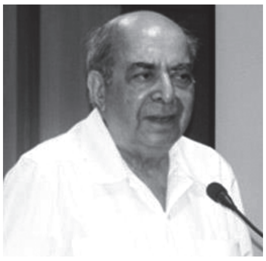

সুরেন্দ্র নিহাল সিং (১৯২৯-২০১৮)

অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে জন্ম। পিতা গুরমুখ নিহাল সিং, দিল্লী বিধানসভার স্পীকার এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল হয়েছিলেন। অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন, কেতাদুরস্ত, মার্জিত স্বভাব, রুচি ও ব্যবহারের নিহাল সিং-এর ভেতরে ছিল লৌহপ্রতিম দৃঢ়তা এবং নিরপেক্ষ স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রবল মূল্যবোধ। তিনি যখন যেখানে সম্পাদক ছিলেন পত্রিকাকে ব্যবসায়ী লাভের জন্য চটুল বা চাটুকার সাংবাদিকতার দিকে নিয়ে যেতে দেন নি। এই কারণে মালিক গোষ্ঠীর সাথে মত পার্থক্য হওয়ায় তিনি ‘দ্য স্টেটসম্যান’, ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ এবং ‘দ্য ইন্ডিয়া পোস্ট’ তিনটি পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর মধ্যে মুম্বাই কেন্দ্রিক ‘দ্য ইন্ডিয়া পোস্ট’-র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। শোনা যায় পত্রিকার মালিক বিজয়পাত সিংহানিয়া তাকে পত্রিকার ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধির জন্য জ্যোতিষ কলাম চালু করা সহ কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর দিল্লীর ‘দ্য স্টেটসম্যান’- এর সম্পাদক থাকাকালীন তাঁর ইন্দিরাগান্ধী প্রণীত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই সর্বজনবিদিত। ‘দ্য স্টেটসম্যান’-র দিল্লীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসাবে তার সাংবাদিক জীবনের সূচনা। এরপর বিদেশ সাংবাদদাতা হিসাব মস্কো, লন্ডন, ওয়াশিংটন, জাকার্তা প্রভৃতি শহরে কাটিয়ে পরে দিল্লী ফিরে আসেন। সম্পাদক হিসাবে তাঁর শেষ কর্মকান্ড দুবাইয়ের ‘খালিজ টাইমস্’ এ। যোগ দেন ১৯৯৪ তে। এরপর কেবল কলাম লিখতেন। তাঁর মৃত্যুতে এক নীতিনিষ্ঠ নির্ভীক সাংবাদিককে, যিনি কোন সরকারকেই রেয়াত করেননি, দেশ হারাল।

অশোক মিত্র (১৯২৮-২০১৮)

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, লেখক, সমালোচক এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী। জীবনের শেষদিন অবধি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস রেখে তীক্ষ্ণ সমাজসন্ধান চালিয়েছেন, আহ্বান রেখে গেছেন ঘুরে দাঁড়ানোর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির স্নাতক হয়ে দেশভাগের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি শাস্ত্র নিয়ে পড়তে শুরু করেন। এম.এ সম্পন্ন করেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর প্রথমে দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে ও পরে হল্যান্ডের রটারডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করেন। এরপর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতার ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট’ এ অধ্যাপনা করেন। তারপর রাষ্ট্রপুঞ্জের ইকনমিক কমিশন ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাকরি করে দিল্লীতে ভারতের এগ্রি প্রাইসেস কমিশনের উপদেষ্টা ও চেয়ারম্যান হন। ১৯৭৭তে জরুরি অবস্থার অবসানে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবে তিনি অপারেশন বর্গাসহ বিভিন্ন সংস্কারে ভূমিকা রাখেন। কিন্তু আবার সেই সময়েই ঘটে মরিচঝাঁপি হত্যাকান্ড, সঞ্চয়িতা ঘোটালা। পরে জ্যোতি বসুর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় মন্ত্রীসভা ছাড়েন। পরে ৯০-র মাঝামাঝি আবার বামফ্রন্টের সমর্থনে রাজ্য সভার সাংসদ ও শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হন। তিনি বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা লিখেছেন ইংরেজি ও বাংলাতে। ‘ই.পি.ডব্লিউ’, ‘দ্য টেলেগ্রাফ’এ নিয়মিত লিখতেন। ‘তাল বেতাল’, ‘আপিলা চাপিলা’ বাংলা ভাষায় তাঁর জনপ্রিয় বই। ১৯৯৬ তে ‘সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। ‘আরেক রকম’ পত্রিকার ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

অরবিন্দ গুহ (১৯২৯-২০১৮)

বিশিষ্ট কবি। জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশালে। ব্রজমোহন কলেজে পাঠরত অবস্থায় জীবনানন্দের সান্নিধ্যে আসেন। জীবনানন্দের উৎসাহে অরবিন্দের কাব্যে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ‘দক্ষিণ নায়ক’ কাব্যগ্রন্থে। তারপর পঞ্চাশের দশকে সাড়া জাগিয়ে বেরোতে থাকে একের পর এক কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ। ‘দেখাসাক্ষাৎ’ তাঁর আরেকটি নাম করা কাব্যগ্রন্থ। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘প্রস্থান সময় উপস্থিত’ ২০১৪-তে রচিত। বরিশাল থেকে তিনি কলকাতায় এসে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। পরে তিনি সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর গদ্যও ছিল সাবলীল। ছোটদের জন্যও লিখতে থাকেন। এর সঙ্গে শুরু হয় ইন্দ্র মিত্র নামে একের পর এক গবেষণাধর্মী আকরগ্রন্থ রচনা। ‘করুণাসাগর বিদ্যাসাগর’, ‘নিপাতনে সিদ্ধ’, ‘সাজঘর’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তিনি দুবার রবীন্দ্র পুরস্কার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। ২০১৫ থেকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পূরবী গুহ।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯২৯-২০১৮)

বিশিষ্ট আইনজীবী ও আইন বিশেষজ্ঞ এবং অগ্রগণ্য সাংসদ। পশ্চিবঙ্গ থেকে দশবার সাংসদ নির্বাচিত হন। ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে সবচাইতে সফল স্পীকার। সিপিআই এম দলের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁর গুরু প্রতিম জ্যোতি বসুর ‘সংশোধনবাদী লাইনের’ অনুগামী। জন্ম তেজপুরে। বাবা শ্রী নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, সাংসদ এবং ‘হিন্দু মহাসভা’ দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের পর কেম্ব্রিজে আইনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর হয়ে, লন্ডনের মিডল টেম্পল বারে নথিভুক্ত হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। রাজ্য

জুড়ে গণ আন্দোলনের আবহে বামপন্থী রাজনীতিতে ঝোঁকেন এবং ১৯৬৮-তে সিপিআই-এম দলে যোগ দেন। ইতিহাসের কি করুন পরিহাস— যে সংসদমুখী সিপিআইএম দলে তিনি যোগ দেন তারাই একসময় তাঁর সংসদসর্বস্বতার জন্য বহিষ্কার করে। শান্তিনিকেতনে প্রোমোটিং ও নগরায়ন, শিল্পপতিদের সাথে দহরম মহরম, জ্যোতি বসুর মত শিল্পের পুঁজির খোঁজে লন্ডনে অবকাশ যাপন প্রভৃতি কার্যকলাপ যেমন তাকে বিতর্কে জড়িয়েছে, আবার তার মিশুকে চরিত্র, উদার মনোভাব, খেলাধূলা ও সমাজসেবায় উৎসাহ এবং সর্বোপরি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে অবারিত সহযোগিতা তাকে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। বামপন্থী বা মার্কসবাদীর চাইতেও তাঁর মধ্যে প্রকট হত বনেদি বাঙালি ভদ্রলোকের ছাপ। শেষ দিকে তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর গোয়ালপাড়ার ফ্ল্যাটেই বেশি সময় কাটাতেন।

মাধাই মহন্ত

'হামার গসাই মহন্ত মাধাই আকাশের তারা, তাহার তনে মনটো হামার দুখে দিশাহারা।'

গত ১৫ মে ২০১৮ দিনাজপুরের গর্ব, প্রবাদপ্রতিম খন পালাকার, শিল্পী, নির্দেশক মাধাই মহন্ত চলে গেলেন খনের সুর ঠোঁটে করে, সুদূরপ্রান্তে লোকগানের জগৎকে নিঃস্ব করে। যদিও তাঁর পরিণত বয়সেই (৮৭) বিদায়, তবুও সকলের মনে বিষাদের ছায়া। হারানোর বেদনা অস্ফুট কান্না। প্রায় নিরক্ষর, শুধুমাত্র নিজের নামটি সই করতে পারতেন। নামের মধ্যে 'ধা' শব্দটি মাঝে মধ্যেই ছোট বড় হয়ে যেতো।

লোকপ্রসার প্রকল্পে শিল্পী-ভাতা পেতেন নিয়মিত। তাঁর মাধুকরি করেই জীবনযাপন। অভাব অনটনেও মুখে অমলিন হাসি। গৃহহীন, এক শিষ্যবাড়িতে আশ্রয় সুকদেবপুরের কাছে মালিপাড়া গ্রামে। বাবা হাইয়া রায়, মা ননীবালা রায়। মাধাই মহন্তকে কেউ আটকাতে পারেনি তার বাউদিয়া জীবনে। সুরের আবেশে, পালা লিখে, গান গেয়ে তিনি আজ আকাশের তারা।

জন্ম বাংলা ১৩৩৯ সালে এক হতদরিদ্র সংসারে। প্রকৃত বাউদিয়া জীবনই ছিলো তাঁর। স্ত্রী শান্তিবালা তাঁকে সংসারে বাঁধতে পারেন নি। একমাত্র সন্তান মানিক যখন ছোট্ট, মায়ের কোলে, তখনই এই দল ওই দল করে বিভিন্ন আখরায় ঘুরেছেন। আলকাপ দলেও ছিলেন। মন সায় দিলোনা। বেছে নিলেন খন পালাগানের জগত। লিখলেন ৩৬টি পালা। 'মিনতিসরি' ও 'পুলিশ মার্ডার' পালার জন্য তিনি কারাবাসও করেন। অন্যান্য পালাগানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- কুসুমসরি মানিক বাউদিয়া, ফুলোসরি সাপুরিয়া মার্ডার, কারেন্টসরি, কমরেড মার্ডার, বাংলাসরি ইংলিশ বাউদিয়া প্রভৃতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লোকগানের দল 'লোকচৈতন্য গীতিনাট্য সম্প্রদায়।' তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র হয়েছে। 'খন খোঁজার পালা' এবং 'অথ দিনাজপুর' কথা। ২০১৭ সালে কুশমন্ডিতে রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে বিশিষ্ট লোকনাট্যশিল্পী হিসাবে সম্মান জানানো হয়। এছাড়াও বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন।

খন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের ভূমিজ রাজবংশী কৃষি ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের এক নিজস্ব লোকাচার নির্ভর পালাগান, লোকনৃত্য, কণ্ঠ সঙ্গীত, বাদ্যসঙ্গত ও পোশাক-আশাক, সাজ-সজ্জা। মূলত হাস্যরসের রূপকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনপ্রিয়ভাবে তুলে ধরা হয়।

দাবী

- কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক ব্রীজ ভাঙায় তদন্ত, শাস্তি এবং ব্রীজগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ
- ঐতিহাসিক **ভীমা-কোড়গাঁও** যুদ্ধের দ্বিশতবার্ষিকি উদযাপনে '**এলগার পরিষদ**' সংগঠনে, মহারাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদী পীড়নের বিরুদ্ধে নতুন করে দলিত জাগরণে মদত এবং মাওবাদী সংস্রবের অভিযোগে গ্রেফতার বিশিষ্ট সমাজসেবী, 'বিদ্রোহী' পত্রিকার সম্পাদক ও রিপাবলিকান প্যানথার দলের প্রতিষ্ঠাতা **সুধীর ধাওয়ালে**; বিশিষ্ট সমাজসেবী ও নাগপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপিকা **সোমা সেন**; বিশিষ্ট আইনজীবী ও অধিকার রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক **সুরেন্দ্র গ্যাডলিঙ**; সমাজ গবেষক **মহেশ রাউত** এবং বন্দী মুক্তি আন্দোলনের সংগঠক **রোনা উইলসনের** অবিলম্বে মুক্তি চাই
- কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা **ডাঃ নরেন্দ্র দাভালকার**, শ্রমিক নেতা ও সমাজসংস্কারক **গোবিন্দ পানসারে**, অধ্যাপক **কালবুর্গি** ও সাংবাদিক **গৌরী লঙ্কেশের** হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে।
- সারদা, নারদা, ভাগাড়, ব্যাপম কান্ড সহ দুর্নীতিগুলিতে দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে
- সমাজকর্মী **সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নওলখা, ভারভারা রাও, অরুণ ফেরেরা, ভার্নন গঞ্জালভেস, স্ট্যান স্বামী**দের মুক্তি চাই
- সমস্ত পক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়ে ও ইতিবাচক রাজনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে সন্ত্রাস, হিংসা ও ধ্বংসের পরিবর্তে কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও দন্ডকারণ্যে শান্তি স্থাপন
- পাকিস্তানের নবনির্বাচিত সরকারের সাথে অর্থবহ শান্তি আলোচনা চালিয়ে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপন
- চীনের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, ডোকলাম ও অরুণাচল সহ সীমান্ত সমস্যার অবসান

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬)

উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁর অন্যতম প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান নির্মাতা, সমাজ সংস্কারক, লেখক ও সম্পাদক। জন্ম সে সময়কার বিদ্বজ্জনদের চাঁদের হাট চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে বহতি প্রাচীন গঙ্গার পার্শ্ববর্তী হরিণাভি থেকে জয়নগর অবধি বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত চিংড়িপোতায়। পিতা ন্যায়রত্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেই সময়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন (১৮৫৬) যা দ্বারকানাথের পরিচর্যায় আরও কার্যকরি হয়ে ওঠে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করে প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে, পরে অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক হিসাবে সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন এবং কলেজ পরিচালনা ও অন্যান্য সামাজিক কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম সহযোগী হন। ১৮৪৫ এ তিনি 'বিদ্যাভুষণ' উপাধি পান। বিদ্যাসাগরের উৎসাহে তিনি ১৮৫৮ থেকে সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতে থাকেন। সেইসময় 'সোমপ্রকাশ' বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে পথিকৃত ও দিশারীর ভূমিকা নেয় এবং নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচার, ইংরেজ পদপ্রার্থী বাঙালি ভারতীয় অনুপস্থিত জমিদারদের কৃষক রায়তদের অন্তহীন শোষণ প্রমুখ সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়গুলিও পত্রিকায় স্থান পেত। এর জন্য রাজরোষে এক বছরের বেশি পত্রিকা প্রকাশ বন্ধও রাখতে হয়। এছাড়াও তিনি 'কলদ্রুম' নামে মাসিক বাংলা ম্যাগাজিন বের করতে শুরু করেন। নিজের জন্মভূমিতে নির্মাণ ও পরিচালনা করেন হরিনাভি ডি.ভি.এ.এস. হাই স্কুল। নারীশিক্ষা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'নীতিসার পথামৃতা', 'ছাত্রবোধ', 'ভূসংসার ব্যাকরণ' প্রমুখ তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। 'প্রকৃতি প্রেম', 'প্রকৃত সুখ', 'বিশেস্বর বিলাপ' তাঁর কাব্যগ্রন্থ। পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে আমাদের প্রণাম।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০১)

আক্ষরিক অর্থেই তিনি সর্বজয়া। বিভূতিভূষণ সত্যজিতের জগদ্‌বিখ্যাত 'অপু ট্রিলজি' (১৯৫৫-১৯৫৯)র সর্বজয়াকে কেউ ভোলেনি। তাঁর অন্যান্য স্মরণীয় অভিনয় : 'হেডমাস্টার', 'শুভবিবাহ', 'কত অজানারে', 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'টু লাইট এ ক্যানডেল', 'ইন্টারভিউ' প্রভৃতি ছবিতে। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল সেন-শম্ভু মিত্রের মত পরিচালকরা তাঁকে দিয়ে অভিনয়ের পরিকল্পনা করতেন। যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্ত্রী ও নিজেও স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বামীর কারান্তরালে তিনি অতি কষ্টে সংসার চালিয়েছেন, ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছেন। স্বাধীনতার পর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণ আন্দোলন করেছেন। হাটে-মাঠে-রাজপথে 'আইপিটিএ'-এর একের পর পর অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯১)

জনগণের শিল্পী কাকে বলে তা নিয়ে বিস্তর তর্ক হয়েছে তাঁর বেলেঘাটার ঘরে, কফি-হাউসে, মাঠে-ময়দানে, গণ আন্দোলনে। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে যারা দেখেছেন তাঁদের কাছে এসব তর্ক অর্থহীন। তিনি ছিলেন জনগণের শিল্পীর মূর্ত রূপ। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ঘরের আরাম, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সব তুচ্ছ করেছিলেন তিনি মানুষের সংগ্রামের জন্য। অথচ, শিল্পীর সংবেদনশীলতাকে কোথাও সঙ্কুচিত করেননি এতটুকুও। দেশের নানা আঙ্গিকের সাথে আন্তর্জাতিক শৈলী মিলিয়ে গড়ে নিয়েছিলেন একান্ত নিজস্ব এক চিত্রভাষা। চল্লিশের দশকের মার্কসবাদী ঘরানার যে এক ঝাঁক শিল্পী উঠে এসেছিলেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সকলের দেবুদা ছিলেন অগ্রগন্য। সুকান্তের কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদগুলি এবং 'মিঠে কড়া'র অলঙ্করণ তাঁকে সাধারণ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় জীবন হাতে করে রাস্তায় নেমেছিলেন। তুলি আর বন্দুক একইসঙ্গে ব্যবহার করার কথাও ভেবেছিলেন। বিশিষ্ট ভাস্কর চিন্তামণি কর একবার বলেছিলেন যে দেবু বড় বিপজ্জনক জীবনযাপন করে। 'ব্যালাড অফ দ্য টিলার' তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত অ্যালবাম। এখনও তাঁর আঁকা বহু ছবি, পোস্টার প্রকাশিত হয়নি। এই আগুন-তুলির চালকের জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধা।

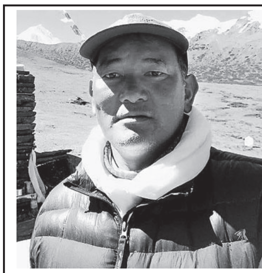

বিশ্বের সর্বোচ্চ ১০টি শৃঙ্গের ছটি বিজয়ী এবং আটবার এভারেষ্ট বিজয়ী দার্জিলিঙের পর্বতারোহী পেম্বা শেরপা কাশ্মীরের সাসের কাংরি ৪ শৃঙ্গ বিজয় করে ফেরার পথে ১২ জুলাই বরফের খাঁজে তলিয়ে যান।

➤ 'ব্রেক থ্রু' পুরস্কার বিজয়ী ব্রিটেনের অন্যতম অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট জোসলিন বেল কারলেন তিন মিলিয়ন ডলার দান করলেন পদার্থবিদ্যার আরও গবেষণার জন্য। তার কাজ মূলত রেডিও পালসার সম্পর্কে আবিষ্কার। পালসার হল ব্রহ্মান্ডে অবস্থিত প্রবল চৌম্বকত্ব সম্পন্ন দ্রুত ঘূর্ণায়মান অতিভরের নিউট্রন নক্ষত্রগুলি।

প্রধান রচনা

ট্যারেন্টুলা : রজ্জুতে সর্পভ্রম

শুভেন্দু বাগ

ট্যারেন্টুলার আক্ষরিক অর্থ নাকি "ঘোড়ার নাচ"। তা বটে। গত কয়েক বছরে ট্যারেন্টুলা নামটি বাঙালিকে যা নাচিয়েছে তাতে নামকরণ কিয়দংশে সার্থক বটে। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুলাই বাঙালির মননে একটি আলাদা স্থান করে নেয় এই বৃহদাকৃতি কালো বা বাদামী রঙের লোমশ প্রাণীটি। মিডিয়ার কল্যাণে ট্যারেন্টুলা নয় এমন নিরীহ মাকড়সাও এই কয়েকমাস ট্যারেন্টুলা সম্ভ্রম আদায় করে অবশেষে ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে পরলোকগমন করে।

বাঙালির সঙ্গে ট্যারেন্টুলার পরিচয় আফ্রিকান বা আমজনিয়ান সাহিত্যের হাত ধরে। "অ-য় অজগর আসছে তেড়ে"র পরিচয়ের উৎসও অভিন্ন। ফলে ভয় না পাওয়াটাই সাক্ষরতার অবমাননা বলে বাঙালি মণেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ফলে এই কয়েকমাস নিয়ম করে ভয় পায় বঙ্গবাসী। ট্যারেন্টুলার মৃতদেহ প্যাকেটে ভরে হাসপাতালমুখী হয় হতভাগ্য মানুষজন। সরকারি হাসপাতালের ভয়ঙ্কর ভিড়ের মাঝে এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া। একদিকে প্রাণের ভয়ে ভিত রোগী ও পরিজনদের ডাক্তারবাবুর কাছে হাজারো জিজ্ঞাস্য আর অন্যদিকে এ ব্যাপারে সঠিক প্রোটোকল না থাকায় ডাক্তারবাবুর বিড়ম্বনা-দুয়ে মিলে সাপের ছুঁচোগেলা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের সবাইকে।

আসলে ট্যারেন্টুলা বিকটদর্শন হলেও এর কামড় মোটেও প্রাণঘাতী নয়। পৃথিবীর বুকে প্রায় ৯৬৯ প্রজাতির ট্যারেন্টুলা বিদ্যমান যার মধ্যে মাত্র নয়টি বিষাক্ত প্রজাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে, তামিলনাড়ুর জঙ্গলেই এদের দেখা বেশি মেলে। পশ্চিমবাংলায় মাত্র দুটি বিষাক্ত প্রজাতির ট্যারেন্টুলা দেখতে পাওয়া যায়। তারমধ্যে আবার সেলেনোকসমিয়া প্রজাতির ট্যারেন্টুলার বিচরণ শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গে। একমাত্র কাইলোব্র্যাকিস প্রজাতির বিষাক্ত ট্যারেন্টুলা দক্ষিণবঙ্গে পাওয়া যায়। মার্চ থেকে জুলাই এদের প্রজননের সময়। সাধারণত এরা মনুষ্যদুর্গম অন্ধকার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকলেও এইসময় পুরুষ ট্যারেন্টুলাগুলি গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্ত্রী সঙ্গিনীদের খোঁজে বেরিয়ে মনুষ্যগোচর হয়। তখনই এরা আক্রান্ত হবার ভয়ে আগেভাগে আক্রমণ করে। ঘোড়ার মত সামনের পা দুটি তুলে মুখে সাধারণত হিসস্ হিসস্ আওয়াজ তুলে হিংস্র শ্বাপদের মত আক্রমণ করে এরা। প্রথমে বিষাক্ত লোমগুলি শিকারের দিকে ছুঁড়ে দেয় যা সাধারণত মানুষের শরীরে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকসন ঘটায়। তারপর দংশন করে সোমাটোটক্সিক বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেয় এরা। এই বিষ শরীরে প্রবেশ করা মাত্র তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে। সময়মত চিকিৎসায় এই বিষ মোটেও প্রাণসংশয়ী নয়। কিন্তু মানুষের অবহেলার সুযোগে এই বিষ ধীরে ধীরে সেলুলাইটিস তৈরি করতে পারে। যা কিনা আবার চূড়ান্ত অবহেলায় সুযোগসন্ধানী ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে প্রাণঘাতী সেপ্টিসেমিয়ার জন্ম দিতে পারে। কামড়ের পরেই জায়গাটিতে বরফ চেপে ধরলে সংকুচিত রক্তপরিবাহকের তত্ত্ব অনুযায়ী বিষের ছড়িয়ে পড়া রোধ করা যায়। তারপর ডাক্তারবাবুদের অভিজ্ঞ চোখের শরণাপন্ন হওয়াই মঙ্গলজনক।

গ্রামীণ পরিবেশে চিকিৎসার বদান্যতায় এযাবৎ প্রচুর ট্যারেন্টুলা কামড়ের রোগী দেখেছি। প্রত্যক ক্ষেত্রেই দেখেছি সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা প্রতিটি রোগীকে সুস্থ করেছে। প্রাথমিকভাবে টিটেনাস টক্সয়েড, অ্যান্টিহিস্টামিনিক, প্যারাসিটামল গোত্রের অ্যানালজেসিক ও সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করাই শ্রেয়। সেলুলাইটিস হলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট-গ্লিসারিনের সংমিশ্রণের ছোপ ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। যেহেতু ট্যারেন্টুলা কামড়ের ইতিহাসে এখনও অবধি কোনো মৃত্যুর ঘটনা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি তাই ভয়হীন আত্মবিশ্বাসী চিকিৎসা আপামর বাঙালিকে ভয়হীন করে তুলবে বলে আশা রাখি।

নিজের চিকিৎসক জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। সময়টা ২০১৬ সালের বর্ষাকাল। সন্ধ্যা আটটায় যখন রূপা নামের মেয়েটি ট্যারেন্টুলার কামড় খেয়ে ডেবরা হাসপাতালে উপস্থিত হল তখন আমার ডিউটি শেষ। পরের ডাক্তারবাবুও উপস্থিত। বেরিয়ে যাবার আগে মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। কাঠের জ্বালানিতে রান্না করার সময় ষোড়শীর পায়ের নীচে পড়ে থাকতে দেখে ওরা সেটিকে মেরে এনেছে। মেয়েটির চোখ তখন ঢুলুঢুলু (শিবনেত্র), কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। সারা শরীর অবশ। ওর অসহায় মায়ের আকুতি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। যেহেতু ওর উপসর্গের প্রায় সবগুলিই যন্ত্রণাহীন কালাচ সাপের কামড়ের সাথে মিলে যাচ্ছিল তাই রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধন্দ তৈরি হল সবার। কালাচ সাপের কামড় না নিউরোটক্সিক ট্যারেন্টুলা এই গেরোয় পড়লাম সবাই। কালাচ হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ভেবে আগেভাগেই ১০ ভায়াল এভিএস দেওয়া হল। রোগী সারারাত আমাদের ধন্দে রেখে পরের দিন সুস্থ হল ঠিকই। কিন্তু আজও সন্দেহ রয়েই গেছে।

নিউরোটক্সিক ট্যারেন্টুলার উপস্থিতি ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলার মত দেশে। আমাদের দেশে কোনো ডকুমেন্টেড নিউরোটক্সিক ট্যারেন্টুলার কামড়ের ইতিহাস নেই। তাই এনিয়ে আমাদের মাথাব্যাথাও কষ্টকল্পনা।

ট্যারেন্টুলার কামড় বাঙালির মনে গণহিস্টিরিয়ার জন্ম দিলেও এর কামড় বিষাক্ত সাপের কামড়ের তুলনায় নিতান্তই গুরুত্বহীন। বরং বোলতার কামড়ের মত নগণ্য। আমাদের অজ্ঞতাই আমাদের মনে এই অহেতুক ভয়ের জন্ম দিয়েছে। শুধুমাত্র যকৃৎ, বৃক্ক রোগে আক্রান্ত বা সুরাসেবী জনগণ যার কিনা আগে থেকেই কম রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন তাদের ক্ষেত্রেই এর বিষ ভয়ঙ্কর হতে পারে।

লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে ট্যারেন্টুলাকে পোষ্য বানিয়ে রাখতে পারলে আর কম্বোডিয়ার মানুষ ট্যারেন্টুলার ফ্রাই খেতে পারলে আমরা বাঙালিরা এহেন আপাতনিরীহ প্রাণীটিকে নিছকই ভয়ের বশে খুন করে জীবহত্যার পাপ বহন করব কেন?

নিপা ভাইরাস রোগ নিয়ে কিছু কথা

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম মৃধা

ঈশ্বরের আপন দেশ কেরলে জুলাই মাসে ঘটে গেল স্বাধীনোত্তর ভারতের সবচাইতে বিধ্বংসী বন্যা। তার আগে মে মাসে ভয়াল নিপা ভাইরাস আক্রমণে আক্রান্ত হলেন কোঝিকোড, মাল্লাপুরম, ওয়াইনাদ ও কান্নুর জেলার কয়েকজন, এদের মধ্যে মৃত্যু হল ১৪ জনের। কেরলে তো বটেই সারা ভারত জুড়ে আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হল। পুনের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (এন.আই.ভি)' ও মণিপালের 'মণিপাল সেন্টার ফর ভাইরাল রিসার্চ (এম.সি.ভি. আর)'-র গবেষণাগারে সংক্রামিতদের দেহস্থ রস পরীক্ষা করে নিপাভাইরাসের অস্তিত্ব মিলল। কিন্তু যে বাড়িটি থেকে রোগের উৎপত্তি সেখানকার কুয়োতে বাস করা বাদুড়দের দেহে পাওয়া গেল না নিপা ভাইরাস। আর কেরলে জ্বাল না দেওয়া খেজুর রস খাওয়ার প্রচলন নেই। ফলে কোথা থেকে কিভাবে সংক্রমণ জানা গেল না। কেউ কেউ ফলভুক নিপাভাইরাস বহনকারী বাদুড়ের চাটা বা খাওয়া ফল খেয়ে সংক্রমণ হয়েছে এমন ধারণা করলেন, কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু আতঙ্ক আধুনিক সোশাল মেডিয়ার দৌলতে এমন জায়গায় পৌঁছল যে অনেকে ফল খাওয়া ছেড়ে দিলেন। প্রকৃতি ও প্রাণের খেয়ালে নিপা ভাইরাসের মহামারী এক সময় কমে গেল। কেরল সরকারও তার নিপা ভাইরাসের মহামারী প্রতিরোধ, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং রোগীদের চিকিৎসায় খুব ভাল কাজ করলেন।

নিজের জীবন দিয়ে রোগীর সেবা

সংক্রমণের ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন আপনজনেরা। কিন্তু সব চেষ্টা করে রোগীকে বাঁচাতে না পারলেও নিজের হাতে বিশেষ গিয়ার ও এন ৯৫ মাস্ক পরে তাঁদের অন্ত্যেষ্টি করেছেন চিকিৎসক **এস.গোপা কুমার**। আর তাকে সহায়তা করেছেন এন.আই.ভি-র বিজ্ঞানী **রেশমা সহায়**। আর নিপা ভাইরাস আক্রমণে কেরলে হাসপাতালে প্রথম মৃত রোগী মহম্মদ সাদিকের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে জীবন দিলেন দুই শিশু সন্তানের জননী নার্সিং স্টাফ **লিনি পুতুসেরি**।

এবার আমরা রোগটি সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

রোগটির নাম : হিউম্যান নিপা ভাইরাস (Niv) ইনফেকশন

১৯৯৮ তে মালয়েশিয়ার শুঙ্গাই নিপাগ্রামে শুয়োর পালকদের মধ্যে এই রোগ প্রথম দেখা যায়। শুয়োরেরা কম রোগগ্রস্ত হল, কিন্তু এনকেফেলাইটিসের লক্ষণ নিয়ে মানুষের মধ্যে এই রোগ মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৯৯ অবধি মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে ২৭৬ জন আক্রান্ত হলেন। অনেকে মারা গেলেন। ১৯৯৯ তে ভাইরাসটি চিহ্নিত হল।

ভারতে ২০০১-এ পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে এবং ২০০৭-এ পশ্চিমবঙ্গেরই নদীয়ায় নিপা ভাইরাসের আউটব্রেক বা ছোট মহামারী হল। শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘুরে আসা এক সংক্রামিত ব্যবসায়ীর চিকিৎসা করতে গিয়ে ৩৩ জন স্বাস্থ্য কর্মী আক্রান্ত হলেন। এক চিকিৎসক সহ কয়েকজন মারা গেলেন। তখনও রোগটি সম্পর্কে কেউ জানে না। পরে এন.আই.ভি তে প্রমাণিত হয়। মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ প্রমাণিত হল। সমসময়ে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি নিপার আউটব্রেক হয়। ২০০১-২০১২ অবধি বাংলাদেশ-ভারতে নিপার কবলে ২৮০ জন মারা যায়। ২০০১-এ শিলিগুড়ি নিপা আউটব্রেকে ৬৬ জন আক্রান্তের মধে ৪৫ জনের এবং ২০০৭-এ নদীয়ায় আউটব্রেকে পাঁচজন আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

■ **নিপা রোগের জীবাণু কি?** এক ধরনের মারাত্মক মারণঘাতী প্যারামিক্সো ভাইরাস। নাম হিউম্যান নিপা ভাইরাস (Niv)।

■ **নিপা ভাইরাস কোথায় থাকে?**

এক ধরনের ফলভুক বড় বাদুড়ের (ফ্লাইং ফক্স অথবা **পিটারোপাস মিডিয়াস**) দেহে এই ভাইরাস থাকে। এরা এর জন্য অসুস্থ হয় না।

■ **কিভাবে ছড়ায়?**

শুয়োরের খোঁয়াড়ের উপরে ওড়ার সময় অথবা বসবাস কালে এদের কামড়ানো, ঠোকরানো বা খাওয়া লালা মিশ্রিত ফল নীচে

পড়লে সেগুলি খেয়ে শুয়োরেরা অসুস্থ হয়। কিন্তু শুয়োরের অসুস্থতা মারাত্মক হয় না। এবার এই সংক্রামিত শুয়োরদের পরিচর্যা করা পালকদের মধ্যে সংক্রমণ হয়। মানুষ সংক্রামিত হলে সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে। সংক্রামিত বাদুড়ের খাওয়া অথবা চাটা ফল বা খেজুর বা তাল বা পাম রস খেলেও এই রোগ হতে পারে।

এছাড়াও মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ হয়। মূলত লালা, কফ, মূত্র, বীর্য, রক্ত প্রভৃতি শারীরিক বর্জ্যে, দেহ নিঃসরণ ও দেহরস থেকে এই রোগ ছড়ায়। সর্দি, অশ্রু, ঘাম, যোনি রস, মল প্রভৃতি থেকেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। এছাড়াও রোগীর হাঁচি, কাশি প্রভৃতি ড্রপলেটস্ থেকে রোগ ছড়ায়। ঘোড়া থেকেও ছড়ায়।

সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। এবং শরীরে জীবানুর প্রবেশ থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ (Incubation Period) সাধারণত ৬ থেকে ২১ দিনের মধ্যে।

■ **সন্দেহজনক রোগীর নমুনা সংগ্রহ, প্রেরণ প্রভৃতি :**

সাধারণত গলার মধ্যে লেগে থাকা তরল (Throat swab), মূত্র (১০ মিলিলিটার), রক্ত (অন্তত ৫ মিলিলিটার), মস্তিষ্কের নিঃসরণ বা Cerebrospinal Fluid (CSF) অন্তত এক মিলিলিটার অসংক্রামিত পরিস্কার পাত্রে বাইরেটা ১ : ১০০ ভাগ ব্লিচিং পাউডার বা ৫% লাইসল সলিউশন দিয়ে পরিস্কার করে ২-৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দুদিনের মধ্যে পরীক্ষাগারে পাঠাতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দেবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অন্তত চারদিনের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

Niv BSL-4 মাত্রার জীবাণু তাই সন্দেহজনক রোগী এবং প্রমাণিত রোগীকে ধরা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা, নমুনা সংগ্রহ, নমুনা পাঠানো প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সতর্কতা ও ব্যবস্থা নিতে হবে আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী (Universal, standard droplet and bio-containment precaution). এই রোগীর চিকিৎসক, নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের পরতে হবে Personal Protective Equipments (PPE) যাতে থাকবে N95 মুখোশ, দ্বিস্তরীয় গ্লাভস, গাউন, গগলস্, গামবুট ইত্যাদি।

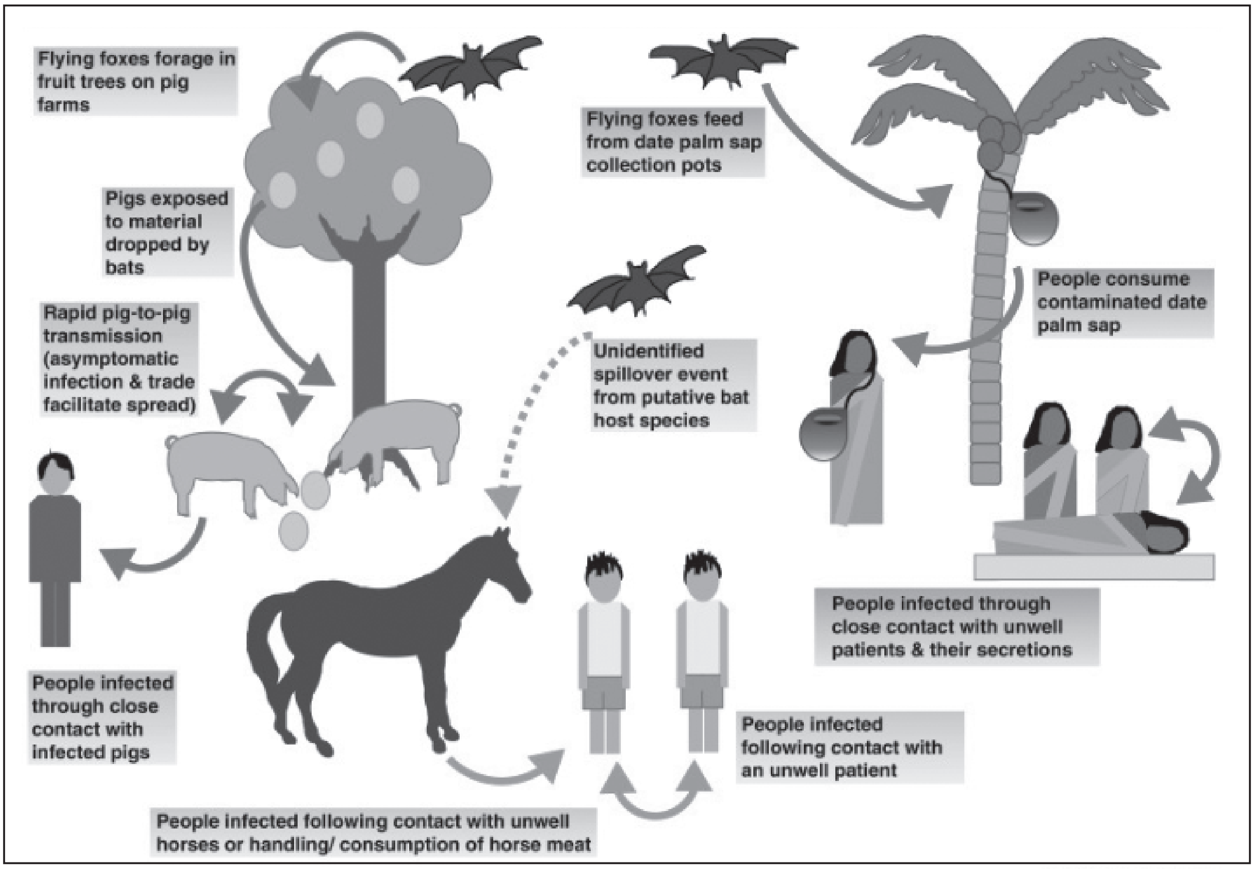

■ **রোগ নির্ণয় :**

সংক্রামিত রোগীর দেহরস ল্যাবরেটরিতে 'রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ পলিমারেজ চেন রিয়াকশন' প্রক্রিয়ায় ভাইরাসের আর.এন.এ. নির্ণয় অথবা এলাইজা পদ্ধতিতে অ্যান্টিবডি নির্ণয় পরীক্ষায়, যা ভারতে কেবলমাত্র হয় পুনের এন.আই.ভি এবং মণিপালের এম.সি.ভি.আর এ, রোগ নির্ণয় করা হয়।

■ **রোগের লক্ষণ :** জ্বর, মানসিক বিভ্রম, প্রবল দুর্বলতা, মাথাধরা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, বমি, মাংসপেশীতে ব্যথা, খিচুনি (convulsion), পাতলা পায়খানা ইত্যাদি। এই রোগে মস্তিষ্কের প্রবল প্রদাহ (Acute Encephalitis) ও প্রবল শ্বাসকষ্ট (Acute Respiratory Distress) হয়।

■ **সংক্রমণ থেকে মৃতের হার (Case Fatality Rate বা CFR) :** ৪০-৭৫%, কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০%.

■ **নজরদারি (Surveillance) :** কোন জায়গায় এক সাথে কিছু এনকেফালাইটিস দেখলে দ্রুত তাদের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, পৃথকীকরণ (Isolation), চিকিৎসা ও নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে।

■ **রোগের সংজ্ঞা (Case Definition) :**

(ক) **সন্দেহজনক নিপা রোগী (Suspected Nipah Case)**

জ্বরের সাথে মানসিক বিভ্রম ও /অথবা খিচুনি ও /অথবা মাথা ব্যথা ও /অথবা কাশি বা শ্বাসকষ্ট।

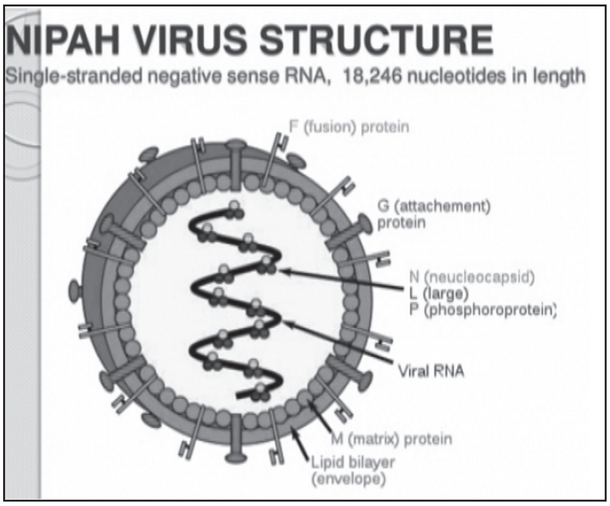

(খ) **সম্ভাব্য নিপা রোগী (Probable Nipah Case)**

সন্দেহজনক রোগী যারা রোগের আউটব্রেক চলাকালীন একই এলাকায় ছিলেন এবং ওই এলাকা থেকে রোগীর নমুনায় নিপা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এছাড়া ওই এলাকার কোন মৃত রোগী যার নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা যায় নি।

অথবা

সন্দেহজনক রোগী যারা কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রমাণিত নিপা রোগীর সরাসরি সংস্পর্শে এসেছেন কোন আউটব্রেক চলাকালীন বা যদি সেই সন্দেহজনক রোগী নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা সম্পূর্ণ করার আগেই মারা যান।

(গ) প্রমাণিত নিপা রোগী (Confirmed Niph Case) :

সন্দেহজনক নিপা রোগীর বর্জ্য, দেহনিঃসরণ বা দেহরসে যদি পরীক্ষাগারে—

- মুখ নিঃসৃত লালা, থুথু, কফ অথবা মূত্র কিংবা সি.এস.এফে পিসিআর পদ্ধতিতে নিপা ভাইরাসের আর.এন.এ.পাওয়া যায়
- ওই ধরনের বর্জ্য, দেহনিঃসরণ বা দেহরসে নিপা ভাইরাসকে চিহ্নিতকরণ ও পৃথকীকরণ করা যায়
- রক্তে এলাইজা পদ্ধতিতে নিপা ভাইরাসের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়

■ **নিপা রোগীর সংস্পর্শে আসা** (Contact) **ব্যক্তিদের সংজ্ঞা :**

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ (Close contact) তখনই বলা যাবে যখন কোন প্রমাণিত বা সম্ভাব্য নিপা রোগীর সাথে কোন ব্যক্তি—

- একই বাড়িতে বসবাস করেন ও একই বিছানা ব্যবহার করেন
- সরাসরি জীবিত বা মৃত রোগীর শারীরিক সংস্পর্শে আসেন
- মৃত রোগীর সৎকারের সময় সংস্পর্শে আসেন
- রোগীর পোশাক, বিছানাপত্রের সংস্পর্শে আসেন
- সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের Incubation period এর সর্বোচ্চ সময় অর্থাৎ ২১ দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

■ **নিপা রোগের খোঁজ পেলে কোথায় জানাবেন :**

- ব্লকের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক
- মহকুমার সহমুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক
- জেলার উপমুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ২
- রাজ্যের যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা (জনস্বাস্থ্য ও সংক্রমণ রোগ)

লিনি পুতুসেরি

কয়েকটি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থার ঠিকানা :

dirnicd@nic.in,idsp-npo@nic.in,ncdcshoc@gmail.com

■ **নিপা রোগের চিকিৎসা :**

সরাসরি কোন চিকিৎসা এখনবধি নেই। কোন প্রতিষেধক এখন অবধি তৈরি হয় নি।

রিবাভিরিন দিয়ে মৃত্যুহার কিছুটা কমানো গেছে। কিন্তু রিবাভিরিন ব্যয়বহুল। বর্তমানে একটি কোর্সের দাম প্রায় নয় হাজার টাকা।

রোগীর লক্ষণ ভিত্তিক বিশেষ করে অ্যাকিউট এনসেফালোপ্যাথি ও রেসপিরেটরি ডিসট্রেসের রোগীকে IU/CCU তে রেখে Intensive & Supportive Care ও Life Support দিতে হয়।

প্রতিষেধন (Prevention) ও প্রতিরোধ (Resistance) বৃদ্ধিই এখনবধি এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

■ **প্রতিষেধন ও প্রতিরোধ বৃদ্ধি :**

- অপ্রয়োজনে ও পর্যাপ্ত ঢাকা পোশাক না পরে জঙ্গলে না ঢোকা
- গাছের তলা বা অন্যত্র থেকে ফল কুড়িয়ে না খাওয়া
- কামড়ানো, আধ খাওয়া ফল না খাওয়া
- ফল ভাল করে ধুয়ে খাওয়া
- জ্বাল না দিয়ে খেজুর, তাল প্রভৃতি রস না খাওয়া
- বাসস্থান এলাকায় বাদুড়ের বসতি হতে না দেওয়া
- নিয়ম মেনে শুয়োর পালন। খোঁয়াড় পরিচ্ছন্ন রাখা। গ্লাভস্-মাস্ক ব্যবহার। কাজ শেষে ভাল করে হাত,পা, মুখ, নাক ধোওয়া
- বাসস্থানের থেকে শুয়োরের খোঁয়াড় দূরে রাখা
- তাজা, পুষ্টিকর, সুষম খাদ্য খাওয়া
- শরীরচর্চা করা
- কোন নেশা না করা
- জ্বরের সাথে পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি দেখা গেল দ্রুত পৃথকীকরণ, নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসা।
- পর্যাপ্ত পোশাক (PPE) পরে রোগীদের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা
- স্বাস্থ্যকর্মীদের পরীক্ষা
- সারা বছর নজরদাড়ি

ধিক্কার ও প্রতিবাদ

- সিরিয়ায় রাসায়নিক হানায় শিশু মৃত্যু
- কাঠুয়া, কুশমণ্ডি, উন্নাও, দিল্লী, নয়ডা, গুরুগ্রাম, মহেন্দ্র গড় সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারী ও শিশুদের অত্যাচার, ধর্ষণ ও খুন
- গোরক্ষক কর্তৃক দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন
- ডা: কাফিল খান সহ যারা সরকারের নিষ্ক্রিয়তা তুলে ধরেছেন তাদের হেনস্থা
- পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন ও বোর্ডগঠনে সীমাহীন সন্ত্রাস।
- কেন্দ্রের ও রাজ্যের বিজেপি সরকারগুলির জনবিরোধী কাজের প্রতিবাদী ও নাগরিক কর্মীদের গ্রেফতার
- জাতীয় নাগরিক পঞ্জির নামে ৪০ লক্ষ অসমবাসীকে নাগরিকত্বহীন করা ও ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানো
- মায়নমারে রোহিঙ্গা মুসলমান ও হিন্দুদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার
- প্যালেস্টাইনে গণ বিক্ষোভকে সামরিক আক্রমণ চালিয়ে ইজরায়েলের দমন প্রচেষ্টা
- ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি; দেশ জুড়ে পেট্রোপন্য ও দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি

অভিনন্দন

- অসমের যোরহাটের যাদব পায়েং বা মোলাইকে ব্রহ্মপুত্রের ধুঁ ধুঁ বালুচরে একক চেষ্টায় লক্ষাধিক গাছ লাগিয়ে সাড়ে পাঁচশ হেক্টরের ‘মোলাই কাঠানবাড়ি’ অরণ্য সৃষ্টির জন্য
- ‘মি টু’ আন্দোলনের সূচনাকারী সাহসিনী অভিনেত্রী রোজ ম্যাকগোয়ানকে
- অধ্যাপক কে.এস. ভগবনকে সমস্ত হুমকির মুখেও অবিচলভাবে কুসংস্কার বিরোধিতা, ধর্মান্ধতার বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য
- আয়ারল্যান্ডে আইনি গর্ভপাতের পক্ষে জনতার রায়ের জন্য
- এশিয়াডে পদক জয়ী ভারতীয় অ্যাথলিটদের
- অনূর্ধ ২২ ও ১৬-র ভারতীয় ফুটবল দলকে আর্জেন্টিনা ও ইরাককে পরাস্ত করার জন্য
- এশিয় দল হিসাবে বিশ্বকাপ ফুটবলে জাপান, কোরিয়া ও ইরাণের ভাল খেলার জন্য

হোক না সেটা আমার দেশ কিংবা পড়শি বাংলাদেশ, মৌলবাদের শিকার আজ শাহজাহান থেকে গৌরি লঙ্কেশ

বাংলাদেশের মুক্তমনা কবি, প্রকাশক ও বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা শাহ্জাহান বাচ্চুকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ জানাই। সংহতি জানাই বাংলাদেশে স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ট পরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে আন্দোলনকে

- কার নিকোবরে এক ধরনের ট্র্যাকোমা বা চোখের অসুখের মহামারী দেখা যাচ্ছে।
- একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে গঙ্গায় গণস্নান ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টি- বায়োটিকের রেজিস্ট্যান্সের জন্ম দিচ্ছে।
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, গাভি ও মার্কের সাহয্যে ‘ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো’ ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যাকে ইবোলার টীকা (rVSV - ZEBOV Ebola Vaccine) দিতে শুরু করেছে। এই ভ্যাক্সিনটি ২০১৫-র গিনি ট্রায়ালে সাফল্য দেখিয়েছিল।
- চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি প্রার্থীকে হারিয়ে ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন বামপন্থী ছাত্রনেত্রী কানুপ্রিয়া। তিনিই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রথম মহিলা সভাপতি।

বিশেষ রচনা

অসমীয়া জাতিসত্তা রক্ষা বনাম নাগরিকত্ব রক্ষা

অমিতাভ সেনগুপ্ত

[অমিতাভ সেনগুপ্ত বারবার অসমে গিয়ে সেখানকার সমস্যা এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি উদ্ভুত জটিলতাগুলি বোঝার চেষ্টা করেছেন। আলোচনা করেছেন বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে এই প্রতিবেদন— সম্পাদক মন্ডলী]

ভারতীয় জনতা পার্টি এখন ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়, কয়েকটি রাজ্য সরকারেরও নিয়ন্ত্রক, ভারতের সূচাগ্র মেদিনী পর্যন্ত দখল করা চাই। অগাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কালো টাকা ধরার ফতোয়া দিয়ে আর ক্যাশলেস পেমেন্টের ম্যাজিক দেখিয়ে দেশকে অর্থহীন করে দিয়েছে, জবরদস্তি আধারের গর্ভে ঢুকিয়ে প্রতিটি নাগরিককে আঁধারে ফেলে দিয়েছে এই দলের সরকার। সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এবার তার নতুন অভিযান নাগরিকত্ব প্রমাণ। ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ (এন আর সি), তার আগে চাই নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন— ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র সংশোধন, এই আইনের ধারাগুলোতে একটি নতুন বিধির সংযোজন, ধারা ৬-এ যুক্ত হতে চলেছে উপধারা ৬(এ)। বিজেপির উদ্দেশ্যে এই বিধি দিয়ে পরোক্ষে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী হিন্দুদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি প্রদান আর মুসলমানদের নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগকে নস্যাৎ করা। ভারতের সীমানার বাইরে বিদেশে মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের যে লোক আছে তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভারতে যে কোন সময়ে চলে এলে তার দায় নেবে ভারত সরকার (বোঝাই যায় এই বিষয়ে হিন্দুদের কথা ভাবা হচ্ছে)। অর্থাৎ পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বা মুসলমান যেই অনুপ্রবেশ করুক না কেন শুধু হিন্দুদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

অসমীয়ারা এই নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন বিলে খুবই উদ্বিগ্ন এবং এই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। এই নিয়ে বর্তমানে অসমে বিভিন্ন স্তরেই আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলছে।

অসম রাজ্য তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (যা ব্রিটিশ ভারতে এবং ১৯৪৭-এর পরে বৃহত্তর অসম ছিল) বহু জাতি-জনজাতি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রবাহ ছিল। ক্রমে জনজাতি ভিত্তিক আলাদা আলাদা রাজ্য (মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ইত্যাদি) হল অসমকে খণ্ডিত করে। অসমীয়ারা অসমে সীমাবদ্ধ হলেন। কিন্তু তাদের সংস্কৃতিগত-ভাবে জাতিগত প্রতিকূলতা বা সংখ্যালঘুতার সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার (যা মূলত নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত কেন্দ্রীক শাসক গোষ্ঠী, বেনিয়া গোষ্ঠী) অর্থনৈতিকভাবে অসমকে উপেক্ষা করল, বরঞ্চ বলা ভাল ঠকাল। অসমের মূল প্রাকৃতিক সম্পদ তথা শক্তি খনিজ তৈল পেট্রোল। এইটি অসামের অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ভিত্তি হতে পারত, কিন্তু ডিগবয়, ডিব্রুগড় ইত্যাদি জায়গা থেকে তেল আহরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারতের শাসক শ্রেণী তা নিয়ে গেল বরৌনিতে সংশোধনের জন্য।

অসমের সংস্কৃতি এক মিশ্র বৈচিত্রময় সংস্কৃতি। কিন্তু অসমীয়া তথা অসমীয়া ভাষী জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান; জেলায়, গ্রামে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ। আর বাংলা ভাষা-ভাষী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসমীয়ারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার পরিস্থিতির সম্মুখীন।

এমতাবস্থায় বিজেপি শাসকরা অসমের সমস্যাকে অনুধাবন না করে, সহানুভূতিশীল না হয়ে তাদের হিন্দুত্বের গাইড লাইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে নাগরিকত্ব নথিকরনের স্টীমরোলার চালাচ্ছে যার হাতিয়ার হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন। বিজেপি 'হিন্দুরাষ্ট্র'র কল্পনায় আর অসমে তাদের পাকাপোক্ত ভোট-ব্যাঙ্ক তৈরিরউদ্দেশ্যে অসমীয়া জাতিসত্তার মূল্যে বিদেশী অনুপ্রবেশকারী 'বাঙালী হিন্দুদের' নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিয়ে চাইছে।

এই সংশোধন বিল বাতিলের দাবিতে অসমের অগ্রণী ব্যক্তিরা, বিভিন্ন সংগঠন এবং বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলো (**সি পি আই, সি পি আই (এম), সি পি আই (এম এল), ফরওয়ার্ড ব্লক** প্রভৃতি) আওয়াজ তুলেছে।

বিগত ২০১৬-র ১৫ জুলাই পার্লামেন্টে যে প্রথম সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল উত্থাপন করা হয় অসমের উপর তার বিপদজ্জনক

ফলের পরিণতি জানিয়ে ও তা বাতিলের দাবিতে অসমের রাজ্যপালকে গুয়াহাটির অগ্রণী মেধাজীবীরা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬-তে একটি প্রতিবেদন দেয়। এটিতে স্বাক্ষর করেন প্রবীণ সাংবাদিকদ্বয় **মনজিৎ মহান্ত** ও **হায়দার হুসেন**, নর্থ ইষ্টার্ণ হিল য়ুনিভার্সিটির দুই প্রাক্তন অধ্যাপক **ড. মনোরমা বরুয়া** ও **ড. অপূর্ব বরুয়া**, কটন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ **উদয়াদিত্য ভরালী**, প্রাক্তন মুখ্যসচিব **হরেন্দ্রনাথ দাস**, প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিস **হরেকৃষ্ণ ডেকা** এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অগ্রণী শিক্ষাবিদ **ড. হীরেন গোহাঁই**।

এই প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়েছে—

(ক) ১৮৩৭ থেকে ১৮৭৩ পর্যন্ত অসমে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রয়োগ করে, তারা বুঝতেই চান নি অসমীয়া ভাষার স্বকীয় অস্তিত্ব ও সে ভাষার ইতিহাসকে সমাজের সচেতন ব্যক্তিদের দীর্ঘ আন্দোলন ও প্রচেষ্টা রাজ্যের সাধারণ মানুষদের রক্ষা করে।

(খ) ১৯০৫ থেকে ১৯১১, অসমকে জবরদস্তি পূর্ববঙ্গের অঙ্গীভূত করে দেয়, ফলত স্থানীয় জনগণের পরম্পরা ও আকাঙ্খা অনুসারে অগ্রগতির বিকাশ হয় না, পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে।

(গ) স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্তে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বার্থে অসমকে তৃতীয় শ্রেণীর (গ্রুপ 'সি') পর্যায়ে ফেলা হয়। ফলত সেই গ্রুপের রাজ্য হিসেবে তথাকথিত অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য অসমের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। অসমীয়া জনগণ ও অগ্রণী ব্যক্তিদের অনমনীয় ও চূড়ান্ত প্রতিরোধের ফলে সেই বিপজ্জনক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

(ঘ) স্বাধীনতার পর ইতিহাসের নানা ঘূর্ণাবর্ত ও বাঁকের মধ্য দিয়ে স্থানীয় মূল-নিবাসী ও অসমীয়ারা মিলে সংখ্যাধিক্য নিয়ে অসম রাজ্যটিকে নিজ বাসভূমির অধিকারী মনে করতে পারল।

কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতার পরে পর্যন্ত মুসলমান অভিবাসীর জনস্ফীতির সমস্যা অসমের স্থিতিত্বকে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। ছয় বছর ধরে রাজ্য তোলপাড় করা আন্দোলন শেষ হল যখন চুক্তি করে নির্দিষ্ট হল যে ১৯৭১-এর ২৪ মার্চ রাজ্যের নাগরিকত্ব নির্ধারণের সীমারেখা। অবশ্য অভিবাসী মুসলমানরা প্রথম দু'দশক ধরে এর বিরোধিতা করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এই ভিত্তি তারিখটা তারা মেনে নেয় এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সর্বসম্মতভাবে এই তারিখে সহমত হয়। একাদিক্রমে অশান্তি চলা রাজ্যটিকে শান্তি ও স্থিতি বোধ আসে। উল্লেখ্য এই 'অসম চুক্তি'র আলোয় সংবিধান সংশোধিত হয়েছিল অর্থাৎ এই ভিত্তি তারিখের সাংবিধানিক সমর্থন আছে।

অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রস্তাবিত আইন সংশোধনটি রাজ্যের সর্বসম্মত স্থিতাবস্থাকে শঙ্কটাপন্ন (সন্ত্রস্ত) করে তুলেছে, কারণ এটি চালু হলে জনগোষ্ঠীর বিন্যাসকে (ডেমোগ্রাফিক সিচুয়েশন)-কে ভয়ানকভাবে ওলট-পালট করে দেবে। রাজ্যের বর্তমান নাগরিকদের জমিজমার মালিকানা, সরকারি চাকরিতে সুযোগ, উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ, উপরন্তু সরকার পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে।

এই মুহূর্তে অবশ্যই জোর দেওয়া দরকার, জাতীয় নাগরিকত্ব নথিভুক্তিকরণ সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে ১৯৭১-কে চিহ্নিত সীমারেখা ধরে করা হোক এবং এতে প্রত্যাশা করা যায় সেই অনুসারে নথিভুক্তকরণ শেষ হলে সুদূর প্রসারে প্রকৃত নাগরিক থেকে বহিরাগতদের নির্দিষ্ট করা যাবে। এই প্রক্রিয়া অনুশীলনে মূলনিবাসী জনগণ প্রত্যাশাবাদী, অন্যথায় নাগরিকত্ব আইনে 'প্রস্তাবিত' সংশোধন চাপিয়ে দিলে তা নেতিবাচক ফল হবে। এতে আশঙ্কা আছে যে কষ্টার্জিত সামাজিক শান্তি ভেঙে যাবে এবং রাজ্যটি ভয়ঙ্কর সংঘাতে নিমজ্জিত হবে।

এইরকম পরিস্থিতি রাজ্যের মূলবাসী জনগণের কাছে মোটেই কাম্য নয়। মূলবাসী জনগণের মধ্যে আশঙ্কা পরিব্যাপ্ত যে, আইনটির প্রস্তাবিত সংশোধন তাদের স্বকীয় স্বীকৃতি, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব তথা জাতিসত্তার অস্থিত্ব সংকটাপন্ন করবে।

এটাও মনে রাখা দররকার মূলবাসী জনগণের এক বৃহৎ অংশ চা-বাগান আর বন্ধ হয়ে যাওয়া চা-বাগানের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজও পশ্চাদপদ ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা বাংলাদেশ থেকে আগত এগিয়ে থাকা হিন্দু অভিবাসীদের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রতিযোগিতায় কোন গন্যতায় আসে না। ১৯৭১-এর পরে যারা অসমে এসেছে তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিলে ওদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাবে এবং নিশ্চিহ্নতার মুখেও পড়ে যেতে পারে।

যাই হোক, এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সন্দেহাতীতভাবে আমাদের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান দাবি করে যে, মূলবাসী অসমীয়াদের ভাগ্য যাতে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে তার আলোচনা খুবই আবশ্যক।

২০১৭-র ৩০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতিকেও '**বাংলাদেশী হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং অসমে তার পরিণাম**' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। তাতে স্বাক্ষর করেছেন **হোলিরাম তেরাং, ড. দিলীপ বোরা, শান্তনু বরঠাকুর, অধ্যাপক অজিত চন্দ্র তালুকদার, পরেশ মালাকার, ড হীরেন গোঁহাই, হরেকৃষ্ণ ডেকা** (রিটায়ার্ড আই পি এস), **জ্যোতিপ্রসাদ সাইকিয়া** (রিটায়ার্ড আই এ এস), **অধ্যাপক আবদুল মান্নান** প্রমুখ। এই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে— বর্তমান এন ডি এ সরকার সংসদে সংশোধনী দ্রুত পাশ করানোর জন্য অসমীচীনভাবে তাড়াহুড়ো করছে বলে মনে হচ্ছে। এই বিষয়টির বিবেচনা করার কথা যে যৌথ সংসদীয় কমিটির তারা এই অঞ্চলে এসে জনমত যাচাইয়ের ব্যাপারটা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়ায় স্থানীয় জনগণ কিছু ছলাকলার আশঙ্কা করেছেন। বিজেপির বিধায়করাও মাঝে মাঝেই সংসদকে এড়িয়ে একটি অধ্যাদেশ জারির কথা বলেছেন... ইত্যাদি।

এই বছর জানুয়ারিতে গঠিত হয়েছে **নাগরিকত্ব আইন সংশোধন বিরোধী মঞ্চ**। এই মঞ্চে বিশিষ্ট মেধাজীবীরা ছাড়াও আছেন **অটোনমাস স্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিল, তই অহম যুব পরিষদ, হিল স্টেট ডিমাণ্ড কাউন্সিল, ট্রাইবাল সংঘ, অল আসাম বাঙালি যুব সত্র ফেডারেশন, অসম জাতিয়তাবাদী যুব সত্র পরিষদ, অল তাই অহম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, টিওয়া সাহিত্য সভা, আঞ্চলিকতাবাদী অসম গণপরিষদ, কৈবর্ত যুব সম্মিলন** এবং **সম্মিলিত খিলানজিয়া পরিষদ**।

এই মঞ্চ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''আমরা তাই অসমের সমস্ত অংশের জনগণকে এই সমস্ত দুমুখো উদ্দেশ্য প্রণোদনার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে এবং এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ফাঁদে না পড়তে বলছি, যার পরিণাম খুবই সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক। তার পরিবর্তে, সরকার যাতে বিলটি প্রত্যাহার করে নেয় তার জন্য সকলকে একসাথে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।''

অসমের প্রতিটি বামপন্থী দল নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনে নতুন ধারা সংযোজনে আপত্তি জানিয়েছে। **সি পি আই, সি পি আই** (এম), **সি পি আই** (এম এল), **আর সি পি আই, সারা ভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক, অসম সংগ্রাম মঞ্চ, সমাজবাদী পার্টি, আম আদমি পার্টি** প্রভৃতি ১১টি দল মিলে এক **বাম গণতান্ত্রিক মঞ্চ** গঠন করে বিবৃতি দিয়েছে, ''প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ যেহেতু একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সে জন্য সাম্প্রদায়িক ধারায় অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্ব প্রদান আমাদের সংবিধানের বুনিয়াদি স্পিরিটের বিরোধী।''

মৈমল উন্নয়ন সমিতি-অসম নাগরিকত্ব সংশোধন বিলের বিরোধিতা করেছে, সমিতির সভাপতি সোনারুল শাহ মুস্তাফা এক বিবৃতি দিয়ে বলেন এই বিলটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আনা, ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এর কোন স্থান নেই; তিনি আরও বলেন বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক নির্দিষ্ট চুক্তি হওয়া দরকার।

গত ১৭ এপ্রিল থেকে দিল্লীতে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে যে শুনানী শুরু হয় সেখানে অসমের বিভিন্ন জনজাতি ও আদিবাসীদের ১৬টি সংগঠন এবং ত্রিপুরার একটি উপস্থিত থেকে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিরোধিতা করে। তাদের বক্তব্য প্রস্তাবিত সংশোধন সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাকে লঙ্ঘন করছে, ১৯৭১-র পর বাংলাদেশের সকল বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ করা চলবে না, **অল বড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন** সভাপতি প্রমোদ বোরা বলেছেন, বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে এই বিল এনেছে। বোরা বলেন যে ভারত সরকারকে ঠিক করতে হবে তারা উত্তর-পূর্বের জনজাতি জনগণ না অনুপ্রবেশকারী কাদের স্বার্থে কাজ করবে? সরকারকে পরিষ্কার জানাতে হবে তারা কি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বসবাসকারী আড়াই কোটির ওপর হিন্দুকে ভারতে আনবে? উপরন্তু **অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের** উপদেষ্টা সমুজ্জল ভট্টাচার্য বলেন যে অসম বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের জমা করার আস্তাকুড় হতে পারে না এবং সবরকম জনজাতি-আদিবাসী গোষ্ঠীদের এক হয়ে এই বিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অসম সরকার ও ভারত সরকারকে চূড়ান্ত পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

বিগত ১৭ এপ্রিল গুয়াহাটি, মারিগাঁও, গোলাঘাট সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় **কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি** প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে পথে পথে আন্দোলনে নামে। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়লে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। কৃষক সমিতি অভিযোগ করে অসমীয়া জাতিসত্তা নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্রে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সংশোধনী বিলটি আনছে। এক কোটি নব্বই লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব দিয়ে অসমীয়া জাতিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলতে চাইছে।

অসমের ঐতিহ্যবাহী **অসম সত্র মহাসভা**র প্রতিনিধি দিল্লীতে যুক্ত সংসদীয় কমিটিতে উপস্থিত হয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে সম্মতি জানিয়ে স্মারকপত্র দিলে তার বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন হয়। উক্ত সত্র মহাসভা ও অন্যান্য সত্রসভার সদস্যরা ও কর্মাধ্যক্ষা, এই স্মারকলিপির প্রবল নিন্দা করেন। অসমের সত্র সংস্কৃতির পীঠস্থান মাজুলী। উল্লেখযোগ্য শ্রীমন্ত শংকর দেবের মূল কর্মকেন্দ্র ছিল মাজুলী। এখানকার তিনটি সত্র উক্ত স্মারকপত্রের তীব্র নিন্দা করে। আউনীআটিয়া সত্রর সত্রাধিকার ড. পীতম্বর গোস্বামী বলেন যে, অসমের সত্র সমাজ তথা সত্রাধিকারসমা অসমের জনগণের কোনো ধরনের ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বিদেশী অবশ্যই বিদেশী, বিদেশীর জাত পাত নেই।

বিগত ৭ মে যৌথ সংসদীয় কমিটি প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল পরিস্থিতি সামাল দিতে স্তোক বাক্য বলেন যে, ''অসমের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত না হলে আমার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকার কি অর্থ?'' তিনি বিক্ষোভ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে আশ্বাস দেন যে যৌথ সংসদীয় কমিটি অসমের দাবি বিবেচনা করবে। কিন্তু অপরদিকে অসমের বিজেপির প্রভাবশালী নেতা অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তার দলীয় দৃষ্টিতেই অনুপ্রবেশকারী হিন্দু বাঙালির পক্ষে কথা বলেছেন। আর ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলেছেন নাগরিকপঞ্জী সম্পূর্ণ হলে দেখা যাবে যে বেশী বাঙালী হিন্দু অনুপ্রবেশকারী নেই।

অসমে এন.আর সি : বিজেপি বনাম আসু, অগপ ও অন্যরা

হিমন্ত হইকিয়া

অর্ধ শতকেরও বেশী ধরে অসমে ক্রমাগত অভিবাসনের ফলে অসমিয়া ও স্থানীয় জনজাতিরা জেরবার ও কোনঠাসা। এই সূত্র ধরেই অসম আন্দোলন এবং অসমে বঙাল ও বিদেশী খেদাও আন্দোলনের সূত্রপাত। জন্ম আসু, অগপ, আলফার। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক কংগ্রেস একদিকে মুসলমান ও বাঙালী ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী, অন্যদিকে অসমিয়া ও জনজাতির দাবীকে সমর্থনের ধীর ও ভারসাম্যের খেলা খেলে এসেছে। আন্দোলনের তীব্রতায় নমনীয় হয়ে কংগ্রেসকে একসময় আন্দোলনকারীদের সাথে চুক্তি করতে ও কয়েক বছরের জন্য ক্ষমতা ছাড়তে হয়।

আসুর নেতৃত্বকারী অংশ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ভারতীয় ও আঞ্চলিক শাসক শ্রেণী তাদের লোভ, দুর্নীতি, দুর্বলতা ও স্বজনপোষণকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত বর্তমান ব্যবস্থাপনায় আত্মস্থ ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। উগ্র অংশটিকে সামরিক বাহিনী দিয় কোণঠাসা ও দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়। অসম চুক্তি কার্যকর হয় না। অতীতের পূর্ব পাকিস্তানের মত বাংলাদেশ থেকে অনবরত গরীব ভূমিহীন চাষীরা আসতে থাকে। যারা বেশীরভাগই মুসলমান। নামনি অসমের বরপেটা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া কাজ ও লাভের খোঁজে ক্রমাগত আসতে থাকে বিহারী, মারোয়াড়ী জনসমষ্টি। বাঙালী হিন্দুদের এক সম্পন্ন অংশ আগে থাকতেই ছিল। ফলে ব্যাপক পশ্চাদপদতা, অনুন্নয়ন, অবহেলা, বেকারত্ব ও দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে অতীতের বঙাল ও নেপালী খেদার মত বোড়ো-সাঁওতাল, বোড়ো-বাংলাদেশী, অসমিয়া-বাঙালী, অসমিয়া-বিহারী দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষগুলি বেড়ে চলে। অপদার্থ অগপ সরকারকে মানুষ পরাস্ত করে। ভারসাম্যের খেলা নিয়ে ফের ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস।

এমতাবস্থায় মারোয়ারী ব্যবসায়ী, অসমিয়া বর্ণহিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে চিরাচরিতভাবে শক্তিশালী হিন্দুত্ববাদী আর.এস.এস.-র আগ্রাসী ও উদীয়মান রাজনৈতিক দল বিজেপি উত্তর-পূর্বের মূল কেন্দ্র অসম দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। বিদেশী প্রশ্ন ও মুসলমান আধিক্য ইস্যুটিকে নিয়ে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক মেরুকরণ ঘটায়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং প্রবল শক্তিধর ক্রনি পুঁজিপতিরা সমর্থন জোগায়। তাদের শ্লোগান হয় 'মাটি ভেটি আরু জাতি (Land, Home and Community)'। ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে অসম ছাত্র আন্দোলনের জাতিবাদী অংশ যেমন সর্বানন্দ সোনোয়াল, কংগ্রেসের করিৎকর্ম নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রমুখ বিজেপিতে যোগ দেয়। বিজেপি ক্ষমতায় এসে এন.আর.সি. প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙালী হিন্দু শরনার্থী বনাম বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী বিভাজনের রাজনীতি শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে অনেক স্থায়ী বাঙালী নাগরিকেরও নাম বাদ যায়। বাদ যায় অনেক গরীব প্রান্তিক জনজাতির নাম। নাম তোলা, বাদ দেওয়া নিয়ে চলে ব্যাপক জটিলতা, আমলাতান্ত্রিকতা, হয়রানি, সময় নষ্ট ও দুর্নীতি। আর ১৯৫৫-র নাগরিক আইন, ১৯৮৫-অসম চুক্তি এবং ২০১৬-র নাগরিক বিলকে বিকৃত করে অসমের বিজেপি সরকারের অন্যান্য মৌলিক ও উন্নয়ন ইস্যু এড়িয়ে কেবলমাত্র জাতি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরী করার বিরুদ্ধে অখিল গগৈয়ের নেতৃত্বে 'কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি' সহ বিভিন্ন নাগরিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠন আন্দোলন শুরু করে। প্রতিবাদ করেন বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীরা।

সবাচাইতে মজার ব্যাপার অসম আন্দোলনের নেতৃত্বকারী সংগঠন আসু, অগপ প্রমুখরা, একসময় যাদের সাথেই বর্তমান বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালরা ছিলেন, বিজেপিকে দোষী করেছেন ষড়তন্ত্র করে বিদেশী বাংলাদেশীদের (পড়ুন বাংলাদেশী হিন্দু অভিবাসী) নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। তারাও বিজেপি সরকারের এন.আর.সি.র বিরুদ্ধে বড় বড় আন্দোলন গড়ে তুলছেন। তাদের দাবী অসম চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১-র ২৪ মার্চের পর যে সমস্ত বিদেশী অসমে এসেছেন তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় সংহতির বিকৃত মডেল— ভারতের বুকে পুনর্বিভাজনের পূর্বাভাষ

বাপ্পাদিত্য রায়

[অসম, ঝাড়খণ্ড, খালিস্তানী, সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ তে 'সংকলন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি আজও অর্থবহ। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।]

দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘিঞ্জি শহর আমেদাবাদ, ১৮ই মার্চ; রাত আটটা। সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকারীরা যে যার ঘর থেকে থালা হাতে বেরিয়ে এসেছেন সরকারের সংরক্ষণ নীতির 'মৃত্যুধ্বনি' বাজাবেন বলে। এটা গুজরাটে আন্দোলনের এক জনপ্রিয় রূপ। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল অগুন্তি মারণঘাতী জ্বলন্ত 'কাকদা' (কাপড়ের বল পাকিয়ে কেরোসিনে ডুবিয়ে প্রস্তুত স্থানীয় ক্ষেপণাস্ত্র), তার সাথে অসংখ্য সোডার বোতল, অ্যাসিড-বাল্ব, বোমা-গুলি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল

আমেদাবাদের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল; তারপর ঠুঁটো জগন্নাথ পুলিশ ও প্রশাসনের সামনে কয়েকদিন ধরে চলল খুন, জখম, লুঠ ও অগ্নিসংযোগের এক নারকীয় 'মাস্তানরাজ'। রাণে কমিশন প্রস্তাবিত সংখ্যাগরিষ্ঠ পেছিয়ে থাকা জাতিগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান দিকটি উপেক্ষা ক'রে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মাধবরাও সোলাঙ্কি, যিনি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগুলোর ভোটে নির্বাচিত এবং প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারে তাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সহজে চমক দিতে গিয়ে আচমকা পশ্চাদ্পর জাতিগুলোর সংরক্ষণ কোটা অনেক বাড়িয়ে দিলেন। আন্দোলন শুরু করলেন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। একমাস আন্দোলন চলার পর সোলাঙ্কি প্রশাসন যখন পর্যুদস্ত, সেই সময় কে বা কারা আমেদাবাদের বাতাসে ছড়িয়ে দিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, অলিতে গলিতে খেটে খাওয়া মানুষের শোণিত ধারায় বসন্ত উৎসবে মাতল ঘাতকের দল। আটত্রিশতম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমরা ৭০ কোটি ভারতবাসী গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করলাম এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তৃত রূপ জামসেদপুর, নেলী, আলীগড়, মোরাদাবাদ, বিহারশরীফ, টুণ্ডা, বারাইচ, হুবলী, ভিলওয়ান্দি, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী, রাঁচি, বোকারোর রক্তস্নাত পথেপ্রান্তরে।

ইতিহাস কি বলে :

অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় রাজতন্ত্রের যুগে রাজকীয় বৈভব বৃদ্ধির মূল উৎস ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-জনতার রক্ত আর ঘাম। বিদেশী আক্রমণের যুগে রাজা-বাদশাহ্রা দিগ্বিজয় ও খাজনা তোলার সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রায়ত-প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাতেন কিন্তু তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কখনই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে ইউরোপে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি, অর্থকরী ও বাণিজ্য পুঁজির শ্রীবৃদ্ধির এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের দরুণ উৎপাদিকা শক্তি অগ্রগতি লাভ করে। বিশ্ববাজার সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন উপনিবেশের খোঁজ শুরু হয়। প্রথমে পর্তুগীজ এবং সব শেষে ইংরেজরা আসে ভারতে; কালক্রমে শক্তিপরীক্ষায় জিতে যায় ইংরেজরা। ভারতের অফুরন্ত কাঁচামাল এবং বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ফলে ইংল্যাণ্ডে হল শিল্পবিপ্লব আর ভারতের বুকে ঘটল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শোষণে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর বাংলার গ্রামগুলো ধ্বংস হ'ল। পরে ১৯৫৮ সালে বাণিজ্যপুঁজিকে পুরোপুরি শিল্প পুঁজিতে পরিণত করতে এবং সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতকে ইংল্যন্ডের রাণীর প্রশাসনিক আওতায় নিয়ে আসা হ'ল। সেই থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশাল ধাক্কার পর রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর অবধি এই বিশাল ভারতবর্ষকে শোষণ ও শাসনের জন্য ইংরেজরা অবলম্বন করেছিল 'ডিভাইড এণ্ড মিসরুল' নীতি এবং ইংরেজদের এই নীতি ভারতবর্ষকে উপহার দিল সাম্প্রদায়িকতা, যার বিষাক্ত ধারা আজও বর্তমান।

দাঙ্গার দর্পণে :

প্রথমেই বলতে হয় ভিলওয়ান্দির কথা। বম্বের এই জনবহুল এলাকাটিতে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকরা থাকেন এবং আশেপাশের পাওয়ার লুমগুলোতে কাজ করেন। বিকাশশীল বাণিজ্য নগরী বম্বেতে থাকার জায়গায় প্রচণ্ড অভাব। দরকার নতুন নতুন বহুতল অট্টালিকা। হঠাৎই এখানে দাঙ্গা শুরু হল; প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে মদ ও চিনি সম্রাট সোমাইয়া ও গুণ্ডা সর্দার বাল থ্যাকরে একদিকে এবং অপরদিকে চোরা চালানকারী ও সমাজ বিরোধীদের শিরোমণি হাজী মাস্তান ও করিম লালা পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়লেন। মাঝখান থেকে খুন হল, পুড়ে মরল, ভিটে ছাড়া হল 'দিনে এনে দিন খাওয়া' সাধারণ মানুষ। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই ভিলওয়ান্দির কবরে মাথা তুলে দাঁড়াবে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি। আলিগড় ও মোরাদাবাদের কথায় এলে দেখা যায় যে সাম্প্রতিককালে আলিগড় মুসলমানদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন তালা শিল্প এবং মোরাদাবাদের মুসলমান কারিগরদের (আর্টিশন) উৎকর্ষতা, প্রতিষ্ঠিত কিছু বড় ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে দেওয়াই দাঙ্গার কারণ। অসম আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখনই হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণা এবং আন্দোলনকারীদের নির্বাচন বিরোধিতা, সমতলের মুসলমান ও আদিবাসীদের উস্কানি নেলীতে এক ভয়াবহ দাঙ্গার রূপ নেয়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-শিখের মধ্যে সাম্প্রতিককালে দিল্লী, রাঁচী, বোকারো, কলকাতায় যে দাঙ্গা দেখা দেয় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এই বিশেষ দাঙ্গা পরিস্থিতিতে দাঙ্গার মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে দ্রুত বিকাশমান শিখ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কেন্দ্রগুলো। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের গার্ডেনরীচে হোলির দিন ডাব পাড়া নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর প্রচেষ্টা ও তারই সূত্রে চোরাচালানকারী, সমাজবিরোধী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও আমলাদের মৌচাকে ঢিল মারার অপরাধে অপরাধী সৎসাহসী পুলিশ অফিসার বিনোদ মেহতাকে হত্যা এবং জামশেদপুরের দাঙ্গাও উল্লেখ করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালের দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য :

ইদানীং সে সকল দাঙ্গা দেখা গেছে তাকে ভালভাবে অনুসরণ করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। প্রথমতঃ সাামান্য কোন ঘটনায় শুরু, আচমকা বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়া, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংস সাধন করার সাথে সাথে বিশেষ লক্ষ্যবস্তুকে (পারটিকুলার টার্গেট) আক্রমণ করা বা লুঠ করা, বিশেষ ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও প্রশাসনের নিস্পৃহ থাকা এবং আচমকা থেমে যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ যখনই কোন অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলো কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন, তখনই সেখানে কে বা কারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে দেয় যার লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেন ঐ অঞ্চলের প্রতিদ্বন্দ্বীরা, আর দাঙ্গার শিকার হন পেছিয়ে থাকা দরিদ্র বস্তী ও শ্রমিক কলোনীগুলো। তৃতীয়তঃ যখনই কোন অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকরা কোন দাবীদাওয়া নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন করেন, তখনই সেই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা যায় এবং এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্কে গভীর দাগ সৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে জাগিয়ে তুলে ধর্মকে রাজনীতির সাথে মিশিয়ে জনমানসের প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারগুলোকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে ধর্মপ্রচারের আড়ালে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানো, অপরাধীদের ধর্মীয় স্থানে অস্ত্রসহ আশ্রয়

ও প্রশ্রয় দেওয়া। পঞ্চমতঃ সামাজিক কীট লুম্পেনদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি, রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ মদত পাওয়া এবং দাঙ্গাগুলোতে প্রধান ক্রিয়াকর্তার ভূমিকা পালন করে যথেচ্ছ খুন, জখম, রাহাজানী চালানোর পাশাপাশি নিজেদের আখের গোছানো এবং দাঙ্গা শেষে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো। ষষ্ঠতঃ 'একাত্মতা যজ্ঞ' সহ বিভিন্ন জাঁকজমকের বাড়বাড়ন্ত এবং আর এস এস, শিবসেনা, জামায়েত-ই-ইসলামী, বব্বর খালসা প্রভৃতি সংগঠনের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি, বেনামে ও নতুন নতুন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ছড়িয়ে দেওয়া। তাই তামিলনাড়ুর এরুমাড়ু থেকে জম্মু, মহারাষ্ট্রে মালেগাঁও থেকে নেলী প্রভৃতি নতুন নতুন এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রতিকারের লক্ষ্যে :

(১) ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসাবে এবং স্বাধীনভাবে ধর্মানুচারণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপ থেকে ধর্মকে পৃথক করতে হবে। (২) দলিত ও সংখ্যালঘুদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে। তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে এবং সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সমান সুযোগ স্বাধীনতা ও অধিকার দিতে হবে। (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলে তাঁদের জীবনে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ইত্যাদি কাটিয়ে তুলে তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করতে হবে। (৪) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বাড়িয়ে তুলে যৌথ কাজকর্মে উৎসাহিত করতে হবে এবং জাতপাত ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে তাঁদের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে সামিল করতে হবে।

জাতীয় সংহতি কেন বিপন্ন :

ব্রিটিশ শাসকরা বৃহত্তর ভারতে ভোগদখলের স্বার্থে ওপর থেকে এক জাতীয় সংহতির মডেল চাপিয়ে দিয়েছিল। অপরদিকে তারা বৃহত্তর ভারতীয় বাজারকে একত্রীভূত করার লক্ষ্যে রেল, টেলিগ্রাফ ও পোস্টাল যোগাযোগ তৈরী করেছিল এবং কেরাণীকুল তৈরীর উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল— এই সুযোগগুলো নীচ থেকে জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে যেটুকু জাতীয় সংহতি গড়ে উঠেছিল তা ব্রিটিশ বিরোধী যৌথ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এবং এই যৌথ সংগ্রামের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু পরবর্তীকালে সুবিধাজনক অবস্থান, অর্থনীতির অসম বিকাশ এবং জাতিসত্ত্বাগুলোর পশ্চাদবর্তিতার সুযোগে অগ্রসর জাতিগুলোর বৃহৎ ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, সামন্তপ্রভু ও আমলাদের নির্মম শোষণ ও লুঠপাট, আত্মনিয়ন্ত্রণসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও মর্যাদার পরিবর্তে জাতিসত্ত্বাদের সামনে নিয়ে এল অবহেলা ও বঞ্চনার পাহাড়। এইভাবে প্রকৃত জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা মার খেল, ওপর থেকে চাপানো হল জাতীয় সংহতির এক বিকৃত মডেল; আর এরই ফলশ্রুতি একের পর এক জাতিসত্ত্বাগুলোর বিক্ষোভ-আন্দোলন-বিদ্রোহ। মূল সমস্যার সমাধান ছাড়া অন্যভাবে এদের দমনের চেষ্টা চলল। ফলে ঘটনা আরও জটিলতার দিকে মোড় নিল। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিদেশী বৃহৎ শক্তিরা হস্তক্ষেপ ঘটালেন। তাই কোন কোন আন্দোলন নিল বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ।

আন্দোলনের অভ্যন্তরে :

অসম আন্দোলনের নেপথ্যে—

অন্যান্য জাতিগুলোর মত ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই অসমের মূল অধিবাসী অহম ও অন্যান্য আদিবাসী জাতিসত্ত্বাগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে। অসমের লোকসংখ্যার স্বল্পতা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমান কৃষক এবং নেপালী ও ঝাড়খণ্ডীরা দলে দলে আসতে থাকেন এবং কালক্রমে তারা অসমীয়া জাতিসত্ত্বার সাথে মিশে যান। কিন্তু জমির স্থিরতা অথচ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষিত বেকারের আধিক্য প্রভৃতি কারণে পরবর্তীকালে বিশেষত ৭১-এর পরে বাংলাদেশী শরণার্থীদের আগমন জটিলতা সৃষ্টি করে; অসমীয়াদের ভাষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অস্তিত্ব হারানোর সম্ভাবনাটি জাগিয়ে তোলে, যার ফল হ'ল 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলনের গণচরিত্রলাভ এবং সমতলের আদিবাসীদের পৃথক রাজ্যের দাবী। আসলে অসম আন্দোলনের মর্মবস্তু হল অসমীয়া জাতিসত্ত্বার পশ্চাদ্‌বর্তিতার প্রতিক্রিয়াজনিত বহিঃপ্রকাশ।

পাঞ্জাবে অশান্তির কারণ—

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের বাণিজ্যিক শর্ত শুরু থেকেই শিল্পীয় পুঁজিপতিদের অনুকূলে হলেও, কৃষিতে 'সবুজ বিপ্লব' এক শক্তিশালী পুঁজিবাদী জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিয়েছে যারা অধিক লাভের জন্য প্রধানত পাঞ্জাবে, হরিয়ানায়, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে কৃষি উপকরণের দাম কমানোর ও ফসলের সংগ্রহমূল্য বাড়ানোর দাবী তুলে ধরেছে। কিন্তু তাদের দাবী প্রথমোক্তদের বাজারের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী। সেইজন্যেই উভয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে এবং এই ঘনীভূত দ্বন্দ্বই পাঞ্জাবের অশান্তির মূল কারণ, আর এই নবোদ্ভব শ্রেণী যারা একাধারে একচেটিয়া আমলাতান্ত্রিক পুঁজির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে আবার অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষক, মারাঠা শিখ (নীচু জাত) ও বিহার থেকে আসা ক্ষেতমজুরদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়, তারাই আকালী দলের মূল ভিত্তি। এছাড়াও পাঞ্জাব সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে দেখা যায় শিখধর্মের নিজস্ব কিছু দাবী (যেমন হিন্দুধর্মের অংশ নয়, শিখধর্ম একটি স্বাধীন ধর্ম) এবং পাঞ্জাবী জাতিসত্ত্বার দাবী (যেমন স্বায়ত্তশাসনের দাবী, ভাষা, ভূখণ্ড ও ইরাবতী-বিয়াশের জল বণ্টনের দাবী প্রভৃতি)। প্রশাসনের অবহেলা ও নেতৃত্বের অন্যান্য দাবীর সাথে ধর্মীয় ও জাতিসত্ত্বার জনপ্রিয় দাবীগুলোর অন্তর্ভুক্তি ব্যাপক জনসমষ্টিকে আন্দোলনে সামিল করতে সক্ষম হয় এবং ক্রমে একটি শক্তিশালী আন্দোলন জন্ম নেয়। ধর্মীয় দাবীগুলো জড়িয়ে থাকায় ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা ছিলই, উপরন্তু ভিন্দ্রেনওয়ালের মত ধর্মোন্মাদ লোকদের প্রশ্রয় দিয়ে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদকেই বাড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। স্বর্ণমন্দিরে সেনাপ্রবেশ ও দাঙ্গা পাঞ্জাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। শিখরা নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করতে থাকেন এবং যে খালিস্তানের দাবী একসময় চৌহান জাতীয় কিছু লোকের উর্বর মস্তিষ্কে ঘোরাফেরা করছিল

তাও অনেকটা চটকদারী হয়ে ওঠে। তাই পাঞ্জাব সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে কৃষিপণ্য সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা, শিখ ধর্মকে পাঞ্জাবী জাতিসত্ত্বার আন্দোলন থেকে পৃথকীকরণ ও হিন্দু-শিখদের মধ্যে সম্প্রীতি যদি গড়ে না তোলা যায় তাহলে পাঞ্জাব আমাদের আফ্‌সোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলন—

এই আন্দোলনের মুল দাবী হল একটা পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের (প্রভিনস) দাবী যার মূলে রয়েছে ঝাড়খণ্ডী জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণ। বহুদিন থেকেই ঝাড়খণ্ডীরা নিপীড়িত, বৃহৎ শিল্পপতিদের অতিমুনাফার শিকার। শাসকশ্রেণীর মধ্যে তাদের কোন গোষ্ঠী নেই এমনকি তাদের নিজেদের অঞ্চলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা অবহেলিত ও কোণঠাসা। উপরন্তু সাম্প্রতিককালের বনজ সম্পদের বাণিজ্যিকরণের মধ্যে দিয়ে তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রাও বিঘ্নিত। এই অঞ্চল ভারতীয় খনি ও শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠলেও আদিবাসীরা পড়ে রয়েছেন প্রাক্ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে, তাঁরা প্রতিনিয়ত নিপীড়িত হচ্ছেন— বৃহৎ শিল্পপতি, আমলাতান্ত্রিক পুঁজি, কন্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ী, সামন্তপ্রভু ও পুলিশের দ্বারা। ফলে মুণ্ডা, ওরাঁও, সাঁওতাল, হো, সাদান, প্রভৃতি ঝাড়খণ্ডীদের মধ্যে বিকাশগত ও অবস্থানগত পার্থক্য থাকা সত্বেও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে উঠেছে।

মেইতি-নাগা-মিজো জাতিসত্ত্বাগুলোর লড়াই—

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সীমান্তে অবস্থিত মণিপুর, নাগাল্যান্ডও মিজোরাম— এই তিনটি পাহাড়ী রাজ্যে বাস করেন মেইতি, নাগা, মিজো, কুকি, কার্বি প্রভৃতি জাতিসত্ত্বার বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো। ব্রিটিশ দখলের আগে এদের প্রত্যেকের স্বাধীন রাজ্য ছিল। আবার ব্রিটিশ বিরোধী যৌথ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এরা অন্যান্য ভারতীয় জাতিগুলোর সংস্পর্শে আসে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের চরম উদাসীনতা, সেনাবাহিনী কর্তৃক এদের মহিলা, যুবক প্রভৃতিদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন এই জাতিসত্ত্বাগুলোকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। সেই কারণেই এই রাজ্যগুলোতে এত গণরোষ, মিলিটারী বুটের দাপাদাপি এবং এন এস সি এন, পি এল এ— প্রভৃতিদের সংগঠিত একের পর এক অ্যামবুশ।

উপসংহারের পরিবর্তে :

এর আগে '৪৭-এ আমাদের দেশ বিভক্ত হয়েছিল, কিন্তু আমরা তা রোধ করতে পারিনি। আজকে আবার সাম্প্রদায়িকতা ও বিপন্ন জাতীয় সংহতি ভারতের বুকে বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে, প্রিয় মাতৃভূমিকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

> "আমরা চাই সেই স্বাধীন ভারত, যেখানে সকল মানুষের থাকবে সমান অধিকার, যেখানে সামাজিক নিপীড়ন থাকবে না, অস্পৃশ্যতা যেখানে পাপ বলে বিবেচিত হবে, জন্মগত কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে না।" — **আম্বেদকর**

কেরলের বন্যা : এক নজরে

(সরকারী পরিসংখ্যান)

- বসবাসের বাড়ি ধ্বংস : ৯০০
- বসবাসের বাড়ি প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ : ২৬,০৫৬
- ত্রাণ শিবিরে ছিলেন : ২,২৪,৬৪৯ জন
- ফসল নষ্ট : ৪০,৩২৩ হেক্টরের
- পশু মৃত্যু : ৪৬,০১৬
- হাঁস মুরগীর মৃত্যু : ২,০০,১১৬
- পি.ডাব্লিউ.ডি.-র রাস্তা নষ্ট : ১৫,৯৭০ কিমি
- স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের রাস্তা নষ্ট : ৮১,৯৪৪ কি.মি.
- সেতু ধ্বংস : ২২১
- বৃহৎ পানীয় জল প্রকল্প ধ্বংস : ২৮৬
- ক্ষুদ্রপানীয় জল প্রকল্প ধ্বংস : ৩,৮০০
- বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার নষ্ট : ১০,০৭৬
- বিদ্যুতের তার নষ্ট : ৯০,৪৮৮ কিমি.

➤ পরিবেশ দূষণের কারণে বজ্রপাত ও বজ্রপাতে মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়ায় ওড়িশা সরকার চিরাচরিত প্রথা মেনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তালগাছ পোতা শুরু করেছেন। উঁচু তালগাছ সহজেই বজ্রপাতের বিদ্যুৎ মাটিতে পরিবহন করে মানুষ ও অন্যান্য কাঠামোর কম ক্ষতি করবে।

ব্যক্তিত্ব

অটলবিহারী বাজপেয়ী

(১৯২৪-২০১৮)

নরম হিন্দুত্ববাদের সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় মুখ। দুটি অসম্পূর্ণ ও একবার সম্পূর্ণ সময়ের মোট তিনবারের প্রধানমন্ত্রী; জনতা সরকারের বিদেশ মন্ত্রী; জনসংঘ, জনতা দল ও বি.জে.পি.-র অন্যতম প্রধান নেতা; বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক, কবি ও দক্ষ আবেগঘন বক্তা, সাংসদ, রাজনীতিক ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নেতা। সুরসিক, ভোজনবিলাসী

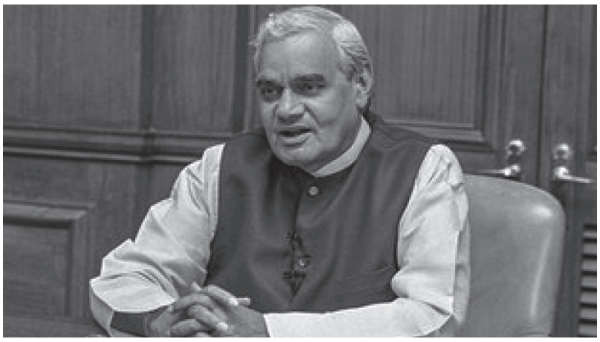

বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা ও তীক্ষ্ণ শব্দচয়নে পারদর্শী। আপেক্ষিক উদারতাবাদ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং মোর্চা রাজনীতি ও সরকার চালানোয় আর দল ও সরকারের ক্ষেত্রে কট্টরবাদ ও বাস্তববাদকে নিয়ে ভারসাম্যের খেলায় পারঙ্গম। ১৯২৪ এ গোয়ালিয়রে শিক্ষিত হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার পর লখনৌতে আইন নিয়ে পড়াশোনা। অল্প বয়সেই 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর.এস.এস.)'-র সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের সংগঠক হন। মাঝে কিছুদিন সি.পি.আই.-র ছাত্র সংগঠন 'এ.আই.এস.এফ.' এ যুক্ত হন আবার অচিরেই 'এ.ভি.বি.পি.' শিবিরে ফিরে আসেন। ৪২-র 'ভারত ছাড়ো' আগষ্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গ্রেফতার হন। কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে আর যুক্ত থাকবেন না মুচলেখা দিয়ে ছাড়া পান। ১৯৫১ এ জনসঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ এ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর অভিযানে তাঁর সহযোগী ছিলেন। ১৯৭৫ এ বলরামপুর আসন থেকে প্রথমবার সাংসদ হন। মোট ছ'বার লোকসভা ও দু'বার রাজ্যসভা মিলিয়ে পাঁচ দশকের বেশি সাংসদ। ১৯৬৮ তে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুতে জনসঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ এ জরুরি অবস্থায় কারাবরণ করেন। ১৯৭৭ এ বাজপেয়ী 'জনসঙ্ঘ' কে জনতা দলের সাথে মিশিয়ে দেন, জনতা দল লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হলে বাজপেয়ী বিদেশ মন্ত্রী হন। সেই সময় তিনি দেঙ শিয়াও পিং-র চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটান ও রাষ্ট্রপুঞ্জে হিন্দিতে প্রথম বক্তব্য রাখেন। ১৯৮০ তে 'ভারতীয় জনতা পার্টি' তৈরী হলে তিনি প্রথম সভাপতি হন। সারথি আদবানির রথের হিন্দুত্ববাদী হাওয়ায় এবং রামমন্দির স্থাপনের প্রবল ধর্মীয় মেরুকরণের আবহে ১৯৯৬ তে ১৩ দিনের জন্য এবং ১৯৯৮ নির্বাচনে জিতে দু বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন। বাবরি মসজিদ নিয়ে তার পরোক্ষ ভূমিকা ছিল এবং কেবল 'দুর্ভাগ্যজনক' মন্তব্য করে দায় সেরেছেন। ১৯৯৮ এ তাঁর সময়ে ভারত রাজস্থানের পোখরানে 'হাইড্রোজেন বোমা' পরীক্ষা করে। অন্যদিকে পাকিস্তানের সাথে সফল শান্তি প্রক্রিয়া ও দিল্লী-লাহোর বাসযাত্রা শুরু করে। দেশে শুরু হয় সোনালী চতুর্ভুজ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা প্রমুখ উন্নয়নের কাজ। আবার '৯৯ তেই পাকিস্তান সেনা কাশ্মীরের কার্গিল, বাতালিক, আখনুর সেক্টরে ঢুকে পড়লে ভারতীয় সেনা রীতিমত যুদ্ধ করে তাদের হটিয়ে দেয়। নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজেপি নেতৃত্বাধীন 'এন.ডি.এ.' জয়ী হলে বাজপেয়ী ১৯৯৯-২০০৪ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকেন। এই সময় কাঠমাণ্ডু থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ছিনতাই এবং সংসদে সন্ত্রাসবাদী হানা হয়। প্রমোদ মহাজন পরিচালিত বিজেপি-র 'সাইনিং ইন্ডিয়া' মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০০৪-র লোকসভায় তারা পরাজিত হন। এর আগে ২০০১ এ বাজপেয়ী আগ্রাতে আবার পাকিস্তানের সাথে শীর্ষ বৈঠক করেন। ২০০২ এ গুজরাট দাঙ্গায় তিনি দেরী করে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠান এবং মোদিকে 'রাজধর্ম' পালনের নির্দেশ দিয়ে নিজের ভূমিকা সারেন। ২০০৫ এ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করেন। ১৯৯২ এ পান পদ্মবিভূষণ এবং ২০১৫-তে 'ভারত রত্ন'। জীবনের শেষ দিকে বেশ কয়েক বছর তিনি খুবই অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন।

মুথুভেল করুণানিধি

(১৯২৪-২০১৮)

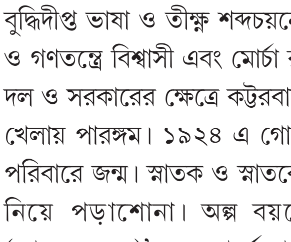

প্রয়াতা জয়াললিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তামিল রাজনীতির অন্যতম কুশীলব ছিলেন 'কালাইনার' করুণানিধি। নাগিপত্তনমের গরীব পশ্চাদপদ পরিবারের সন্তান। পেরিয়ার, আলাগিরিস্বামীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৪ বছর বয়সেই ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী দ্রাবিড় আন্দোলনে সামিল। এর সাথে হিন্দি আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। দ্রাবিড় আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠন ও পত্রিকা 'মুরাসলি' তারই সৃষ্টি। পাশাপাশি তিনি ছিলেন তামিল সিনেমার সফল ও খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার। তাঁর লেখা চিত্রনাট্যে অভিনয় করে এম.জি.আর. 'রাজকুমারী', 'অভিমন্যু', 'মরুধানাতু ইলাবরসি', 'মন্দ্রিকুমারী' প্রভৃতি সিনেমায় এবং শিবাজী গণেশন 'পরাশক্তি' সিনেমায় জনপ্রিয় হন। রাজনীতি ও সিনেমায় তামিল অস্মিতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ ও

অস্পৃশ্যতাকে ভোটে ও মঞ্চে সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। বিশিষ্ট তামিল নেতা আন্না দুরাইয়ের মৃত্যুতে '৬৯ এ তিনি প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং ডি.এম.কে. দলের হাল ধরেন। সেই সময় এম.জি.আর ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী। পরে এম.জি.আর পৃথক দল করেন এ.আই.ডি.এম.কে. এবং সেই থেকে করুণা-এমজিআর হয়ে করুণা-জয়া অবধি ডি.এম.কে.— এ.আই.ডি.এম.কে.-র প্রবল আকচাআকচি। পাঁচ বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন এবং তাঁর দল কেন্দ্রীয় সরকারেও যোগ দিয়েছে। তিনি ছিলেন নাস্তিক। আবার শ্রীলঙ্কার অবহেলিত তামিলদের স্বার্থেও তিনি লড়াই চালিয়েছেন। এক কথায় ভারতীয় ও তামিল রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় চরিত্র। অন্যদিকে তাঁর ও তার পরিবারের প্রতি উঠেছে বারবার দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ। নবতিপর অসুস্থ শরীরে তিন স্ত্রী ও বহু সন্তানের বিবাদ সামলে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর সন্তানদের মধ্যে মুথু, আলাগিরি, ষ্টালিন, কানিমোঝি; ভাগ্নে মুরাসলি মারান; নাতি দয়ানিধি মারানরা রাজনীতিতে এসেছেন এবং রাজ্য ও কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন।

কোফি আট্টা আনান

(১৯৩৮–২০১৮)

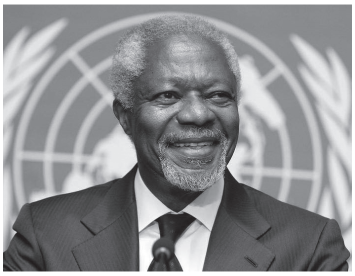

পরপর দুবারের (১৯৯৭-২০০৬) এবং প্রথম আফ্রিকান মহাসচিব রাষ্ট্রপুঞ্জের। ক্ষুধা দূরীকরণ ও এইডস্ নিয়ন্ত্রণে অসামান্য ভূমিকার জন্য ২০০১ এ নোবেল পুরস্কার জয়। জন্ম ঘানার কুমাসির এক অভিজাত পরিবারে। বাবা ছিলেন প্রাদেশিক গর্ভনর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা কলেজে অর্থনীতিতে স্নাতক হওয়ার পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে জেনেভায় এবং ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র বা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে উচ্চশিক্ষা করেন এম.আই.টি.-তে। ১৯৬২ তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, পরে রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগ দেন। ইংরেজী, ফরাসী সহ অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ১৯৬৫ তে নাইজেরিয়ার টিটি আলোকাজিকারকে বিয়ে করেন। '৮৩ তে বিচ্ছেদের পর বিয়ে করেন সুইডিশ আইনজীবী নেন ল্যগেরগ্রেনকে। মৃদুভাষী ভদ্রলোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অসংখ্য শান্তি আলোচনা ও অভিযানে অংশ নেন। কিন্তু মার্কিন ব্রিটিশের নেতৃত্বে ন্যাটোর এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও রাষ্ট্রের চাপের কাছে নতজানু হয়ে বারবার পিছু হটেছেন। ২০০৭-এ কেনিয়ার গৃহযুদ্ধ ও জাতিসংঘর্ষে সাফল্য, কিন্তু ব্যর্থ ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, বসনিয়া, ডারফার, সাইপ্রাস প্রমুখ যুদ্ধে ধ্বংস হিংসা ও গণহত্যা আটকাতে।

প্রতি ১৫ মিনিটে শিশু নিগ্রহ

ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি শিশুকে যৌন নিগ্রহ করা হচ্ছে জানিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ক্রাই'। নাবালকদের বিরুদ্ধে অপরাধ গত ১০ বছরে ৫০০ গুন বেড়েছে।

নয়বার পৃথিবীর শীর্ষে আরোহন

মার্কিন প্রবাসী নেপালের পর্ব্বতারোহী ৪৪ বছর বয়সী লাক পা শেরপা নয় বার এভারেষ্ট শীর্ষে উঠে বিশ্ব রেকর্ড করলেন।

দুই অনন্যা

ভয়ানক রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক চাপ এবং যাবতীয় ভীতিপ্রদর্শন, হুমকি উপেক্ষা করে দুই অনন্যা এগিয়ে এসে কাঠুয়া গণধর্ষণ, অত্যাচার ও হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করলেন। তাদের একজন সাহসিনী পুলিশ অফিসার **ডি.এস.পি. শ্বেতাম্বরী শর্মা** এবং লড়াকু **আইনজীবী দীপিকা সিং রাজাওয়াত।**

আইনজীবী সহ নাগরিকদের প্রতিবাদ

ঐতিহাসিক ভীমা- কোড়েগাঁও যুদ্ধের দ্বিশতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে '**এলগার পরিষদ**' গঠন করেছিল বিভিন্ন দলিত সংগঠন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এ পুণের শনিয়াড়া মন্দিরে। বিজেপি-সঙ্ঘ পরিবারের তাই খুব রাগ। তারা বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়ে গোলমাল পাকালো। একজন দলিত অংশগ্রহনকারীকে খুন করল। এর বিরুদ্ধে **প্রকাশ আম্বেদকরের 'ভারিপা বহুজন মহাসঙ্ঘ (বিবিএম)'** সহ দলিত সংগঠনগুলি মহারাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ দেখায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার দাঙ্গাকারী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে দলিত ও প্রতিবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে থাকে। '**কবীর কলা কেন্দ্রে**'র শিল্পীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করে কবি ও প্রকাশক **সুধীর ধাওয়ালে**, মানবাধিকার আইনজীবী **সুরেন্দ্র গ্যাডলিং**, দলিত সংগঠক **মহেশ রাউত**, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপিকা **সোমা সেন**, সমাজ কর্মী **রোনা উইলসন** প্রমুখকে। এর বিরুদ্ধে, '**ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অফ পিপলস্ লইয়ার্স (আই.এ.পি.এল.)** প্রমুখ সংগঠন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায়।

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে

হেপাটাইটিসের বিরুদ্ধে লড়াই এখনই

এস. কে. সারিন

১৯৩০ সাল, অমর তখন ৪ বৎসর এবং আনন্দ ৬ বৎসর (নাম পরিবর্তিত), যখন আমি তাদের বাবার চিকিৎসা করছি হেপাটাইটিস-বি এর জন্য। ১৯৭০ সালে ওনার একটা দুর্ঘটনা হয় এবং একজন পেশাদার রক্তদাতার থেকে রক্তগ্রহণ করতে হয়, সম্ভাব্য যার কারণে **হেপাইটিস-বি (HBV)** ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হন। উনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আমরা তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। দুই পুত্র, তাদের রক্তপরীক্ষা করে দেখা যায়, তারাও একই HBV-দ্বারা সংক্রামিত। দুইজনকেই Interferron দেওয়া হয়, কিন্তু অমরের ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়। ৫ বছর পর, একদিন অমর হঠাৎ আমার কাছে আসে এবং বলে আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে। আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা যায় বিশালাকার লিভার ক্যান্সারে সে আক্রান্ত এবং খুব শীঘ্রই সে মারা যায়। এতে তার কোনো অপরাধ ছিল না। সে তার মায়ের থেকে এই অসুখে সংক্রামিত হয়েছে। তার মাও বাবার থেকে এই অসুখে সংক্রামিত। প্রায় ২৫৭ লক্ষ সংখ্যক মানুষের শিশুরা এই সমস্যায় ভুগছে। সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত থেকে যাওয়ার কারণে প্রতিবছর ১-২ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটছে। ২০১৫ সালে আনুমানিক ৮৮৭০০০ মানুষের মৃত্যু হয় লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সারের জন্য। প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ ভারতবর্ষের HBV তে আক্রান্ত। জনসংখ্যার বিচারে চীনের পরেই। অপর একটি ভাইরাস যা রক্ত দ্বারা সংক্রামিত হয়, তা হল **হেপাটাইটিস সি ভাইরাস (HCV)**। পৃথিবীতে ১৭০ লক্ষ মানুষ এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যার (প্রায় ১২ লক্ষ) আক্রান্ত। এক্ষেত্রেও **লিভার সিরোসিস** এবং **ক্যান্সার** হল মৃত্যুর কারণ।

কিভাবে আমরা এই মারণাত্মক ভাইরাস বাহিত অসুখটি নির্মূল করব? প্রথমেই প্রতিরোধ করা এবং যাদের সংক্রমণ হয়েছে তাদের যথাযথ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রত্যেক নবজাতক শিশুকে জন্মের পরেই, ৬ সপ্তাহে এবং ১৪ সপ্তাহে **হেপাটাইটিস বি** টীকা দেওয়া হলে রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। ১৯৮৪ সালে তাইওয়ান এই টীকাকরণ শুরু করে এবং HBV-এর প্রাদুর্ভাব ১৪ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে কমিয়ে এনেছে বিগত ২০ বছরে। ভারতবর্ষে এই কর্মযজ্ঞ শুরু হয় ২০১১ সালে। এই টীকার জন্মের সময়ের মাত্রার কার্যকারিতা যাতে ৫৭ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত করা যায়, তা দেখতে হবে।

সমাজের সকলকেই এই কর্মযজ্ঞে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কোনো শিশু যাতে হেপাটাইটিস-বি টীকা ব্যতিরেকে যাতে Nursery তে ভর্তি হতে না পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। চিকিৎসক এবং পার্শ্বচিকিৎসকদের কাছে HBV রোগীদের থেকে সংক্রমণ একটি বৃহৎ সমস্যা। আনুমানিক ৫০ শতাংশ মানুষ কোনোদিনই এই টীকা নেয়নি বা Immunisation status পরীক্ষা (Antibody level 20 শতাংশের বেশি) করে দেখেনি। এইটা জরুরি প্রতিপন্ন করতে হবে। HCV-এর জন্য এখনও পর্যন্ত কোনো টীকা আবিষ্কৃত হয়নি। ভারতবর্ষে যাতে নিরাপদ রক্তদান হয় তা সুনিশ্চত করতে Nucleic Acid Testing (NAT) করতে হবে। যাতে করে ভাইরাসের Incubation period-এ এটা নির্ণয় করা সম্ভব। Hep B এবং Hep C ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার দ্বারা এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভবপর হবে। Hep B ভাইরাস-এর বাহকদের খুঁজে বের করাই হল সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু HBV-এর অধিক সংখ্যাটাই মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে বাহিত হয়; বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের Screening করালে সংক্রামিত রোগীর সংখ্যাটা

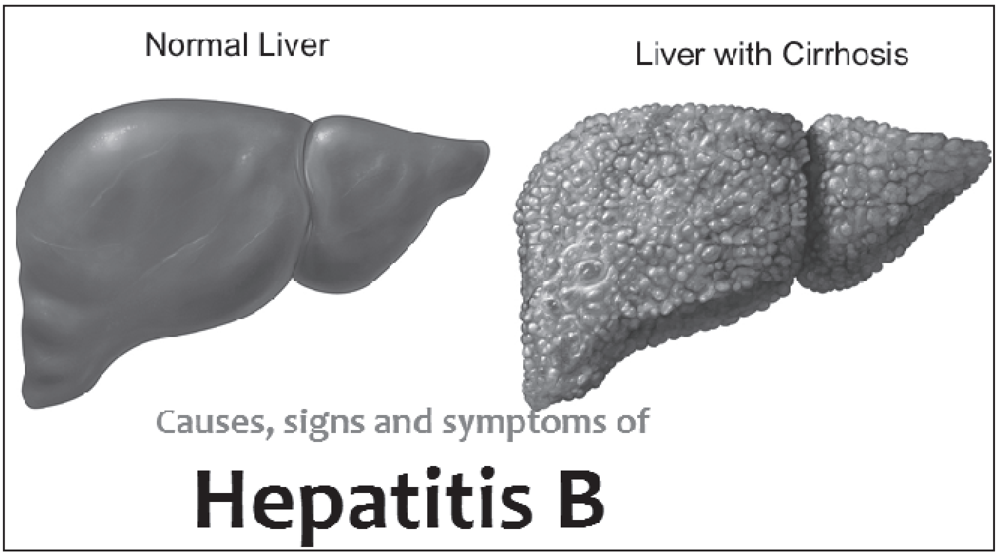

আরও ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। HCV-এর ক্ষেত্রে যেসব রোগীর Surgery অথবা অন্য কোনো পরীক্ষা যেমন, Angiography, Dialysis করা হয়েছে অথবা যাঁরা অন্য কোনো কারণে রক্তগ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ২০০৯ সালের পূর্বের সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে যার পরে প্রত্যেক Blood Bank-এ HCV test অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। অবশ্যই Needle এবং Syringe-এর পুনর্ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

হেপাটাইটিস-বি এর ফলে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাও খুবই ভয়ঙ্কর জায়গায় আছে। বিয়ে ভেঙে যাওয়া বা গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলা সমস্তই হেপাটাইটিস এর চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবথেকে মারাত্মক হল জীবিকা হারানো। HIV রোগীদের ক্ষেত্রে আদালত এর নির্দেশ আছে, সেখানে হেপাটাইটিস রোগীদের জন্য কোনোরকম সহানুভূতি পর্যন্ত নেই। এই ৫০ লক্ষ ভারতবাসীর stigmatisation অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিৎ। ভারতবর্ষে এখন যেটা সবথেকে বেশী প্রয়োজন তা হল সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপী জাতীয় হেপাইটিস ভাইরাস নির্মূলকরণ কর্মসূচী। আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যকর্মসূচীর মধ্যে সম্পূর্ণ টীকাকরণ এবং সংক্রামিত রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। WHO ২০৩০ সালের মধ্যে HCV নির্মূল এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে এবং তার জন্য ১০০ শতাংশ সহজলভ্য ওষুধ নিশ্চিত করেছে। এটাকে অবশ্য কর্তব্য করে তুলতে হবে (ত্রৈমাসিক চিকিৎসার খরচ আনুমানিক ৭৫০০ টাকা)। ভারতবর্ষের সরকার HIV এবং TB-র বিনামূল্যে সুচিকিৎসা নিশ্চিত করেছে। HIV-এর প্রাদুর্ভাব মাত্র ০.৩ শতাংশে এবং এর জন্য ২০১২-২০১৭ সনের বাজেটে আনুমানিক ১৩,০০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে।

HBV এবং HCV উভয়ের মিলিতভাবে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ শতাংশ এবং মৃত্যু হার কয়েকশত গুণ বেশি। ভারতবর্ষে ২০৩০ সালের পূর্বেই HCV এর নির্মূল সম্ভব যদি বাজেটে মাত্র ৮০০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়। Hepatitis-এর মতো মারণাত্মক রোগ নির্মূল করার জন্য কোনোরকম কর্মসূচী না করে আমাদের আরো একটি হেপাটাইটিস দিবস (July ২৮) পালন করা উচিত হবে না।
[ডা: সারিন নিউ দিল্লীর 'ইনস্টিটিউট অফ লিভার ও বিলিয়ারি ডিজিজ'-এর অধিকর্তা। ভাষান্তর : মধুছন্দা মাঝি]

শিশুর মনোবিকাশ জনিত জটিলতা অটিজম

কুন্তল বিশ্বাস

অটিজম কি?

শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হল অটিজম (Autism)। এটা কোন মানসিক বা বংশগত রোগ নয়। এটা হল স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। এটাকে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বলা হয়। সাধারণত তিন মাস থেকে প্রকাশ পেতে থাকে অটিজমের লক্ষণগুলো। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে অসুবিধা হয় এবং শিশুর চিন্তাভাবনার মানও কমে যায়। যা সারা জীবনের উন্নতি বা বৃদ্ধি ব্যাহত করে থাকে।

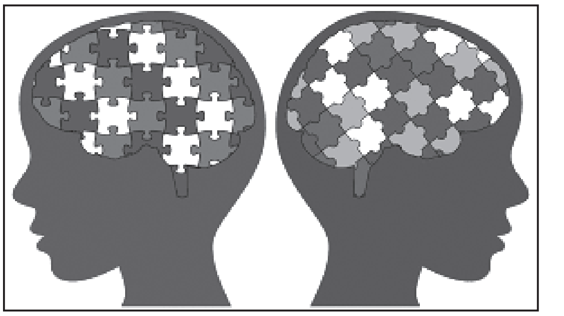

পৃথিবীর যে কোন বর্ণ গোত্রের শিশুর অটিজম হতে পারে। প্রতি হাজারে ২ জনের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দেখা যেতে পারে। ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই ছেলে। অর্থাৎ ছেলেদের এটা বেশি হয়। যে বাচ্চাদের আত্মমগ্নতা বা অটিজম আছে তাদের বিশেষ কিছু ব্যবহার বিধির মাধ্যমে প্রায় ৫০ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধকতা সমস্যার সমাধান করা যায়। এর সঙ্গে যদি অন্য কোন অসুখ থাকে তাহলে তখন তার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। অটিজম এর জন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। ওষুধ দিয়ে অটিজম শিশুকে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। দরকার বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার।

কি করে বুঝবো?

জন্মের তিন মাসের পর বাচ্চারা যদি কারোর চোখের দিকে না তাকায় তাহলে বুঝতে হবে বাচ্চাটির অটিজম আছে। অটিজম নির্ণয়ের জন্য ইন্টারন্যাশানাল চেক লিস্ট আছে। যেখানে ১০টি প্রশ্ন থাকে। এগুলোর উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে হয়। যেমন- শিশুটি কি অন্যদের দিকে আগ্রহ দেখায়/ শিশুটি কি বড়দের কাজকে অনুসরণ করতে চায়/পছন্দসই জিনিস কি আঙুল দিয়ে দেখায়/ শিশু চোখে মুখে না দিয়ে ফেলে দিয়ে খেলতে ভালোবাসে/ শিশুটি কি বাবা মাকে কোন কিছু দেখতে আনে/ শিশুটি কি অন্যের চোখের দিকে তাকায়/ শিশুটিকে কি কিছুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সেদিকে তাকায়/ ঘরের কোন জিনিস দেখতে হলে শিশুটি কি সেটা আঙুল দিয়ে দেখাতে পারে। এইগুলির উত্তর যদি না হয়, তাহলে সন্দেহ করতে হবে এই শিশুটি অটিজম এ আক্রান্ত হতে পারে।

অটিজমে আক্রান্ত হলে যা সমস্যা দেখা দেয়?

কথা দেরিতে বলা/ অনেকবার প্রশ্ন করলে উত্তর না দেওয়া/ একই কথা বা গানের লাইন বারবার উচ্চারণ করা/ ঠিকমত কথোপকথন না করা। অন্য কারোর চোখের দিকে না তাকানো। অন্য কাউকে নিজের জিনিসিপত্র দিতে না চাওয়া ইত্যাদি।

সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে দেখা যায় ঃ—

নিজের কাজে ব্যস্ত থাকা। কেউ ডাকলে সাড়া না দেওয়া।
একা একা খেলতে ভালোবাসা।

সমবয়সীদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলাধূলা করতে পছন্দ না করা।

নিজের উত্তেজনা অন্যের সঙ্গে ভার করে নিতে না পারা।

কেউ আদর করলে পছন্দ না করা।

তার অস্বাভাবিক ব্যবহারগুলোর মধ্যে দেখা যায়ঃ—

অকারণে হাসি

অসংলগ্নভাবে চলাফেরা করা।

অযথা অঙ্গ সঞ্চালন করে (যেমন-লাফানো, হাত ঘোরানো ইত্যাদি।)

কোন কারণ ছাড়াই অবসাদে ভোগে

ব্যথা, ঠান্ডা বা গরম বোধ কম থাকা।

অটিজম হলে আমরা কি করতে পারি?

যেহেতু অটিজমের কোন ওষুধ বা চিকিৎসা নেই, তাই একমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এটির চিকিৎসা করা সম্ভব। তাই কিছু বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা শিশুর ব্যবহারের কিছু উন্নতি ঘটাতে পারি। শিশুর ভাষা যদি ঠিক মত সময়ে তৈরি না হয় তার সাথে নন ভারবাল কমিউনিকেশন অর্থাৎ ভাষা বর্হিভূত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যেমন— বাচ্চার খেলার প্রতি উৎসাহ দেওয়া। শিশুরা তাদের খেলার মাধ্যমে অনেক কিছু শেখে বা শিখতে পারে। তাই দুজনের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী এমন খেলা বাচ্চার সাথে বড়দের খেলতে হবে। তার সঙ্গে গান করা, কথা বলা, আবৃত্তি করা।-এই সময় বড়দের চোখ যেন বাচ্চার দিকে থাকে অর্থাৎ বাচ্চা তাকালেই যেন বড়দের চোখে চোখে তাকায়। তার অঙ্গভঙ্গি এবং চোখাচোখি তাকানো-ভাষা তৈরির একটি ভিত্তি। যেমন- সে যদি বল নিয়ে খেলে তাহলে তাকে বলতে হবে বল। বারে বারে সেটা বলতে হবে। এবং দেহের অঙ্গ ভঙ্গির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে অভিভাবক যদি 'হ্যাঁ' বা 'না'— মাথা নেড়ে তার সদুত্তর দেয় তাহলে বাচ্চা তা দেখে শেখে। আস্তে আস্তে বাচ্চা ভাষা ব্যবহার না করেও অঙ্গভঙ্গির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝাতে পারে।

বাচ্চার সঙ্গে সহজ ভাষায় কথা বলতে হবে এবং শিশু কোনটায় আকর্ষিত হচ্ছে অভিভাবক যেন সেটা বোঝার চেষ্টা করে এবং সেইভাবে তার সাথে কথা বলে বা ব্যবহার করে। তাছাড়া তাকে সাহায্য করার মত কিছু যন্ত্রপাতি বা দেখবার জিনিসপত্র আছে সেগুলো ব্যবহার করা।

অন্যান্য সাধারণ বাচ্চার মতো অটিজম বাচ্চাদের সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক না করতে পারলেও বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাচ্চাকে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তার জন্য চাই কিছু বিশেষ প্রশিক্ষিত মানুষের সহায়তা। এরাজ্যেও অটিজম বাচ্চাদের জন্য বহু স্কুল আছে যেখানে এদের বিশেষভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা আছে। কোন ধরনের স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করতে হবে তা বিশেষজ্ঞদের কাছে জেনে নিয়ে অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাকে সেইমত স্কুলে ভর্তি করা। সঠিক পদ্ধতিতে এবং সঠিক পরামর্শমত চললে অটিজম শিশুদের উন্নতি অবশ্যই সম্ভব।

সবশেষে বলি, এটা আমাদের সান্ত্বনার কথা নয়, বাস্তবে অটিজম বাচ্চারা কখনো কখনো এমন পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে, যা দেখলে বা শুনলে অবাকই হতে হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী, কবি সাহিত্যিক অটিজম এ আক্রান্ত ছিলেন। অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনও অটিজমে আক্রান্ত ছিলেন। আর সর্বকালের মহা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও নাকি অটিজম আক্রান্ত ছিলেন। অটিজমে আক্রান্ত হলেও বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই চাই সচেতনতা যাতে অটিজম বাচ্চাদের বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে রাখতে পারলে তারা সমাজের দায় হবে না বরং তাদের প্রতিভা কাজে লাগাতে পারলে দেশ ও দশের উপকার হবে।

[সৌজন্য : স্বাস্থ্য ভাবনা]

পশ্চিবাংলার একটি সাপের বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র আবশ্যক কেন?

দয়াল বন্ধু মজুমদার

চন্দ্রোবোড়া

সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের রাজ্য, দেশের মধ্যে আজ একটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। গত ২০০৭ সাল থেকে লাগাতার লেখালেখি, চিঠিচাপাটি চালাচালি করতে করতে, ২০১১ সালের শেষে দিকে আমাদের স্বাস্থ্য ভবনের কিছু কর্তাব্যক্তিদের রাজি করানো সম্ভব হয়। এই প্রথম সরকারিভাবে সাপের কামড়ের সমস্যাটিকে গুরুত্ব দেওয়া হল। ২০১২ সাল থেকে, বিশেষ করে গ্রামীন হাসপাতালের ডাক্তার আর বেশ কিছু নার্সিং স্টাফকে সাপের কামড়ের চিকিৎসা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া চলেছে। কয়েক হাজার ডাক্তারকে এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর ছয়েকে এ রাজ্যের সব কটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড়ের চিকিৎসা একেবারে নিশ্চিত করা গিয়েছে। বেশকিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক এক জন ডাক্তারবাবু, এই সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কাজ করে দেখিয়েছেন। আমরা ঠিক যে সময় এ রাজ্যে, সাপের কামড়ে চিকিৎসার ব্যাপারটি প্রায় সমাধান হয়ে গিয়েছে ভাবতে শুরু করেছি, তখন এক নতুন সমস্যা দেখা দিল।

২০১৭ সালের প্রথম থেকেই আমাদের কাছে খবর আসতে থাকে যে, চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, আশানুরূপ ফল

পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় চিকিৎসাবিধি মতে, সিংহভাগ ক্ষেত্রে দশটি এ এস ভি দিয়ে চিকিৎসা করলেই রুগী সুস্থ হওয়ার কথা। সামান্য কিছু সংখ্যক রুগীর ক্ষেত্রে কুড়িটি আন্টিভেনম লাগতে পারে। আর বিরল কিছু কিছু চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য তিরিশটি আন্টিভেনম লাগতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের রুগীকে কুড়িটি অন্টিভেনম দিতে হচ্ছে। এমনকি প্রায়শই তিরিশটা আন্টিভেনম দেওয়ার পরও, রুগীর কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে।

সাধারণভাবে আমাদের জানা আছে যে, যে কোন সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্যই, তাড়াতাড়ি আন্টভেনম দেওয়াই, সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আন্টিভেনম দিতে যতো দেরি হয়, রুগীর কিডনি ততোটাই বিকল হতে থাকে। এ দেশে, আজ চিকিৎসা ব্যবস্থার এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, মানুষ ওঝার বাড়িতে সময় নষ্ট করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন। এ ব্যাপারে বহু অসরকারি সংগঠন লাগাতার প্রচার করেও, আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না।

যে সকল রুগী সাপের কামড়ের পর দু'ঘন্টা পার করে হাসপাতালে পৌঁছচ্ছেন, তাদের কিডনি যে বিকল হবেই, এটা এখন সকল ডাক্তারবাবুই জেনে গেছেন। কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে, বেশ কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করছেন যে, এমনকি এক ঘন্টার মধ্যে আন্টিভেনম দেওয়ার পরও, বেশকিছু চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের রুগীর কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে। এতে করে আন্টিভেনমের কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়।

যে কোন ওযুধপত্রের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে, যে যে বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে, কারণ অনুসন্ধান করা হয়, আমরা সেগুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখতে থাকি।

এখানেই সাপের বিষের আন্টিভেনমের সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি জিনিস সংক্ষেপে বলে নেওয়া উচিত। আমাদের দেশে এখন যে, পলিভ্যালেন্ট আন্টিভেনম বা সংক্ষেপে এ.এস.ভি., পাওয়া যায়, সেগুলি হল ঘোড়ার সিরাম। আন্টিভেনমের উৎপাদক ল্যাবরেটরিগুলিতে, ঘোড়াকে অতি সামান্য মাত্রায় সাপের বিষ ইনেজকশন দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ঘোড়ার শরীরে ঐ বিষের বিরুদ্ধতা করার জন্য, আন্টিবডি তৈরি হয়। প্রতিটি রোগের জীবাণু যেমন আলাদা আলাদা, তাদের বিরুদ্ধে তৈরি আন্টিবডিও তেমনি সুনির্দিষ্ট। হামের টিকা নিলে যেমন টিটেনাস প্রতিরোধ হয়না, তেমনি টিটেনাস প্রতিরোধ করার টিকা জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না।

সাপের বিষের ক্ষেত্রেও, ঘোড়াকে যে সাপের বিষ ইনেজকশন দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট সাপের বিষের বিরুদ্ধতা করার জন্যই আন্টিবডি তৈরি হয়। এখন আমাদের দেশে যে পলিভ্যালেন্ট আন্টিভেনম তৈরি হয়, তার জন্য চার রকম সাপের বিষ ব্যবহার করা হয়। এই চার প্রজাতি হল, গোখরো, কালাচ, চন্দ্রবোড়া আর ফুরসা। এই ফুরসা সাপ আমাদের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পাওয়া যায় না।

যদিও এই চার প্রজাতির বাইরে আরও অনেক রকম বিষধর সাপ আমাদের দেশে আছে, গত প্রায় একশ বছরের হিসেব মত দেখা যায়, এই পলিভ্যালেন্ট আন্টিভেনম তৈরিতে ব্যবহৃত না হলেও, এই পলিভ্যালেন্ট আন্টিভেনম দিয়ে কেউটে সাপের কামড়ের রুগীর চিকিৎসা করতে কোন সমস্যা হয়না। এর কারণ, গোখরো সাপের বিষের সাথে কেউটে সাপের বিষের গঠনগত সামঞ্জস্য।

এই গঠনগত সামঞ্জস্য আর বৈসাদৃশ্যই আমাদের নতুন সমস্যার মূল। নামে চন্দ্রবোড়া হলেও বিশাল দেশ এই ভারতের বিভিন্ন এলাকার চন্দ্রবোড়া সাপের বিষের গঠনগত অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানীরা এখন এ দেশের চন্দ্রবোড়া সাপেদের তিনটি সাব টাইপ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম ভারত আর পূর্ব ভারত; মোটামুটি এই তিনটি ভৌগোলিক এলাকার চন্দ্রবোড়া সাপের বিষের চরিত্র তিন রকম।

বর্তমানে এ দেশের আট নটি আন্টিভেনমের উৎপাদক ল্যাবরেটরিগুলি সাপের বিষের যোগান একমাত্র তামিলনাড়ুর একটি সংস্থা থেকে। মহাবলীপুরমের ইডুলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি একমাত্র স্বীকৃত বিষ সংগ্রাহক সংস্থা। ওরা দক্ষিণ ভারতের ওই একটি মাত্র জেলার সাপেদের বিষই সংগ্রহ করে। এই যে একমাত্র তামিলনাড়ুর সাপের বিষের থেকে উৎপন্ন আন্টিভেনম, এগুলি পূর্ব আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল দেবে না, এটাই স্বাভাবিক।

এই বিপদের সম্ভাবনা অন্তত পাঁচ বছর আগে লিখেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, এই সব বিজ্ঞানীর সাবধান বাণীকে ভূল প্রমাণ করছিল, ভারতীয় পলিভ্যালেন্ট আন্টিভেনম। ২০১৬ সালের শেষ পর্যন্ত আন্টিভেনমের কার্যকারিতা নিয়ে কোন সমস্যা আমরা শুনিনি। হঠাৎ করেই কেন এ সমস্যা দেখা দিল? স্বাভাবিকভাবেই আন্টিভেনমের গুনগত মান নিয়েই প্রশ্ন উঠতে থাকে। আর, শুনতে যতোই অপ্রিয় আর কর্কশই শোনাক, সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা ওযুধের গুণগত মান নিয়ে, আম জনতার মত আমরাও সন্দিহান হই। এছাড়াও কোল্ড চেন ঠিকমত না থাকাও আমাদের বিবেচনায় থাকে। কিন্তু একই পলিভ্যালেন্ট আন্টিভেনম, গোখরো কালাচ আর কেউটের কামড়ে ঠিকঠাক কাজ করায়, ওই দুটি প্রধান কারণকে সহজেই নস্যাৎ করা গেল।

তাহলে কারণটা কি? বিশেষ করে কেউটে সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানসম্মত আন্টিভেনমের ব্যবহার না হলেও, কোন সমস্যাও কোনদিন হয়নি। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়েছে, যেকোন ভাবেই হোক, কেউটে সহ পশ্চিমবঙ্গের সাপের বিষের একটা যোগান, ল্যাবরেটরিগুলিতে যাচ্ছে।

২০১৭ সালের পূজার আগে, আমরা বন্যপ্রাণ দপ্তরে বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করি। এই পশ্চিমবঙ্গের সাপের বিষের সরবরাহ, সরকারিভাবে কি করে করা যায়, এসব নিয়েই ওনার পরামর্শ চাই। ওনার কাছেই জানতে পারি যে, কলকাতার একটি রাস্ট্রায়ত্ব সংস্থার কাছে এই বিষ সংগ্রহের সরকারি অনুমতি আছে। ওনারা চাইলেই,

আমাদের অভিপ্রেত, পশ্চিমবঙ্গের সাপের বিষের যোগান ল্যাবরেটরিগুলিতে যেতেই পারে। আমরা কয়েকদিনের মধ্যে ওই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করি। জানতে পারি যে, নানান জটিলতায় ওনাদের নিজস্ব আন্টিভেনমের উৎপাদক ল্যাবরেটারি বন্ধ হয়েছে ২০০৯ সালে। উনি একটু আশার কথাও শোনান যে, আবার ওই ল্যাবরেটরি চালু করার একটা প্রস্তাব ওনাদের বিবেচনায় আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ওনারা সেই দক্ষিণ ভারতের ইডুলা কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকেই বিষ আনার কথা ভাবছেন।

কিন্তু ওই ইডুলার বিষ আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় দশগুণ বেশি দাম। তবুও ওঁদের এ রাজ্যের বিষ ব্যবহার করার অসুবিধা কি? এই প্রশ্নের উত্তরটাও আমরা জেনেছি, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই রহস্যময় যে, জানলেও আজ আর সেটি প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

জীবনদায়ী এমন একটি বিষয় কেন এমন রহস্যময় হয়ে থাকল? আসলে ওই রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার সরকারিভাবে প্রাপ্ত অনুমতিকেই, কিছু বেআইনি ভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং সেটা ওই ২০১৬ সাল পর্যন্ত। ওই সংস্থায় এ রাজ্যের বিষ সরবরাহকারী কিছু ব্যক্তির বেআইনি কাজ ওই সময় ধরা পড়ে। ফলে আমাদের হিসেবও মিলে যায়। ওই যে বলেছিলাম, কেউটে সহ এ রাজ্যের সব সাপের বিষের যোগান ল্যাবরেটরিগুলিতে কোন না কোন ভাবে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই যোগানটি বন্ধ হওয়ার ফলে, আজ আমরা যে আন্টিভেনম পাচ্ছি, সেটি এ রাজ্যের চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল দিচ্ছে না।

এ রাজ্যের সাপেদের বিষ সংগ্রহের জন্য যে সরকারি অনুমতি লাগে তার চাবিকাঠিটি আমাদের ওই বড় কর্তার হাতেই। ওনাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, আর কোন অসরকারি সংস্থার এই অনুমতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওনার পরামর্শ মত আমরা এখন কিছু সরকারি সংস্থাকেই এ কাজ করতে অনুরোধ করছি। এক দুজন প্রাথমিকভাবে রাজিও হয়েছেন। কিন্তু দুটি বা তিনটি সরকারি দপ্তরের অফিসারের সহমতের ভিত্তিতেই এই অত্যন্ত জরুরি কাজটি সফল হতে পারে। সরকারি লাল ফিতার ফাঁসই এক্ষেত্রেও সবথেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অত্যন্ত আশার কথা; সম্প্রতি এ রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক দুজন বড় কর্তাকে এই ব্যাপারটাতে আগ্রহী দেখা যাচ্ছে।

এই একটি কাজ বেশ কয়েকটি সুদূরপ্রসারী সুফল দেবে। এ রাজ্যের সাপেদের বিষ সংগ্রহের একটি কেন্দ্র তৈরি হলে, এ রাজ্যের সাপে কাটা রুগীদের চিকিৎসায় যথাযথ আন্টিভেনমের উৎপাদন নিশ্চিত হবে। তাতে করে আজ যে রুগীগুলি কিডনি বিকল হয়ে মারা যাচ্ছেন, তাঁরা প্রাণে বাঁচবেন। শুধু এই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের রুগীদের জন্যই কত লক্ষ কোটি টাকার ডায়ালিসিস মেসিন তথা লোক বল লাগছে, এসব প্রায় লাগবেই না। সরকারি হিসেবেই দশটি আন্টিভেনমের দাম ছয় থেকে আট হাজার টাকা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিরিশের জায়গায় দশটি আন্টিভেনমের ব্যবহাবরের ফলে, প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা কম খরচ হবে। সরকারিভাবে বিষ সংগ্রহের ফলে, ল্যাবরেটরিগুলিকে অনেক কম দামে বিষ সরবরাহ করা যাবে। তাতে আন্টিভেনমের উৎপাদন খরচও কমবে। তামিলনাড়ুর ইডুলাদের মত, এ রাজ্যেও কয়েক হাজার সাপুড়ে বা বেদে আছে; তাদেরও একটা কর্মসংস্থান হবে।

LEGAL RECOGNITION OF PASSIVE EUTHANASIA - A CATECHISM

Tapas K. Bhattacharyya

Back-ground

On 7 March 2011 the Supreme Court of India legalized passive euthanasia by means of the withdrawal of life support to patients in a permanent vegetative state. Patients must consent through a living will, and must be ***either terminally ill or in a vegetative state.***

The judgment remarked that the Constitution of India values liberty, dignity, autonomy, and privacy.

It's a landmark law which places the power of choice in the hands of the individual, over government, medical or religious control which sees all sufferings **"destiny".**

The decision was made as part of the verdict in a case involving **Aruna Shanbaug,** who had been in a Persistent Vegetative State (PVS) until her death in 2015.

Euthanasia (from Greek: "good death": *eu;* "well" or "good" - *thanatos;* "death") is the practice of intentionally ending a life to relieve pain and suffering. "the painless killing of a **patient suffering from** an incurable and painful disease or in an irreversible coma". (OED)

Aruna Shanbaug was a nurse working at the KEM Hospital, Mumbai. On 27 November 1973 she was strangled and sodomized by Sohanlal Walmiki, a sweeper. She was strangled with a chain, and the deprivation of oxygen has left her in a **vegetative state** ever since. She has been treated at KEM since the incident and is kept alive by feeding tube. On behalf of Aruna, her friend **Pinki Virani**, a social activist, filed a petition in the Supreme Court under the Constitutional provision of **"Next Friend"** arguing that the ***"continued existence of Aruna is in violation of her right to live in dignity".***

The Supreme court issued a set of broad guidelines legalizing passive euthanasia in India. However, in the meantime she died from pneumonia in 2015.

The Supreme Court specified two irreversible conditions to permit Passive Euthanasia Law in its 2011 Law: (I) The **brain-dead** for whom the ventilator can be switched off (II) Those in a **Persistent Vegetative State** (PVS) for whom the feed can be tapered out and pain-managing palliatives be added, according to laid-down international specifications.

Aruna Shanbang

The same judgment-law also asked for the **scrapping of 309,** the code which penalizes those who survive suicide-attempts.

In 2014, Supreme Court of India has referred the issue to a constitution bench, tasked with deciding whether Article 21 (No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law) of the Constitution **includes in its ambit the right to die with dignity** by means of executing a living wills/advance directives.

With this a divisive public controversy over the moral, ethical, and legal issues of euthanasia ensued in the country.

National discourse on euthanasia

It started in India in 2011, when the Supreme Court legalized passive euthanasia (ibid).

In the Aruna Shanbaug case (ibid), which generated a lot of debate, we have to bear in mind that Shanbaug was not in a position to take any decisions herself as she was in a vegetative state since 1973.

In 1997 CA Thomas Master, a Kerala teacher, appealed before Indian courts seeking permission for active euthanasia. Top reasons for seeking euthanasia were a **loss of dignity,** and **a fear of burdening others** and **not pain.** A good population (47%) supported doctor-assisted suicide (USA; 2013).

To terminate life, even one's own life, were it to be done without the authority of law, would amount to an unlawful act. In fact, an attempt to commit suicide is a crime under the IPC. The debate now is whether the fundamental right to life extends to the right to choice.

The fear of falling terminally ill and of not being able to "contribute to society" has pushed the Lavate couple (86 and 79) to write to the President to seek permission for "doctor-assisted death". Both the petitioners are in reasonably good health, not afflicted by any serious ailment as on the date of this petition. Even the courts have ruled that life support can be withdrawn only when the chances of return to life are negligible. *Active euthanasia* is not permitted in India and so the Lavates' request is unlikely to be heeded as India is not comfortable with the idea.

But their letter to the President has opened up a new debate in this area. So far, the debate has been confined only to people who are terminally ill.

The 2011 judgment helped to push the debate to permitting passive euthanasia for terminally ill patients under the strict supervision of the High Court, in consultation with a team of doctors treating the terminally ill patient.

In the case of terminally ill patients who are provided with expensive health care, whose families know that the patients are unlikely to return to normalcy and given the economic burden on the family and on society to treat these patients, euthanasia could be debated.

But euthanasia for those who are mentally alert, though physically disabled, is "**a big no**". Euthanasia in that form cannot be allowed or legalized because the probability of its misuse is very high.

This issue of euthanasia is a by-product of 20th century medical success. People who formerly would have died are now kept alive by advanced medical treatments. Along with this prolonged life have come difficult ethical decisions, and a lot of slogans like "the right to die," "the choice not to suffer," "death with dignity." As of today, euthanasia is the most active area of research in contemporary bioethics.

The time-honored **Hippocratic Oath** upon which our nation's healing medical profession was founded,

is slowly being discarded in favor of these slogans. A part of that oath reads: "*I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a suggestion to this effect.*"

Moral Questions Surrounding Euthanasia

Euthanasia raises a number of agonizing moral dilemmas :

There is doubt that this issue will affect many today. What am I to do when faced with such a situation? I must answer some difficult questions.

- *"Am I preserving life, or prolonging death ?"*
- *"Am I taking a life, or allowing a natural death?"*
- *"Will the patient who dies be a victim of euthanasia, or a victim of a fatal ailment?"*
- *"Am I providing the patient with natural means of sustaining life (food, water, air), or artificial means?"*
- Is it ever right to end the life of a terminally ill patient who is undergoing severe pain and suffering?
- Is there a moral difference between killing someone and letting them die?
- Should human beings have the right to decide on issues of life and death?
- Even if it was morally right, it could be abused and used as a cover for murder.

If you have to answer these difficult questions one day regarding the care of a loved one, you must remember your basic moral obligation: to prolong life, not to prolong death.

Supreme Court directed that

A decision has to be taken to discontinue life support either by the **parents, spouse or other close relatives,** or in the absence of any of them, even by a person or a body of persons acting as a next friend. It can be taken also by the doctors attending the patient. However, the decision should be taken **bona fide** in the best interest of the patient.

Even if a decision is taken by the near relatives or doctors or next friend to withdraw life support, such a decision requires **approval from the High Court concerned.**

When such an application is filled the Chief Justice of the High Court should forthwith constitute a Bench of at least two Judges who should decide to grant approval or not. A committee of three reputed doctors to be nominated by the Bench, who will give report regarding the condition of the patient. Before giving the verdict a notice regarding the report should be given to the close relatives and the State. After hearing the parties, the High Court can give its verdict.

Withdrawal of Medical Life Support Bill states that hospitals will be required to set up **approval committees** for considering cases of Passive Euthanasia. **Provisions of the Bill**

- It terms death from passive euthanasia a ***'Natural Death'.***
- The Bill states that all super-specialty hospitals should have approval committees on passive euthanasia. Any distortion of facts before approval committees may lead to imprisonment up to 10 years and a fine up to Rs 1 crore.
- The approval committees will decide on applications of ***"Living will",*** a written document that allows patients to explicitly state their desire against life *when recovery is not possible* from a terminal condition.
- It *provides for soothing care* for patients even if they have opted for passive euthanasia.
- This redrafted bill does not encourage active euthanasia and only supports passive euthanasia.
- It also has provisions for the *protection of competent patients, medical practitioners and care givers* who will not be considered guilty for the act of passive euthanasia.
- It provides for consent of near relatives to apply for withholding or withdrawing of medical treatment of 'incompetent' terminally ill patients.

Active and passive euthanasia

Active euthanasia refers to taking a life ***(producing death),*** where as "passive euthanasia" refers to allowing a death to occur without intervening ***(permitting death).***

Active euthanasia entails the use of lethal substances or forces (such as administering a lethal injection), and is the more controversial.

However it is legal, or *de facto* legal in only a handful of countries (ex. Belgium, Canada, Switzerland) and is limited to specific circumstances and the approval of councilors and doctors or other specialists. Elsewhere in the world active euthanasia is almost always illegal. It is illegal in India.

The legal status of passive euthanasia, on the other hand, including the withdrawal of nutrition or water, varies across the nations of the world.

What is Passive Euthanasia?

● Passive Euthanasia is an act of ***speeding up the death*** of a terminally-ill patient by changing some form of support and letting *nature take its course.* It involves turning off respirators, halting medications, discontinuing food and water so that patient gets an easy death.

This is a morally unsatisfactory distinction, since even though a person doesn't 'actively kill' the patient, they are aware that the result of their inaction will be the death of the patient. Traditionally, passive euthanasia is thought of as less bad than active euthanasia.

But some people think active euthanasia is morally better. Some (mostly philosophers) go even further and say that active euthanasia is morally better because it can be *quicker and cleaner,* and it may be **less painful for the patient.**

Doctors often felt it was morally better to withdraw treatment from a patient and let the patient die than to kill the patient (perhaps with a lethal injection).

DNR - Do Not Resuscitate

A DNR order on a patient's file means that a doctor is not required to resuscitate a patient if their heart stops and is designed to prevent unnecessary suffering.

Although DNRs can be regarded as ***a form of passive euthanasia,*** they are not controversial unless they are abused, since they are intended to prevent patients suffering pointlessly from the bad effects that resuscitation can cause: broken ribs, other fractures, ruptured spleen, brain damage.

Various guidelines say that DNR orders should only be issued after discussion with patients or their family.

However, a number of seemingly healthy patients discovered they had DNR orders written in their medical notes without consultation with them or their relatives.

There are reasons to suspect that doctors have stereotypes of who is not worth saving

Different Forms

Euthanasia may be classified, according to whether a person gives ***informed consent:*** voluntary, non-voluntary and involuntary.

Voluntary euthanasia occurs at the request of the person who dies. This includes cases of - asking for help with dying; refusing burdensome medical treatment; asking for medical treatment to be stopped, or life support machines to be switched off; refusing to eat, or simply deciding to die.

Non-voluntary euthanasia is conducted when the consent of the patient is unavailable. An appropriate person takes the decision on their behalf, perhaps in accordance with their living will, or previously expressed wishes. This includes cases where :

the person is in a coma; too young (e.g., a very young baby); senile; mentally retarded to a very severe extent; severely brain damaged.

It (patient's consent unavailable) is illegal in all countries. Examples of Non-Voluntary euthanasia include child euthanasia, which is illegal worldwide but de-criminalized under certain specific circumstances in the Netherlands under the Groningen Protocol.

Involuntary euthanasia is conducted against the will of the patient. It (without asking consent or against the patient's will) is also illegal in all countries and is usually considered murder. The person wants to live but is killed anyway. The morality of individual cases be given its due consideration.

Indirect euthanasia

This means providing treatment (usually to reduce pain) that has the ***side effect of speeding the patient's death.*** Since the primary intention is not to kill, this is seen by some people (but not all) as morally acceptable. A justification along these lines is formally called the ***doctrine of double effect.***

The doctrine of double effect

The principle is used to justify the case where a doctor gives drugs to a patient to relieve distressing symptoms even though he knows doing this may shorten the patient's life.

This is because the doctor is not aiming directly at killing the patient - the bad result of the patient's death is a *side-effect* of the good result of reducing the patient's pain. However the action must be proportional to the cause; be appropriate and the patient must be in a terminal condition.

Living wills

A living will is a document that sets out a ***patient's wishes regarding health care and how they want to be treated*** if they become seriously ill and unable to make or communicate their own choices. Such a document may be helpful to relatives and to medical professionals in the case of a seriously ill and incapacitated patient.

They respect the patient's human rights, and in particular their right to reject medical treatment.

However, to make the use of a living will sensible we have to assume that the wishes of the person would be the same when they become *incompetent as* when they make the will.

When to make one

It may be more effective for living wills to be compiled in the ***early stages of*** a disease or disability, as this will allow doctors to give realistic guidance about possible future situations.

Contents of a living will

Such a document would ***offer a set of particular medical scenarios*** that usually covers up the issues of

Vegetative state, Coma, Brain damage, terminal, or not terminal, and others.

It would allow the patient to specify the goals of their medical care in each scenario.

It would also allow the patient to say what their wishes are in respect of specific medical interventions in the case of each of the scenarios above.

An alternative to the living will is the Medical Power of Attorney which is available in some places.

Euthanasia laws vary from country to country -

Some governments around the world have legalized voluntary euthanasia but most commonly it is still considered to be criminal homicide.

"A 'mercy killing' or euthanasia is generally considered to be ***"a criminal homicide"*** (West's Encyclopedia of American Law) and is normally used as a synonym of homicide committed at a request made by the patient. However, not all homicide is unlawful.

In the Netherlands and Belgium, where euthanasia has been legalized, it still remains homicide although it is not prosecuted and not punishable if the perpetrator (the doctor) meets certain legal conditions. The Dutch law, however, does not use the term 'euthanasia' but includes it under the broader definition of *"assisted suicide and termination of life on request"*.

It is believed that this country is traveling down the slippery slope from abortion (killing the unborn) to euthanasia (killing terminally ill). The first paved the way for the latter when it gave up the sanctity of human life.

"In 1990, 1,030 Dutch patients were killed without their consent. And of 22,500 deaths due to withdrawal of life support, 63% were denied medical treatment without their consent. 12% were mentally competent but were not consulted."

In Chinese hospitals, active euthanasia is practiced on neonates. '

American common law has not supported a patient's right to die, but it is now divided over the issue of euthanasia. Passive euthanasia is widely practiced in this country and active euthanasia is gaining popularity.

Eighty percent of the US public said they wanted the law changed to give terminally ill patients the right to die with a doctor's help; 45% supported giving patients with non-terminal illnesses the option of euthanasia. (British Social Attitude Survey, 2007).

The Euthanasia Society of America (1938) followed by the Hemlock Society, Exit,Voluntary Euthanasia Legalization Society, and the Society for the Right to Die, Inc. are advocating. The AMA even endorses euthanasia.

Pro-euthanasia advocacy groups exist around the world. Some countries, allow the publication of instructions for do-it-yourself suicide!

When the patient brings about his or her own death with the assistance of a physician, the term assisted suicide is often used instead. Assisted suicide is legal in Switzerland and in several states in the U.S.

Unlike physician-assisted suicide, withholding or withdrawing life-sustaining treatments with patient consent (voluntary) is almost unanimously considered, at least in the United States, to be legal.

The use of pain medication to relieve suffering, even if it hastens death, has been held as legal in several court decisions.

Euthanasia debate

Pro-euthanasia activists often point to countries, where euthanasia has been legalized, to argue that it is mostly unproblematic. Arguments can be broken down into a few main categories:

- Assisting a subject to die might be a better choice than requiring that they continue to suffer;
- The distinction between passive euthanasia (often permitted), and active euthanasia (not substantive) is unstable or unsound; and
- Permitting euthanasia will not necessarily lead to unacceptable consequences.
- People have an explicit right to die; when and how they want to; human beings should be as free as possible - and that unnecessary restraints on human rights are a bad thing.
- Human beings are with the right to take and carry out decisions about themselves, providing the greater good of society doesn't prohibit this.
- The rights to privacy and freedom of belief include a' right to die; and the right to life includes the right to die;
- The right to life is not a right simply to exist, but a right to life with a minimum quality and value;
- Death is a private matter and if there is no harm to others, the state and other people have no right to interfere (a libertarian argument)

- It is possible to regulate euthanasia; difficult to deal with people who want to implement euthanasia for selfish reasons or pressurize vulnerable patients into dying.
- Euthanasia may be necessary for the fair distribution of health resources; Health resources are being used on people who cannot be cured, and who, for their own reasons, .would prefer not to continue living. Allowing such people to commit euthanasia would not only let them have what they want, it would free valuable resources to treat people who want to live.

However opponents of euthanasia say:

- Against the will of God; every human being is the creation of God; this imposes certain limits on us. To kill oneself, or to get someone else to do it for us, is to deny God, and to deny God's rights over our lives and his right to choose the length of our lives and the way our lives end.
- Suffering allows a person to be a good example to others by showing how to behave when things are bad.
- We live many lives and the quality of each life is set by the way we lived our previous lives.
- Euthanasia weakens society's respect for the sanctity of life; -people think we shouldn't kill human beings; all human beings are to be valued, irrespective of age, sex, race, religion, social status or their potential for achievement.
- There's no way of properly regulating euthanasia .
- Allowing euthanasia will lead to less good care for the terminally ill; it undermines the commitment of doctors and nurses to saving lives; and will discourage the search for new cures and treatments for the terminally ill
- Euthanasia may become a cost-effective way to treat the terminally ill
- Euthanasia gives too much power to doctors; In most of these cases the decision will be taken not by the doctor, but the patient only. The doctor will provide information to the patient to help them make their decision;
- Doctors have been shown to take these decisions improperly, defying the various guidelines already existing.
- Euthanasia exposes vulnerable people to pressure to end their lives (Moral pressure on elderly relatives by selfish families, to free up medical resources)
- Patients who are abandoned by their families may feel euthanasia is the only solution
- Not all deaths are painful; alternatives, such as cessation of active treatment, combined with the use of effective pain relief, are available;
- Voluntary euthanasia is the start of ***a slippery slope*** that leads to involuntary euthanasia and the killing of people who are thought undesirable;

If we allow something relatively harmless today, we may start a trend that results in something currently unthinkable becoming accepted. However, properly drafted legislation can draw a firm barrier across the ***slippery slope.*** If we change the law and accept voluntary euthanasia, we will not be able to keep it under control.

Euthanasia would never be legalized without proper regulation and control mechanisms in place .

Doctors may soon start killing people without bothering with their permission. There is a huge difference between killing people who ask for death under appropriate circumstances, and killing people without their permission . Health care costs will lead to doctors killing patients to save money or free up beds:

Doctors who are cost-conscious and 'practice resource-conserving medicine' are significantly more likely to write a lethal prescription for terminally-ill patients (1998), which suggests that medical costs do influence doctors' opinions in this area of medical ethics.

Allowing voluntary euthanasia makes it easier to commit murder, since the perpetrators can disguise it as active voluntary euthanasia. But the law is able to deal with the possibility of self-defense or suicide being used as disguises for murder. It will thus be able to deal with this case equally well Euthanasia might not be in a person's best interests in a number of cases in which a patient may ask for euthanasia, or feel obliged to ask for it, when it isn't in their best interest. It may occur when,

a) diagnosis is wrong and the patient is not terminally ill; or prognosis is wrong and the patient is not going to die soon;

b) getting bad medical care and their suffering could be relieved by other means, doctor is unaware of all the non-fatal options;

c) request for euthanasia is actually a 'cry for help'; confused and unable to make sensible judgements;

d) has an unrealistic fear of the pain and suffering that lies ahead; he feels that they are a worthless burden on others;

e) the patient feels that their sickness is causing unbearable anguish to their family; or under pressure from other people to feel that they are a burden; or of a shortage of resources to care for them;

* Supporters of euthanasia agree that a well-designed system for euthanasia will have to take all these points into account and, if necessary, the system should discriminate against the opinions of people who are particularly vulnerable.

Physician sentiment

Some (16.3%) of physicians would consider halting life-sustaining therapy because the family demanded it, even if they believed that it was premature. A half (45.8%) of them agreed that physician-assisted suicide should be allowed in some cases. (USA-2010)

People in pain may come to us and speak, "Please take my life from me, for death is better to me than life ... Death is better to me than life ...". When they do, let us not assist them in their death, but **care for them, comfort them and communicate with them. (3 C's)**

Euthanasia: Religious points of view

Though generally against legalizing euthanasia, Christians and the Jains thought passive euthanasia was acceptable under some circumstances. Jains and Hindus have the traditional rituals, wherein one fasts unto death.

Both Catholics and Jews oppose the practice, but there are varying views among Protestants. The religion of humanism is very much in favor of it, recognizing an "individual's right to die with dignity, euthanasia, and the right to suicide".

Euthanasia, like abortion, infanticide, suicide or genocide, is intentional homicide or murder, and therefore immoral. Killing, regardless of the request by the one suffering, and regardless of the good motives of the one doing the killing, is immoral.

We have a Biblical command to care for the aged and not abandon them.

Spiritual care

Spiritual care may be important even for non-religious people. Spiritual care should be interpreted in a very wide sense, since patients and families facing death often want to search for the meaning of their lives in their own way.

- When palliative care is not enough
- Futile, extraordinary or burdensome medical treatment that would include:
- **experimental treatment** - treatment where the unpleasant side-effects are completely out of proportion to any possible benefit
- futile treatment that doesn't have any reasonable chance of doing good - other than keeping the patient from dying
- treatment that causes great suffering to the patient - and makes their overall situation worse
- treatment that causes great suffering to those who love the patient

Proper palliative care

- Legalizing euthanasia may reduce the availability of palliative care
- Competent palliative care may well be enough to prevent a person feeling any need to contemplate euthanasia.
- Palliative care aims to enhance the quality of life for the family as well as the patient.
- Euthanasia is usually viewed from the viewpoint of the person, who wants to die, but it affects other people too, and their rights should be considered and effective palliative care gives them a chance to spend quality time together, with as much distress removed as possible.
- Palliative care is physical, emotional and spiritual care for a dying person when cure is not possible. It includes compassion and support for family and friends.
- WHO states that palliative care affirms life and regards dying as a normal process; it neither hastens nor postpones death; it provides relief from pain and suffering; it integrates the psychological and spiritual aspects of the patient.

Sanctity of life - every life has value and should be prolonged because man has a soul and is made in the image of God. Euthanasia, then, is a convenient way to remove suffering.

We don't need more ***"mercy killing"*** for those who suffer; we need more ***"mercy-service"*** to help them live with the pain.

জলের জন্য হাহাকার :

একদা মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের প্রধান নদী ওয়েনগঙ্গা আজ বিশুষ্ক। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদহে ধুধু বালুচরের উপর দিয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত হেঁটে চলে যাওয়া যায়। গত ছয় বছর এত কম বৃষ্টি হয়েছে যে ধারাবাহিক ক্ষরা চলেছে। সাত হাজারের বেশি গ্রাম তীব্র জল কষ্টে ভুগেছে। ইয়াভতুল শহরে পুরসভা প্রতি ২২দিন পর ট্যাঙ্কে করে জল পাঠায়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিন পর সরকারি জলের যোগান হয়। চলে জল নিয়ে ব্যাপক ফাটকাবাজি, কালোবাজারি। বিদর্ভে জল ও কৃষিতে সঙ্কটের কারণে লক্ষ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করে চলেছেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

ছাত্র ও শিক্ষক যেন ফুল ও ফুলবাগানের মালি

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বর্তমান যুগে জন-জীবনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তা' বিদ্যালয়ের শান্ত জীবনধারাকে সবিশেষ জটিল করে তুলেছে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ নানা প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কারও মতে ছাত্রকে স্বাধীনভাবে চলতে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। **রুশো** এই মতবাদের প্রবর্তক।

আবার কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে এই স্বাধীন-শৃঙ্খলা নীতি (Free-discipline theory) ছাত্রের যথাযথ বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। প্রথম থেকেই ছাত্রদের একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে এনে বিশেষ একটি আদর্শের দিকে পরিচালিত করা উচিত।

এই শ্রেণির শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে দুষ্টুমি ও অন্যায় করা ছাত্রদের স্বভাব ধর্ম। সুতরাং কঠোর শাস্তির সাহায্যে ছাত্রদের নিয়ম পালনে বাধ্য করানো প্রয়োজন। এদের নীতি হল 'Spare the rod, spoil the child' অর্থাৎ তাড়না না করলে শিশুকে মানুষ করা যাবে না।

কেউ কেউ আরও মনে করেন যে ছাত্রদের ব্যবহার ও চরিত্র ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রাইজ বা পুরস্কার প্রথারও প্রয়োজন আছে। প্রাইজের লোভে ছাত্ররা নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত কার্য করতে উৎসাহ বোধ করবে।

আর একদল আছেন যারা মনে করেন বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও পান্ডিত্যই সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে কি সমাজ জীবন, কি বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রদের মনকে শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেতন করা যেতে পারে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতিতে' এইভাবে উল্লেখ করেছেন।

''এই ইস্কুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম। ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মতো— ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোনো সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালোমন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেই জন্য বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত।" (জীবন স্মৃতি...)

রবীন্দ্রনাথ যে শান্তিনিকেতনে এই পরিবেশ সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। শান্তিনিকেতনে চারিদিকের গাছপালা, ফুল পাখির আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

এই পরিবেশের অভাবহেতু আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই জেলখানা বা পাগলাগারদের আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকে।

আবার বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাদের উপর ন্যস্ত তারা ভুলে যান যে ছেলেমানুষি ছেলে মেয়েদের বয়সের ধর্ম। এই ছেলেমানুষি বন্ধ করবার জন্য যাঁরা শাস্তি দিতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাঁরা ছাত্রদের নৈতিক ক্ষতি সাধন করে থাকেন। ছেলেদের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন তাহলে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যার জটিলতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

''ছোটো ছেলেকে যদি ছোটো ছেলে হইতে দেওয়া যায়— সে যদি খেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতুহল মিটাইতে পারে, তাহা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর, উহাকে বাহির হইতে দিব না, খেলায় বাধা দিব, ঠান্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব, তাহা হইলে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। তাহা হইলে, ছেলে মানুষ ছেলে মানুষির দ্বারা নিজের যে-ভার নিজে অনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসন কর্তার উপরে পড়ে।" (জীবনস্মৃতি......)

মন্তেসরীও এই পরিবেশ সৃষ্টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। মন্তেসরী বিদ্যালয়কে বলেছেন Mother's house বা 'মাতৃগৃহ'। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যথাসম্ভব বাড়ির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

অনেক শিক্ষক ছাত্রদের সামান্য অপরাধকেও অমার্জনীয় মনে করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান চাঞ্চল্য শিশুদের স্বভাব-ধর্ম এবং জীবনের গতিবেগই তাদের সমস্ত প্রকার পাপ থেকে পরিত্রাণ করে। মানুষ ভুল করবেই, কিন্তু ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যের সন্ধান লাভ করে। বিষয়টি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ব্যাখা করেছেন।

''আমার নিজের একটি স্কুল আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকে— কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারে

ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র-অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেশ বুঝিতে পারি, ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপ-কাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে; সে জলে দোষ যদি স্পর্শ করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে; বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানে বিপদ, সেইখানেই সাবধান হওয়া চাই। এই জন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের তত নহে।" (জীবনস্মৃতি...)

স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী শিশুরা কখনই বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আপনাকে আটকে রাখতে ভালবাসে না। এইরূপ আটকে রাখার চেষ্টা করলে বিদ্যালয় তাদের নিকট জেলখানায় পরিণত হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশে ছাত্রদের চিত্তের প্রক্ষোভ যেমন মুক্তিলাভ করে, তেমনি ডিসিপ্লিন সমস্যার সমাধানও সহজে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই নীতি হতেই শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশে স্কুল স্থাপন করে শিশুদের স্বাধীনতা দান করলেন। ছেলেরা বিশ্ব-প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আমার চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতি সঞ্চার করে। কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছটফট করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।" (শিক্ষা.....)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রভাবের মূল্য অপরিসীম। প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রজীবনের মূল বিষয়টি ধরতে পারেন। এই কারণে সকলের পক্ষে এই গুণ লাভ করা সহজ হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,— 'ছাত্রদের ভার তারাই লইতে পারেন যাহারা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজে শ্রদ্ধা করিতে পারেন। তাহারা জানেন, 'শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাহারা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।' (শিক্ষা ...)

ঠিকভাবে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমেই শিক্ষকদের নিজেদের আচরণ, বাক্য, চরিত্র ও বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে শিক্ষক নিজের উপদেশ ও আদর্শের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারেন, একটি বিশেষ চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, ছাত্রদের শিক্ষক, চালক ও বন্ধু হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন,—ছাত্ররা নির্বিচারে তাঁর আদেশ মেনে চলে। তিনি সহজেই ছাত্রদের শ্রদ্ধার অধিকারী হন। গুরুশিষ্যের প্রকৃত সম্পর্কের উপরেই বিদ্যালয়ের আদর্শ নির্ভরশীল। আমাদের মনে রাখতে হবে,—ছাত্ররা গুরুকে ভক্তি করতে পারলে বেঁচে যায়। 'অধ্যাপকদের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।' উপযুক্ত শিক্ষকের প্রভাব কেবলমাত্র বিদ্যালয় জীবনেই নয়, পরবর্তী কালেও ছাত্রদেরকে মহৎ জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

কেন শিক্ষকেরা শাস্তি প্রদানে উৎসুক —রবীন্দ্রনাথ এই মনোবৃত্তি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। শিক্ষকেরা যখন নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হন, তখন তারা ছাত্রদের সামান্য অপরাধে শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। শাস্তি দেওয়া শিক্ষকদের চরিত্রের দুর্বলতার পরিচায়ক। 'ছেলেদের কঠিন দন্ড ও চরম দন্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তারা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসন নীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।' (শিক্ষা,......)

''অনেক সময়ে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ শাসননীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য ফতোয়া জারি করেন। এতে আপাত দৃষ্টিতে কিছু লাভ হতে পারে, ছাত্ররা ভয় করতে শেখে কিন্তু তাদের চরিত্রের কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি হয় না। এতে যে কেবলমাত্র ছাত্রদের ক্ষতি হয় তা' নয়, এতে অধ্যাপকদেরও ক্ষতি ঘটায়। তাই এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী এই যে,—''ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন।" (শিক্ষা ...)

ইহার উত্তরে অনেকে হয়তো বলবেন তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করবে, আর সমস্ত সহ্য করতে হবে। এতে কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না? ছাত্রদের প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব যাদের জানা তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন স্বাধীনতা দিলে ছেলেরা যা কিছু তা করে না। বরং ঠিক পথেই চলে, যদি তাদের সঙ্গে ঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেলের কয়েদি, অপরাধীদের শাসন করতে হয়, ফৌজের সেপাইদের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা না মানলে শাস্তি পেতে হয়, কিন্তু স্কুলের ছোট ছোট বালক বালিকারা জেলের কয়েদি বা ফৌজের সেপাইএর ব্যবহার পাবার উপযুক্ত নয়।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, বিদ্যালয়ের কার্য যথাযথ করবার জন্য প্রাইজ বা পুরস্কার দানের প্রথা বহু বিদ্যালয়ে প্রচলিত। শিক্ষাবিদগণ মনে

করেন প্রাইজের লোভে ছাত্ররা সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে এবং এক সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। অনেকে মনে করেন পুরস্কার দান প্রথা মনোবিজ্ঞান সম্মত।

থর্ণডাইকের শিক্ষার নিয়মের মধ্যে 'অভিজ্ঞতার ফল' (Law of effect) একটি বিশেষ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াজনিত অভিজ্ঞতা যদি আনন্দময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়, তাহা হলে যে প্রচেষ্টাগুলি মধুর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে, সেগুলি আমরা মনে রাখি এবং তাহাদের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করে থাকি। সুতরাং প্রাইজের লোভে ছাত্রেরা ঠিকভাবে পড়াশুনা করবে এবং আচরণেও শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। এই হিসাবে শাস্তি দেওয়া পুরস্কারের বিপরীত পদ্ধতি। শাস্তির ভয়ে ছাত্রেরা অসঙ্গত কার্য থেকে বিরত থাকবে।

উপরে উল্লিখিত পুরস্কার তত্ত্বের বিরোধী বহ শিক্ষবিদ আছেন যাঁরা মনে করেন বিদ্যালয়ে পুরস্কার প্রথা প্রচলন করলে ছাত্রদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী। আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করে। পুরস্কারের লোভে নানা অসদুপায় অবলম্বনে ছাত্রেরা প্ররোচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজে পুরস্কার প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যখন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে কোনরূপ 'প্রাইজ' দেবার ব্যবস্থা রাখেন নাই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের কখনো 'প্রাইজ' দেওয়ার রীতি ছিল না।.....পড়াশুনায় 'ভালো' ছেলেদের পুরস্কৃত করা হইত না। কবি একখানি পত্রে (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, 'ভালো ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতে যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়; 'আমি ভাল' একথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করার অবকাশ না পায়।'' রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ খন্ড)

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ছেলেরা 'ভালো ছেলে' হবার জন্য কোন পৃথক পুরস্কার পাবে না; তারা যে ভালো— সাধারণের এই প্রশংসামূলক মনোভাবেই তারা নিজেদের পুরস্কার ভাববে। সমাজে প্রকৃত পন্ডিত ব্যক্তি আর্থিক সঙ্গতি লাভ না করতে পারলেও, প্রকৃত পান্ডিত্য লাভকেই যোগ্য পুরস্কার বলে মনে করবে। অন্যেরা যাহা পারে নাই, আমি পেয়েছি, এই মনোভাবই হল যোগ্যতার পুরস্কার। প্রকৃত জ্ঞানলাভ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে 'ভালো হওয়া'ই ভালো ছেলের একমাত্র পুরস্কার হওয়া উচিত।

অনেকে মনে করতে পারেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা খুব কঠিন। কারণ বর্তমান সমাজ প্রতিযোগিতা মূলক এবং সমাজের জীবন যুদ্ধে যোগ্যতমরাই জয়লাভ করবে এই নীতি স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ যে নীতির কথা বলেছেন তা একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি সমাজের গঠন সহযোগিতামূলক হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহযোগিতা ও সমবায়ের উপর সবিশেষ জোর প্রদান করে। সামাজিক মঙ্গলের অনুকূলে ব্যক্তিগত লোভ ও স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের নীতি সামাজিক সহযোগিতার সত্য নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত।

দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(এন.আই.আর.এফ.রেটিং ২০১৮)

সব মিলিয়ে

(১) আই. আই. এস., ব্যাঙ্গালুরু
(২) আই. আই. টি., চেন্নাই
(৩) আই. আই. টি., মুম্বাই
(৪) আই. আই. টি. দিল্লী
(৫) আই. আই. টি., খড়গপুর
(৬) জে. এন. ইউ., দিল্লী

ইঞ্জিনিয়ারিং

(১) আই. আই. টি., চেন্নাই
(২) আই. আই. টি., মুম্বাই
(৩) আই. আই. টি., দিল্লী

মেডিকেল

(১) এ. আই. আই. এম. এস., দিল্লী
(২) পি. জি. আই. এম. ই. আর., চণ্ডীগড়
(৩) সি. এম. সি., ভেলোর

ম্যানেজমেন্ট

(১) আই. আই. এম., আমেদাবাদ
(২) আই. আই. এম., ব্যাঙ্গালুরু
(৩) আই. আই. এম., কলকাতা

ল

(১) এন. এল. এস. আই. ইউ. ব্যঙ্গলুরু
(২) এন. এল. ইউ., দিল্লী
(৩) এন. ইউ. এল., হায়দ্রাবাদ

একটি প্রাচীন আলাপচারিতা

জয়দেব গুপ্ত

জনক রাজার সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নির্বাচন সদ্য সমাপ্ত হয়েছেন। জনক রাজা তাঁকে এক সহস্র স্বর্ণশৃঙ্গ গাভী দান করেছেন। তর্কযুদ্ধে শেষ হওয়ার পর রাজা জনক ও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আলোচনায় বসেছেন।

রাজা জনক।। আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-প্রমাণিত হয়েছে। তবে তর্কযুদ্ধ চলাকালীন একটা সময় মনে হয়েছিল, আপনি বিদুষী গার্গীর কাছে একটু যেন কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য।। রাজন, ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা আমাদের ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় ছিল। এটা ঠিক যে গার্গীর প্রশ্নবাণের সামনে আমি একটু মুশকিলে পড়েছিলাম - যে জন্যে আমাকে শঠতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তবে শেষ অবধি আমিই জয়ী হয়েছি।

রাজা জনক।। আপনার জয়টা আমাদেরও ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করাটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

যাজ্ঞবল্ক্য।। সে তো বটেই। তবে সত্য কথা বলতে কি, এই ব্রহ্মবাদের প্রকল্প প্রথম ভেবেছিলেন আপনার পিতামহ রাজা প্রবাহন।

রাজা জনক।। আমি কিছুটা জানি - কিছুটা বুঝিও। তবে বিশদে ব্যাখ্যা করলে মনে হয় পুরোটা হৃদয়ঙ্গম হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য।। তাহলে শুনুন রাজন। আপনার পিতামহ চেয়েছিলেন বর্ণাশ্রমের ভেদাভেদ যেন আগামীতেও অব্যাহত থাকে। কিন্তু মুশকিলটা তৈরি করলো ব্রাহ্মণরা নিজেরাই। সেই বৈদিক যুগ থেকে ইন্দ্র, অরুণ, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে তারা যজ্ঞ করতেন। তাতে অনেক ধূম উৎগীরণ হত- প্রচুর পরিমাণ ভস্ম সঞ্চিত হত- কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হত না। কারণ সাধারণ মানুষ এক সময় বুঝলো যে ওই সব যজ্ঞ টজ্ঞ করে কিছু হয় না। শুধু ব্রাহ্মণরা প্রচুর সোমরস পান করতে পারেন এবং পেট ভ'রে গোবৎসের মাংস গলাধঃকরণ করতে পারেন। অর্থাৎ মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াল—ব্রাহ্মণদের এক পাক্ষিক ভোগবিলাস, যজ্ঞের ধোঁয়ায় পরিব্যাপ্ত আকাশ, জমির একাংশ ছাইগাদায় পরিণত হওয়া এবং ব্রাহ্মণদের সোমরস পান ও বাছুরের মাংসের পরিত্যক্ত হাড়। সুতরাং ব্রাহ্মণদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অধোগামী হল।

ঠিক তখনই আপনার পিতামহ রাজা প্রবাহন ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিকল্পনা করলেন। তবে তিনি অবশ্য সেই পরিকল্পনার সঠিক প্রয়োগ করে যেতে পারেননি।

তারপর আপনার রাজত্বকালে আপনি সেই পরিকল্পনার কথা পুনরায় ভাবলেন। আর আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় আমি সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম।

ব্রহ্মবাদের প্রথম সোপান হল পরমাত্মার ধারণা। এই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই আদি ও অনন্ত। প্রত্যেক মানুষ এই পরমাত্মার অংশ। প্রত্যেক মানুষের আত্মা ওই পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত।

ব্রহ্মবাদের দ্বিতীয় অংশ হল আত্মা —জন্মান্তর—পুনর্জন্ম। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে তা অবিনশ্বর। এই আত্মার মৃত্যু নেই। শরীরের বিনাশ হয়, আত্মা অবিনশ্বর থাকে— ফলে মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করে। বা বলা যায় এক আত্মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে ও পুনর্জীবন শুরু হয়।

ব্রহ্মবাদের সবচেয়ে দামী সোপান হল কর্মফল। আগের জন্মে যে যেমন কর্ম করবে — পরবর্তী জন্মে সে সেইরূপ যোনিতে জন্ম লাভ করবে। কেউ যদি পুণ্যকর্ম করে থাকে, সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হিসেবে জন্ম নেবে। আবার যদি কেউ আগের জন্মে পাপ করে থাকে—তখন সে শুদ্র জাতিতে জন্মগ্রহণ করবে। শূদ্রদের শাস্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়র সঙ্গে পংক্তি ভোজন নিষিদ্ধ, এমনকি স্পর্শ নিষিদ্ধ এবং জীবনের ভোগ বিলাস নিষিদ্ধ। সুতরাং শূদ্র হয়ে জন্মে তোমার জীবন অভাব, অপমান, অত্যাচার ইত্যাদির কারণে দুর্বিসহ। কিন্তু তার জন্যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই—কারণ তোমরা ওই আগের জন্মে পাপ কাজ করেছো— তাই এ জন্মে তা ভোগ করছ। এই জন্মের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সেবা করে কর্মফল উন্নত করো—আগামী জন্মে তোমরা শ্রেষ্ঠতর যোনিতে জন্মলাভ করবে। অবশ্য শূদ্র বলতে শুধু মুচি, মেথর, ডোম—এই সব ভাববেন না। সাধারণ মানুষও এই জনগোষ্ঠী ভুক্ত। কৃষক, শ্রমিক, সেনাবাহিনীর সৈন্য—এদের সবার জন্ম উচ্চবর্ণের মানুষের সেবা করার জন্যে।

রাজা।। কিন্তু এই সবের সত্যতার প্রমাণ কোথায়?

যাজ্ঞবল্ক্য।। আপনিও অদ্ভুত কথা বলেন মহারাজা। প্রমাণের প্রয়োজন কী? আপনি যদি এই বিশ্বাস মানুষের মনে আর বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—তাহলে আগামী ছাপান্ন পুরুষ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা কেউ আটকাতে পারবে না। এই মিথ্যেটাকে যদি মিথ্যে যুক্তির মায়াজালে মানুষের বিশ্বাসে ঢুকিয়ে দিতে পারেন—তখন মানুষ শুধু এটা বিশ্বাস করবে—যুক্তি খুঁজবে না। দ্বিতীয়ত, আপনারা তো আগেই ঠিক করেছেন, শাস্ত্রপাঠ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকার—অন্য বর্ণের নয়—তাহলে শাস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন হয়ে মানুষ যুক্তির কথা ভাববে না। শুধুমাত্র বিশ্বাস করবে—আর তাহলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের কেল্লা ফতে।

রাজা।। কিন্তু যদি কেউ এ কথায় বিশ্বাস না করে, তখন?

যাজ্ঞবল্ক্য।। করবে না। সবাই এ কথায় বিশ্বাস করবে না। যেমন বিদুষী ও প্রতিবাদিনী গার্গীও এটা মানতে চায়নি। তর্ক যুদ্ধের সময় তর্ক যুদ্ধে আমাকে নাস্তনাবুদ করেছিল। অশিক্ষিত কেউ হলে—এমনকি অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ হলে— তাকে সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু গার্গীর দর্শন জ্ঞান প্রচুর এবং যুক্তিও ক্ষুরধার। আর এমন সুশিক্ষিত বিদুষী যদি এই প্রকল্পের প্রতিবাদ করে—তখন চিন্তার বিষয় হয় বৈকি।

রাজা।। সে তো দেখলাম। তর্কযুদ্ধের সময় গার্গীর যুক্তি ও প্রশ্নবাণে আপনি অসহায় বোধ করছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য।। আপনার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—সত্যিই গার্গীর প্রশ্নবাণে, কার্য-কারণ যুক্তিতে আমি ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। গার্গী প্রত্যেক কার্য-কারণের ব্যাখ্যা চাইছিল— আমিও নানা রকম কথার খেলায় ওকে পরাস্ত করার চেষ্টা করছিলাম। তর্কের প্রায় শেষ প্রান্তে যখন আমি বললাম, সবকিছুর চূড়ান্ত কারণ হচ্ছে ব্রহ্ম -তখন গার্গী প্রশ্ন করলো, ব্রহ্মের কারণ কী?

সত্যি কথা বলতে কি, ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদ তো আমাদের কল্পনা প্রসূত—তার ব্যাখ্যা দেবো কি ভাবে? তাই বলতে বাধ্য হলাম, ''হে গার্গী, ব্রহ্মের কারণ জানতে চাইলে আমার ব্রহ্মতেজে তোমার দেহ থেকে মস্তক আলাদা হয়ে যাবে।''

রাজা।। সত্যি কি মস্তক আলাদা হয়ে যেত?

যাজ্ঞবল্ক্য।। কচু যেত। ব্রহ্মতেজ বলে কিছু হয়না। পিছনে দাঁড়ানো সান্ত্রীর তরবারির এক কোপে তখন মস্তক বিচ্ছিন্ন হত। এবং আমার ধারণা গার্গীও এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

রাজা।। সত্যিই কি আপনি ওর মস্তক ছিন্ন করার আদেশ দিতেন?

যাজ্ঞবল্ক্য।। ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তখন সুযোগ বুঝে, নিভৃতে সেই আদেশ দিতে বিরত হতাম না।

রাজা।। কিন্তু সেটা তো অন্যায় হত।

যাজ্ঞবল্ক্য।। নিকুচি করেছে আপনার ন্যায় অন্যায়। ব্রহ্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে— সামনে যে বাধা আসবে তাকে বিনাশ করতে হবে। কারণ ব্রহ্মবাদ আমাদের চাই। আমরা চাই, মানুষ বিশ্বাস করুক, পরমাত্মা, আত্মা, জন্মান্তর, পুনর্জন্ম, কর্মফল— এ সব সত্যি। রাজনীতিতে বা ধর্মযুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু হয় না।

আর একবার যদি এই বিশ্বাস মানুষের মগজে ঢোকানো যায়— ওই যে বললাম, আগামী ছাপান্ন পুরুষ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা পায়ের ওপর পা তুলে—

(পুনশ্চ—ছাপান্ন পুরুষ নয়, সেই খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দ থেকে আজ অবধি ছাপান্ন দুগুণে একশ বারো পুরুষ এখনও এই সব বিশ্বাস করে চলেছে— লেখক)

কলিম খান (১৯৪৮-১১ জুন ২০১৮) : এক অনন্য তপস্বী

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

২০০২ সালে ঢাকায় 'একুশে' গ্রন্থ বিপণিতে একজন হাতের সামনে একটি বই এগিয়ে দিলেন ঃ 'পরমভাষার বোধন উদবোধন'। লেখক কলিম খান। বইটি নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করার পর মুদ্রাদোষেই জিগেস করি, লেখক কি ঢাকার?

সে বইটির ভূমিকা দোকানে দাঁড়িয়েই পড়ে ফেললাম। তারপর আর কালক্ষেপ নয়, কলকাতায় ফিরেই 'একুশে' থেকে সংগ্রহ করে আনা দূরভাষের নং এ তাঁর সঙ্গে আলাপ ও তাঁর বাসায় গমন। বইটি পড়ে যতটা না বুঝেছি, আলাপে আরও সাবলীল হল তাঁর ভাবনা। আরও দু-তিনটি বই তাঁর থেকেই সংগ্রহ করলাম। প্রথম যা আমাকে আকর্ষণ করল তা ভাষা। এত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ বাংলায় তিনি এমন এক গভীর বিষয় নিয়ে লিখছেন, আমাকে মোহিত করল। 'একক মাত্রা'র জন্য লেখা তো চাইলামই, আর ওঁর বইগুলোও বোঝার চেষ্টা করলাম প্রাণপণ। তিনি তখন গভীর অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করছেন। কিছুদিন অর্থের বিনিময়ে 'একক মাত্রা'র কম্পোজিং-এরও কাজ করলেন নির্দ্বিধায়। বাড়িতে কম্পিউটার বসিয়ে তিনি তখন ডিটিপি'রও কাজ করেন। বাড়িতে স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে। সন্তানেরা সকলেই নাবালক। থাকেন এক পুরনোকালের ভাড়া বাড়িতে। তিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ এ হরিচরণ যেখানে শেষ করেছেন বর্ণের অর্থ ও একই শব্দের বিবিধ অর্থ উদ্ধারে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর যাত্রা শুরু সেইসব শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশনে। হরিচরণের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, কলিম খানের কিছু চাকরিজীবী অনুরাগী। তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি সে কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে আরও অধোগামী, কলিম খানের ভাষায় ১৯৪৭' এর পর শারীরিকভাবে স্বাধীন কিন্তু মানসিকভাবে পরাধীন বাঙালি, তাঁর এই কাজকে বোঝার অবস্থাতেই আর রইল না। তবুও লালনের যেমন কাঙাল হরিনাথ ছিলেন, কলিমের ছিল কিছু লিটল ম্যাগাজিন আর পড়ুয়া বাঙালির একটি ছোট অংশ যারা তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর সংসারের অর্থকষ্টকে লাঘব করার চেষ্টা করেছেন সর্বতোভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, যে কারণে তিনি এই দু'মাস আগেও আস্থার সঙ্গে বলতে পেরেছেন তাঁর কাজ শেষ।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পুরোধা রজার পেনরোজ তাঁর 'দ্য এম্পেরার্স নিউ মাইন্ড' গ্রন্থে বলেন, এ বিশ্বের সমস্ত প্রজাতিরই চৈতন্য আছে, মানুষের সঙ্গে তাদের ফারাক হল ভাষায়। অর্থাৎ, মানুষের ভাষা আছে যা অন্যদের নেই। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী তাঁদের সমস্ত কাজের সার সংকরন করে তাঁদের শেষ বইটির নাম

দিয়েছেন ‘ভাষাই পরম আলো।’ পেনরোজের সঙ্গে যেন ভাবনাগুলি কোনও মৌলিক জায়গায় জুড়ে গেল। লোকে বলে, Great Men Think Alike।

আদিম মানুষের যখন কোনও ভাষা ছিল না, তারা দৃশ্য জগতের বাইরে কিছু ভাবতেও পারত না। খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য তাদের লড়াই ছিল আর অন্যসব প্রজাতির মতোই। সেই লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গকে কলিম খান বলছেন, ঝাঁক ম্যানেজমেন্ট। সমুদ্রের তলদেশে থাকা মাছেরা যেমন তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানের পরিধিতে থাকা খাদ্যসামগ্রী ফুরিয়ে এলে অন্যত্র নতুন বাসস্থান খোঁজে। যে জন্য ছোট দল করে এক ঝাঁক মাছ খুজতে যায় নতুন বাসস্থান ও ফিরে এসে খবর দেয় অন্যান্য মাছেদের, ঠিক সেভাবে মানুষও তাদের প্রয়োজনে একইভবে একদল মানুষকে পাঠিয়ে দিত তাদের নতুন বাস্থানের খোঁজে যারা ফিরে এসে খবর দিলে মানুষের গোটা ঝাঁকটাই চলে যেত সেখানে। এরজন্য ভাষার কোনও দরকার ছিল না। আকার ইঙ্গিত ও কিছু ধ্বনিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মানুষ যখন অদৃশ্য জগতের কিছু কথাও বলতে চাইল, যেমন, যে নতুন বাসস্থানের হদিশ পাওয়া গেছে সেখানকার চিত্র বাকীদের যদি বুঝিয়ে বলতে হয় বা কারও আগের দিনের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা সে অন্যদের বলতে চাইছে, দরকার পড়ল ভাষার। সেই আদিপর্বে ভাষার উদ্ভব ঘটল ক্রিয়ার হাত ধরে। সে শুধু ঘটমানতাকেই বলতে পারে। ধ্বনি, বর্ণ ও শব্দের উদ্ভব ঘটল এভাবেই। তাই কলিম খানের মতে, সমস্ত ভাষার শিকড় একই। ইতিহাস সেই ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার মধ্যেই বিধৃত হয় আছে।

ধীরে ধীরে সভ্যতার বিকাশে, শ্রেণি বিভাজনে, ক্ষমতার নানান আকারপ্রকারের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকেও ক্ষমতাশালীরা কব্জা করে নিল। তারা ভাষাকে শিকড়চ্যুত করে তাকে প্রতীকী অবয়ব দেবার প্রচেষ্টায় মত্ত হয়ে উঠল। কারণ, শব্দকে প্রতীকী করে ফেললেই তার অর্থ সীমায়িত হয়ে আসে, সে ক্ষমতার ভাষা হয়ে ওঠে, তার অর্থ দাঁড়ায় একটি বা দুটি তাৎপর্যে। তাই ভাষা আজ বিপন্ন। অন্যদিকে যারা শ্রমজীবী গাঁয়ের মানুষ, সামাজিক পরম্পরায় দীর্ঘদিন বেঁচে আছেন, সেখানে ক্ষীণ হলেও ভাষার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এখনও বহমান। সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটল, যে ভাষা আজ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেই ইংরেজি, কঠিন কঠোর কর্পোরেট শাসকের হাতে পড়ে একেবারেই শিকড়চ্যুত হয়ে প্রতীকী ভাষায় অধঃপতিত হল। তাই কলিম খান বলেন, বাংলা ভাষাই সভ্যতাকে বাঁচাবে। তা কেন তা তিনি বিস্তারিত বলেছেন গত ৫ মার্চ ‘একক মাতার’র অনুষ্ঠানে ‘বাংলা ভাষার সম্পদ কোথায়’ শীর্ষক আলোচনায়।

তিনি যখন বলেন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। ৭০ দশকে কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে মুক্তির দশক গড়ার স্বপ্নযুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসু মনের অতন্দ্র তৃষ্ণাকে নিভাতে দেননি। হকারদের বিচিত্র শব্দভান্ডার ও নিত্যনতুন শব্দের নির্মাণ তাঁকে মোহিত করেছিল। অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হিসেবে তিনি শুরু করলেন ভারতীয় ইতিহাসের স্বপাঠ। তাঁর কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক নতুন অর্থে ধরা দিল। তিনি হন্যে হয়ে খুঁজছেন সে মহাকাব্যের প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ। এদিক সেদিক পন্ডিতদের কাছেও দৌড়াচ্ছেন। উত্তর মিলছে না। একদিন পাগলের মতো চলে গেলেন অম্লান দত্তের কাছেও। এই দুজন মানুষই তাঁর কথা মন দিয়ে শুনলেন। দুজনেই প্রায় একই কথা বললেন যে আপনি নেমেছেন এক গভীর সমুদ্রের তলদেশে রত্নভান্ডারের খোঁজে, সে সন্ধান আমাদের কাছে নেই, আপনিই পারেন সে সব উদ্ধার করতে।

আদ্যন্ত এই সাবেকি মানুষটি প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা, যিনি আধুনিক ভাষাচর্চার সমস্ত প্রয়াসকে গভীর ভাবে জেনেবুঝে তবেই সেগুলোর সমস্যা কোথায় তা অকপটে বলে তাঁর সাধনমার্গের উপান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। তপস্বীরা তাই বেঁচে থাকেন কালকে পরোয়া না করেই। কালাতীত এই সাধককে আমার বিনম্র প্রণাম।

ভারতীয় ভাষা নিয়ে জনশুনানি ২০১১

মোট ১৯,৫৬৯ টি ভাষা। দশ হাজারের বেশী মানুষ কথা বলেন ২২টি সংবিধানের তফশীলীভুক্ত ও অন্যান্য ৯৯টি ভাষায়। এর মধ্যে হিন্দিতে ৪৩.৬%, বাংলায় ৮%, মারাঠীতে ৬.৯%, তেলেগুতে ৬.৭%, তামিলে ৫.৭%, গুজরাটিতে ৪.৬%, উর্দুতে ৪.২%, কন্নড়ে ৩.৬%, ওড়িয়াতে ৩.১%, মালয়ালামে ২.৯% মানুষ কথা বলেন। তফশীলীভুক্ত সংস্কৃতে কথা বলেন মাত্র ২৪,৮২১ জন। অতফশীলভুক্ত ভিলিতে কথা বলেন ১০.৪ কোটি মানুষ, গোণ্ডীতে ২.৯ কোটি মানুষ। ইংরেজি প্রধান ভাষা ২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের, যাদের মধ্যে ১ লক্ষ ৬ হাজার জন বাস করেন মহারাষ্ট্রে।

বাংলা লোক কথার প্রথম সংকলক

বাংলা লোককথার প্রথম সংকলক নিয়ে গবেষক শিশির মজুমদার ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’র অধিবেশনে এক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে **রেভারেন্ড লাল বিহারী দে**-র ‘ফোকটেলস্ অফ বেঙ্গল (১৮৮৩)’ প্রকাশের আগেই ১৮৭২ এ ‘দি ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি’ পত্রিকায় দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট **ডি.এইচ. ড্যামন্ট** প্রকাশ করেছিলেন পলি জনজাতির অনেকগুলি লোককথা।

মৃত্যুপুরিতে জন্ম নেওয়া এক ইতিহাস

অমিতাভ চক্রবর্তী ও সোমনাথ চৌধুরী

আজকে ক্লাস একেবারে সম্পূর্ণ ভরা। শুধু ছাত্র ছাত্রীরা নয়, সাথে আছেন অভিভাবকরাও এবং কিছু দর্শক। ছাত্রছাত্রীরা সবাই একেবারে ছোট, কৈশোর বা সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছে এইরকম বয়সী। মাষ্টারমশাই এর মধ্যে ডেকে নিলেন নয় বছর বয়সী এক ছাত্রকে। বোর্ডে প্রায় এক গজ লম্বা লম্বা কয়েকটা সংখ্যা লেখা। মাষ্টারমশাই ছাত্রটিকে বললেন সেই সংখ্যাগুলিকে যোগ করতে। ঘরে বসা দর্শকের সামনে ছেলেটি মনে মনে নিমেষের মধ্যে কষে বোর্ডে উত্তরটাও

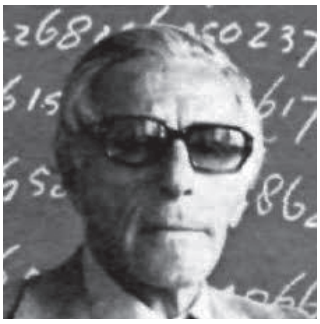

জ্যাকব ট্রাকটেনবার্গ

লিখে ফেলেছে একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে। এবারে ডাক পড়ল তার থেকেও ছোট একটি মেয়ের, তাকে বলা হল— ৭৩৫৩৫২৩১৪ কে ১১ দিয়ে গুন করতে। মেয়েটি যতক্ষনে সেই গুনটি করে সঠিক উত্তর ৮০৮৮৮৭৫৪৫৪ সংখ্যাটি বোর্ডে লিখল ততক্ষনে ঘরে বসা দর্শকরা প্রথম সংখ্যাটি কত ঘরের সেটা পর্যন্ত গুনে উঠে পারেন নি। পরের জন বেশ 'পড়াশোনা করা টাইপ' দেখতে একটি ছেলে। তাকে বলা হল ৫১৩২৪৩৭২০১ তে গুন করতে ৪৫২৭৩৬৫০২৭৮৫ দিয়ে। সে প্রায় জেট বিমানের গতিতে যখন উত্তরটা বের করে ফেলল তখনও ঘড়ির কাঁটার সময় অনুযায়ী ৭০ সেকেন্ড পার হয়নি। হ্যাঁ এটা কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের ক্লাস, যে সব ছেলে মেয়েরা বার বার করে শুধু পাটিগণিতে ফেল করত তাদের নিয়েই একসময়ে এই ক্লাসটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং তার ফলাফল তুলে ধরার পরেই সবাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে যে পদ্ধতির তালিম দেওয়া হত সেটা ছিল—জ্যাকব ট্র্যাকটেনবার্গের পদ্ধতি যেখানে পাটিগণিতের এক অন্য দর্শনের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল।

জ্যাকব ট্র্যাকটেনবার্গ ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাধর ইঞ্জিনিয়ার। হিটলারের সেই ভয়াবহ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে দীর্ঘ সময় থাকার ফাঁকে পাটিগণিতের এই পদ্ধতি আবিস্কার করে ফেলেছিলেন। সেই ক্যাম্পে তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক বন্দি। বাকি বন্দিদের মত তাঁর উপরেও চলত অকথ্য অত্যাচার। অথচ সেই মৃত্যুপুরীতেই জন্ম নিল অঙ্ক কষার এই অভিনব পদ্ধতি। ১৮৮৮ সালের ১৭ জুন তৎকালীন রাশিয়ার 'ওডেসা' শহরে জ্যাকব ট্র্যাকটেনবার্গের জন্ম। সেন্ট পিটার্সবার্গের বার্জিনস্টিটিউট থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। একেবারে ২১-২২ বছর বয়েসেই তাঁর নামের পাশে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের তকমা বসে যায়। তখন রাশিয়া জারের শাসনাধীন। রাশিয়ার নৌবাহিনীকে অসীম শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছিল। সেখানে ট্র্যাকটেনবার্গের উপর গুরুদায়িত্ব এসে যায়। তাঁকে প্রায় ১১০০ মানুষের কাজের উপর নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও তিনি অবুশফ নৌবাহিনীর জাহাজ নির্মাণের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু আদতে তিনি ছিলেন প্রবল শান্তিবাদী। এই সময়েই ছড়িয়ে পড়ল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তিনি রাশিয়ায় ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলেন, যারা যুদ্ধে আহত মানুষদের সেবা করত। তাঁর সেই সংগঠন জার শাসকের কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা লাভ করে। কিন্তু ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসনচ্যুত হন ও জারতন্ত্রের পতন হয় এবং কেরেনস্কির নেতৃত্বে এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন হয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই নয়া ক্ষমতার হাতে সপরিবারে কারাবন্দী হন। কিন্তু কয়েক মাস পরে নভেম্বর মাসে সোভিয়েত বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ওই গণতান্ত্রিক সরকারেরও পতন হয় এবং বিপ্লবী বলশেভিকরা সোভিয়েতরাজ ঘোষণা করে এবং ১৯১৮ সালের বসন্তকালে বন্দি জার নিকোলাস স্থানীয় উরাল সোভিয়েতদের হাতে হস্তান্তরিত হন। বলশেভিকরা মনে করত জারতন্ত্রকে সমূলে নিশ্চিহ্ন না করলে ফের তা রাশিয়ার জনগণের ঘাড়ে চেপে বসবে নয়া সোভিয়েতরাজের প্রতিষ্ঠাপর্বের উথালপাতাল মানুষের ক্ষোভ এবং দেশের ও দেশের বাইরের ধনিক শ্রেণিগুলির সহায়তায়। সেইমতো লেনিনের অনুমতিক্রমে ১৭ জুলাই ১৯১৮ সালে জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সোভিয়েত রাজ কায়েম হওয়া এবং জারতন্ত্রের অবসানের সাথে সাথে অবসান হয় রাশিয়ার সর্বোত্তম নৌবাহিনী গড়ার পরিকল্পনা। একই সঙ্গে শেষ হয় ট্রাকটেনবার্গের রাজপ্রকৌশলী হিসেবে সুখী আর শান্তিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন। তিনি বরাবরই হিংসা ও সন্ত্রাসকে এড়িয়ে সুস্থ ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। অচিরেই তিনি বলশেভিকদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন। রাশিয়াতে তখন পূর্বতন জারতন্ত্রর নির্মূলকরণ প্রকল্পে জারের সাকরেদদের খুন, জখম করা হচ্ছিল। ট্রাকটেনবার্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এই খুন, জখম নীতিবিরুদ্ধ ঠেকছিল। সেই সময়ে তিনি এই 'আইনশৃঙ্খলার অবনতি' আর 'বর্বরতার' বিরুদ্ধে বারে বারে তাঁর বক্তব্য রাখতেন। ফলে তাঁর জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের প্রথমদিকে কোনওভাবে তিনি জানতে পারেন তাঁর জীবন বিপন্ন, শাসক তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছেন। এক সন্ন্যাসীর বেশে

ট্রাকটেনবার্গ রাশিয়া থেকে পালান। তিনি সারাদিন কোথাও লুকিয়ে থাকতেন আর সারারাত ধরে হাঁটতেন। এভাবেই বেশ কিছুদিন চলার পর তিনি জার্মানিতে পৌঁছান। বার্লিন— ভারি সুন্দর এক শহর, চওড়া রাস্তাঘাট, ঝকঝকে আবহাওয়া, ঠান্ডার আমেজ তাঁকে সেন্ট পিটার্সবার্গের তাঁর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিত। সেখানে তিনি একটা অখ্যাত পাড়ার ছোট্ট একটি ঘরে থাকতেন। বার্লিনে তিনি একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানে কিছু সমমনস্ক বন্ধু বান্ধবও যোগাড় হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই সব ছেলেগুলি একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মত কাজ করত। অচিরেই তাঁর প্রতিভার গুণে তিনি তাদের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তাঁর পত্রিকায় তিনি সবসময়েই জার্মানির ভবিষ্যতের শান্তির জন্যে সেই সংগঠনগলির গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি করতেন। আবার নতুন করে তাঁর জীবন শুরু করেন। এর মধ্যেই ট্র্যাকটেনবার্গের সঙ্গে এক উচ্চবংশীয় সুন্দরীর বিয়ে হয়। সম্পাদক এবং লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির উপর তাঁর বই ইউরোপের সব জায়গাতে সমাদৃত হয়। রাশিয়ার ব্যাপারে সেই সময়ে তাঁকে ইউরোপের প্রথম বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনে করা হত। একইসঙ্গে তিনি জার্মানিতে বিদেশি ভাষা শিক্ষার একটি পদ্ধতি প্রচলন করেন, যা কিনা এখনোও পর্যন্ত জার্মানির স্কুলগুলোতে প্রচলিত।

মনে হচ্ছিল তাঁর আগের সেই শক্রতার জীবন বুঝি পেছনে ফেলে এসেছেন, কিন্তু হিটলারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনও বদলাতে শুরু করল। আবার সেই আগের মত শক্রতার জীবন শুরু হল। তিনি আবার ফ্যাসিবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখা শুরু করলেন। প্রথমদিকে হিটলার তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে তাঁকে না ঘাঁটানোর কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ট্র্যাকটেনবার্গের অভিযোগগুলি ক্রমশ ধারালো হয়ে উঠতে থাকলে হিটলারও আর তাঁকে উপেক্ষা করার মত জায়গাতে রাখলেন না। ১৯৩৪ সালে পরিস্থিতি এরকমই তৈরি হল যে তিনি যদি জার্মানিতে থাকেন তবে তাঁর প্রাণসংশয় ঘটবে। তিনি আবার পালালেন। এবার সঙ্গী হিসেবে তাঁর স্ত্রীও আছেন। তিনি কোনওক্রমে ভিয়েনাতে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

যখন সারা পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে মত্ত, তখনও ট্রাকটেনবার্গ শান্তির উদ্দেশ্যে লিখে ফেলছেন, 'দাস ফ্রায়েডেন্সমিনিস্টেরিয়াম' (শান্তির দূত), এই বইটি তাঁকে রুসভেল্ট, ম্যাসারিক বা ভ্যান জিল্যান্ডের সমপর্যায়ের কূটনীতিবিদ বা Statesman এর সম্মান এনে দিয়েছিল। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে তখন শুধু মৃত্যু আর হত্যালীলা চলছে। অগুন্তি মানুষ মারা যাচ্ছে প্রত্যেকদিন। ট্র্যাকটেনবার্গের নাম হিটলারের 'হিটলিস্টে' একেবারে প্রথমের দিকে ছিল। তাঁকে জেলে বন্দি করা হয়। সেই কারাবাস থেকে এক শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্যে আবার কোনওভাবে তিনি ভিয়েনা থেকে পালিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় যেতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী শিকারি জন্তুর মত দিন কাটাতে শুরু করেন। দিনের বেলা কখনও তাঁরা বাড়ির বাইরে বেরতেন না, রাত্রে চুপি চুপি বেরোতেন খাবার সংগ্রহের জন্যে। এভাবে চলল কিছুদিন। তাঁদের না ছিল কোনও বন্ধুবান্ধব না ছিল কোনও পরিচিতি। স্বাধীনতা কমতে কমতে ঘরের কোনায় এসে ঠেকেছিল। এক রাত্তিরে দরজায় ভারী বুটের লাথির আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাজির জার্মানির গুপ্ত পুলিশ—'গেস্টাপো'। হিটলারের বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে চলে গেল। তাঁকে একটা গবাদি পশু ভর্তি গাড়িতে পশুদের সাথে তুলে দেওয়া হল। গাড়ি রওনা দিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দিকে— যে ক্যাম্পের ভয়াবহতা জানার পর শিউরে উঠেছিল গোটা বিশ্ব। যেখানে সামান্য ভুলচুক হলেই ভয়ানক শাস্তির খাঁড়া নেমে আসত, সেই শাস্তি মৃত্যুও হতে পারে। প্রত্যেকদিন জেলে জায়গা বাড়ানোর জন্যে কয়েদিদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হত আর এই নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি বয়স আর কর্মদক্ষতা দেখে নির্বাচন করা হত এরকমটা নয়, অনেক সময়েই ইচ্ছেমত তুলে নিয়ে যাওয়া হত। ট্র্যাকটেনবার্গ কিন্তু এই সব দেখার পরেও তাঁর মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন নি। তিনি সেখানেও তাঁর একটা জগত তৈরি করে ফেলেছিলেন। যে জগৎ ছিল যুক্তি আর বিন্যাসের জগৎ। তাঁর শরীর সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল— শরীর দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক সেই পরাজয় মেনে নিতে নারাজ। সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গী হল সংখ্যা—এক অলৌকিক কৃতিত্ত্বের সাক্ষী থাকল পৃথিবী।

তাঁর কাছে ছিল না কোনও বই, কাগজ, পেন, পেনসিল, তাঁর সাথে ছিল শুধুমাত্র মস্তিষ্ক। তাঁর কথায় —''যদি যথাযথ চিন্তাভাবনার বিষয়টি আসে তাহলে গণিতের পথই হল একমাত্র পথ''। ওই ক্যাম্পের ভয়াবহতার মাঝে পুরনো বন্ধুর মত যুক্তি আর সংখ্যা এসে দাঁড়াত। তিনি সেই সংখ্যা সাজাতেন, ভাঙতেন, আবার সাজাতেন এবং প্রত্যেকদিনই আরও নতুন করে ভাঙা আর সাজানোর উপায় বার করে ফেলতেন—আর সমস্তটাই মনে মনে। তিনি নিজেকেই বিরাট বিরাট সংখ্যা যোগ করার কাজ দিতেন। কারও পক্ষে তো অসীম সংখ্যক সংখ্যা মনে রাখা সম্ভব না, সেখানেই তিনি এমন একটা যোগ করার পদ্ধতি আবিস্কার করে ফেললেন যে বাচ্চারাও বিরাট বিরাট সংখ্যা নির্ভুলভাবে যোগ করে ফেলতে পারবে এবং তাকে কখনই ১১র থেকে বড় কোনও সংখ্যাকে যোগ করতে হবে না। নরকের মত ক্যাম্পে থাকাকালীন যে সামান্য সময় তিনি পেতেন তার মাঝেই এভাবে মনে মনে গণিত চর্চা করে চলতেন, কিভাবে বিষয়টিকে আরও সরলিকরণ করে ফেলা যায় সেই নিয়ে। এই কষ্ট যেন প্রতিদিন তাঁর কাজ করার অণুপ্রেরণায় অনুঘটকের কাজ করছিল। কাগজের অভাবে তাঁর সূত্রগুলো লিখে রাখতে শুরু করলেন ক্যাম্পে আসা জিনিসপত্রের মোড়কের ফেলে দেওয়া ছোট ছোট টুকরোতে আবার কখনও বা চিঠিপত্রের ফেলে দেওয়া খামের ভেতরের দিকে। কাঠের কাজ করা কয়েদীদের একজন ছিলেন তাঁর সহবন্দী, তাঁর কাছ থেকে পেনসিলের শেষ অংশটা সংগ্রহ করে নিতেন। কিন্তু ওই ছোট ছোট টুকরোতে তো আর পুরো তাত্ত্বিক বিষয়টা লিখে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি শুধুমাত্র শেষ তথ্যটুকু লিখে রাখতেন। আজকে যাঁরা ট্র্যাকটেনবার্গের সূত্র ব্যবহার করেন তাঁদের কিন্তু ওই কাগজটুকুও

ব্যবহার করতে হয়না। এভাবেই কেটে গেল সাত— সাতটা বছর। সালটা ১৯৪৪, ইস্টারের কিছুদিন পর ট্র্যাকটেনবার্গ খবর পেলেন উপর মহল থেকে তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা এসে হাজির—যদিও সেটার অনুমান করতে জ্যোতিষী হতে হয় না কারণ সব বন্দিদেরই অন্তিম পরিণতি সেই গ্যাস চেম্বার। হাতে বেশি সময় নেই, কাজ শেষ করে যেতে হবে—ট্র্যাকটেনবার্গ ডুবে গেলেন নিজের জগতে। শান্তমনে নিজের কাজ করে চললেন, সেই সমীকরণ নিয়ে খেলা, সেই সংখ্যা কে সাজানো, নতুন ফর্মুলা তৈরি, নতুন নতুন সব সূত্র—সব গচ্ছিত রেখে দিতেন তাঁর সহবন্দীর কাছে, প্রবল বিশ্বাসে।

ম্যাডাম ট্র্যাকটেনবার্গ কিন্তু সবসময়েই কোনও না কোনওভাবে এই ক্যাম্পগুলির খোঁজখবর রেখে চলেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুপরোয়ানার খবরে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর কাছে যা টাকাপয়সা, গয়নাগাটি ছিল তার সবটুকু দিয়ে এক জার্মান প্রহরীকে ম্যানেজ করে প্রচন্ড গোপনীয়তায় তাঁর স্বামীকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর হওয়ার ঠিক আগে অন্য একটা ক্যাম্পে বদলি করাতে সক্ষম হলেন। তাঁকে লিপজিগ ক্যাম্পে পাঠানো হল। সেই ক্যাম্প তখন রাশিয়ান বোমায় বিদ্ধস্ত আর চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। সেখানে পর্যাপ্ত খাবার নেই, প্রচন্ড ঠান্ডায় একটা কম্বল পর্যন্ত নেই। আর বাকি সুযোগ সুবিধের কথা আর নাই বা বললাম। অন্ধকার ব্যারাকগুলোতে রাতে ঘুমানোর জন্যে সার দেওয়া বাঙ্ক। বাঙ্কগুলোর প্রত্যেকটাতে এতো মানুষে ভর্তি যে শোওয়ার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। সেখানে কেউ মরে গেলে ওখানেই শুইয়ে রাখা হত যতক্ষন না পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরতে থাকে— কারণ তাঁর জন্যে করব খোঁড়ার মত শক্তি সহবন্দীদের অবশিষ্ট ছিল না। এসব দেখে ট্র্যাকটেনবার্গের মনোবল একেবারে তলানিতে চলে গিয়েছিল। এই সব ভয়াবহতার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রাকটেনবার্গ পালানোর সুযোগ খুঁজছিলেন। এক গভীর রাতে সুযোগ এল। হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে রাতের বেলায় হেঁটে কোনওমতে তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌঁছলেন। কিন্তু বিপদ তাঁর পিছু ছাড়ল না। তাঁর কাছে না ছিল পাসপোর্ট না ছিল কোনও বৈধ কাগজপত্র। তিনি হয়ে গেলেন দেশহীন, রাষ্ট্রপরিচয়হীন এক নাগরিক, যে কোনও সময়ে গ্রেপ্তার হতে পারতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাই হল। তিনি গ্রেপ্তার হলেন। একজন উঁচুতলার আধিকারিক তাঁর কাজের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তিনি ট্র্যাকটেনবার্গকে ট্রিস্টির শ্রমিক ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে পাথর ভাঙার কাজে নিয়োজিত করা হল। ক্যাম্পের আবহাওয়া ততটা অসহনীয় ছিল না আর রক্ষীরাও ততটা নির্মম ছিলেন না।

এর মধ্যেই ম্যাডাম ট্র্যাকটেনবার্গ আবার কিছু টাকাপয়সা যোগাড় করে স্বামীকে জেল থেকে বের করার জন্যে রক্ষীদের হাত দিয়ে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হলেন। আবার জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা তৈরি হল। ১৯৪৫ সালের প্রথমদিকে এক অমাবস্যার রাতে ঘটল সেই রুদ্ধশ্বাস অভিযান। সবাই যখন ঘুমাচ্ছে ট্র্যাকটেনবার্গ নিঃশব্দে বেরোলেন ঘর থেকে। এরপর কোমর সমান বড় বড় ঘাসঝোপের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘন্টাদুয়েক চলার পর কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌঁছালেন। বেড়ায় উঠতে যাবেন তখনই কাছের একটা ওয়াচটাওয়ার থেকে সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল আর সাথে সাথে গুলি চলতে শুরু করল। জীবনের হয়তো শেষ সুযোগ, যা হওয়ার হবে, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তিনি কাঁটাতাড়ের বেড়ায় উঠে পড়লেন, নিমেষের মধ্যে বেড়ার উপরে উঠে তার উপর থেকে উল্টোপাশে লাফিয়ে পড়লেন। এক বুক শ্বাস নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন সেই জায়গাটার কাছে যেখানে তাঁর স্ত্রী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। দুজনে একসাথে চললেন সুইজারল্যান্ডের সীমান্তের দিকে।

শেষ পর্যন্ত দুজনে সুইজারল্যান্ডের শরণার্থী শিবিরে পৌঁছালেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল তাঁদের জীবন। তাঁর সব চুল তখন সাদা, শরীরও দুর্বল, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা ফেলে রেখে এসেছেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে— কিন্তু জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়নি। এবারে তাঁর অনিশ্চয়তার জীবন তো শেষ, ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল—আবার নতুন করে শুরু হল গণিতচর্চা। তাঁর সেই অঙ্কের পদ্ধতির শুদ্ধিকরণ নিয়ে কাজ শুরু করলেন। যে অঙ্ক নিয়ে তাঁকে জীবনে কী কী না সইতে হয়েছে, জার্মান পুলিশের জেরা, কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচার, স্বাস্থ্যহানি, এমনকি প্রতিনিয়ত মৃত্যুভয় পর্যন্ত— সেই অঙ্কই তাঁকে আবার নতুন করে বেঁচে ওঠার প্রেরণা যোগাল। তিনি বাচ্চাদের অঙ্ক শেখাতে শুরু করলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন ''পৃথিবীতে জন্মানো প্রত্যেক মানুষই বিস্ময়কর গাণিতিক প্রতিভা নিয়ে আসেন, সেটাকেই ঘষে মেজে শানিয়ে নিতে হয়। তিনি সেইসব বাচ্চাদেরই বেছে নিতেন যারা তাদের ক্লাসে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া বলে চিহ্নিত। ছেলেমেয়েগুলি এমনিতেই বাকিদের কাছে হেরে যেতে যেতে নিজেদের একরকম আলাদা করে নিয়েছিল। কিন্তু ট্র্যাকটেনবার্গের পদ্ধতি ম্যাজিকের মত কাজ করল, তারা এটাকে একটা খেলার মত করে নিল। খুব তাড়াতাড়িই তারা এতটা উন্নতি করে ফেলল যে বাকীরাও দেখে অবাক হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ট্র্যাকটেনবার্গের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল। এবারে ট্র্যাকটেনবার্গ এক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাকে তাঁর পদ্ধতিতে শেখাতে শুরু করলেন। ফলাফল দেখে সবাই বিস্মিত, ছেলেটি শুধু গুনতে শিখেছে তাই না, তার আই.কিউ লেভেলও বেড়ে গিয়েছে। তার মনোঃসংযোগেরও মাত্রাও বেড়েছে।

অবশেষে ১৯৫০ সালে জুরিখে তিনি ম্যাথমেটিক্যাল ইন্সটিটিউট খুলে বসলেন। জুরিখে এই ধরনের স্কুল সেই প্রথম। সাত থেকে আঠারো বছরের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়বে বলে ভর্তি হল। সেটা ছিল দিনেরবেলার ক্লাস, কিন্তু সন্ধ্যার ক্লাসে বয়সের কোনও মাপকাঠি ছিল না, উৎসাহী মানুষ যে কোনও বয়সের এসে ভর্তি হতে লাগলেন, সংখ্যাটা অচিরেই তিন অঙ্ক ছাড়িয়ে গেল। এর মাত্র তিন বছর পর ১৯৫৩ সালে জ্যাকব ট্র্যাকটেনবার্গ পরলোক গমন করেন। সেই স্কুলটি এখনও আছে জুরিখ শহরে— এখনও সেখানে ট্র্যাকটেনবার্গের পদ্ধতি শিখতে মানুষ ভিড় করে আসেন।

জ্যাকব ট্র্যাকটেনবার্গ শুধুমাত্র একটা নাম নয়—মৃত্যুর দিন গুনতে গুনতেও যিনি বেঁচে থাকার রসদ হিসেবে অঙ্ককে বেছে নিয়েছিলেন সেইরকম এক মানুষ। অঙ্ক তাঁকে শিখিয়েছিল প্রয়োজনিয়তাই হল সমস্ত আবিস্কারের মূল কথা, কাগজ কলম ছাড়া অঙ্ক কষার পদ্ধতির জন্ম হল সেই জিনিসগুলির অভাব থেকেই। হয়ত, এভাবেই অঙ্ক নিজের রাস্তা করে নিয়ে চলেছে আবহমান কাল থেকে। আর যুগে যুগে এরকমই যুগপুরুষরা আসেন সেই সব বিষয়ের সাথে আমাদের পরিচয় করাতে। আর হ্যাঁ কিছুটা হলেও আমরা আজীবন ঋণী থেকে যাবো ম্যাডাম ট্র্যাকটেনবার্গের কাছে। যে সহবন্দীর কাছে ট্র্যাকটেনবার্গ তাঁর কাজগুলি গচ্ছিত রাখতেন পরবর্তীকালে অনেক চেষ্টার পরও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্ভবত গ্যাস চেম্বারেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা : গোড়ার কথা

দীপককুমার দাঁ

পলাশীর যুদ্ধের পর (১৭৫৭) বণিকের মানদন্ড যখন রাজদন্ডে পরিণত হল, তখন থেকেই কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী (১৯১১ পর্যন্ত)। কলকাতায় স্থাপিত হল হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট। উন্নত বিচারব্যবস্থা এদেশের জনসাধারণকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্রমে অনুরক্ত করে তুললো। সার্বিকভাবে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতিরও অনেক উন্নতি ঘটলো।

ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে যে ইংরেজ তথা ইংরাজি বা ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতে প্রবেশ করলো, তা যুগ ও সময়ের নিরিখে ছিল অনেক বেশি আধুনিক ও প্রগতিশীল। আগেকার মুসলিম শাসকদের পরাজিত করে ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করায় মুসলিম জনসাধারণ তীব্রভাবে ইংরেজি বিদ্বেষী ছিলেন। এই সুযোগের যথার্থ সদব্যহার করে বাঙালি হিন্দুদের একটি অংশ দ্রুত আধুনিক জীবন মানে উন্নীত হয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে বেশ বড়ো অংশের হিন্দু বাঙালিরা বিপুল বিত্ত অর্জনে সক্ষম হয়। এমনকি দেশীয় জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যেও হিন্দু বাঙালিরা ছিলেন বহুলাংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

ইংরেজি শিক্ষা চেতনা এদেশে আধুনিক শিক্ষাভাবনা ও স্কুল-কলেজ গড়ে তোলার নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। ১৮১৭-তে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু-কলেজ। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট। গণিত, ইতিহাস, ভুগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা— এইসব বিষয়ের পঠনপাঠনের ভাবনার শুরু। লন্ডনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের যন্ত্রপাতি আশা শুরু হল (১৮২০)। এখানে থেকেই বাংলায় বিজ্ঞানের বই প্রকাশের ভাবনা জন্ম নেয়।

১৮১৭- জুলাই 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র জন্ম এই প্রয়াসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ— 'মে-গণিত' (বাংলা নাম 'অঙ্ক পুস্তকং) এখান থেকে প্রকাশিত হয়। ২য় সংস্করণ বেরোয় ১৮১৯।

অক্ষয় কুমার দত্ত

১৮১৮- কলিকাতা ডিয়োসেশান কমিটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অধিক সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

- এপ্রিল, 'দিগদর্শন' (মাসিক সাময়িক পত্র) প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ও ভুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা রসায়ন বিদ্যা — এসব নিয়ে লেখা থাকত।

-২৩ মে, 'সমাচার দর্পন' প্রথম প্রকাশিত। এই পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও সংবাদ প্রকাশিত হত। 'বিদ্যাবিষয়'— এই শিরোনামায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার রচনাদি প্রকাশ করা হত। ওই সময়কালের, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ।

- ১১ নভেম্বর, ঢাকা স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।

১৮১৯ - কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। দেশীয় স্কুলগুলির উন্নতিসাধন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

- ১৬ জুন, মুর্শিদাবাদ স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।

- হার্লের 'গণিতাঙ্ক' প্রকাশ ক. স্কু. বু. সোসাইটি থেকে।

- 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' — জন ক্ল্যার্ক মার্শম্যান (২য় সং) প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

- 'ভূগোল বৃত্তান্ত' — উইলিয়াম হপকিন্স পিয়ার্স কর্তৃক লিখিত ও ক.স্কু.বু. সোসাইটি থেকে প্রকাশিত।

১৮২০-'বিদ্যাহারাবলী'—ফেলিকস্ কেরি রচিত। এটিও প্রকাশিত হয় ক. স্কু. বু. সোসাইটি থেকে। বাংলাভাষায় প্রথম বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড- ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা)।

১৮২১ - 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' প্রকাশ রাধাকান্ত দেব কর্তৃক। এতে গণিত ও ভূগোল অধ্যায় ছিল।

- ২৬ মে লন্ডনে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চালনের প্রসার ঘটানো— অর্থ, বই, যন্ত্রপাতি দিয়ে।

- রাজা রামমোহন রায়ের ‘ভূগোল জ্যাগ্রাহী’ — ক.স্কু.বু. সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া, ‘খগোল’ (জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক) এবং একটি ‘জ্যামিতি’ বই তিনি লিখেছিলেন বলে ধরা হয়।

- ডিসেম্বর, ‘সম্বাদ কৌমুদী’ প্রকাশ করেন রামমোহন রায়।

১৮২২ - মার্চ, ‘সমাচার চন্দ্রিকা’- প্রকাশ।

১৮২৩ - ডিসেম্বর, রামমোহন রায়ের পত্র লর্ড আমর্হাস্ট-কে’। “....It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful science......”। বাংলায় বিজ্ঞানের শিক্ষা ও বই প্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

১৮২৪ - ‘ভূগোল ও জ্যোতিষ’ - পিয়ার্সন কর্তৃক লিখিত ও ক. স্কু.বু. সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

- ‘পদার্থবিদ্যাসার’ প্রকাশ - ইয়েটস্‌।

১৮২৭ - নাগাদ ব্যাপটিস্ট ফিমেল সোসাইটি ও ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে বিজ্ঞান বিষয়ক ‘প্রাইজ বই’ প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮২৮ - ‘পশ্বাবলী’ প্রকাশিত। জন লোসন সংকলিত ও পিয়ার্স কর্তৃক অনুদিত।

১৮২৯ - মে, ‘বঙ্গদূত’ সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। এতে বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদ প্রকাশিত হত।

১৮৩১ - ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকার প্রকাশ।

- ‘জ্ঞানোদয়’ পত্রিকায় প্রকাশ। এই দুটিতেই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ থাকত।

সাপের কামড় সংক্রান্ত চিকিৎসা নিয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি

দীপককুমার দাঁ

সাপের কামড়ানো রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা বিষয়ে খোঁজখবর নিতে ডাক্তারবাবু সবিস্তারে ঘটনা বলে, একটি বাক্য যোগ করলেন। আমি বছর দশ প্রায় ক্যানিং হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম। সে সময় ক্যানিং যুক্তিবাদী সমিতির সহযোগিতায় সাপে কামড়ানো রোগীর চিকিৎসায় অনেক কিছু শিখেছি। শুধু AVS দিলেই রোগী বাঁচবে না। তার হার্ট, কিডনি, রক্ত চলাচল ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিকিৎসাও একই সঙ্গে করতে হবে। ভিটামিন ইনজেকশন দিতে হবে। আমি পাশে বসে সব শুনেছি। দিন ৪/৫ আগে একটি বছর দশেকের সাপে কামড়ানো ছেলে হাসপাতালে ভর্তি হয়। প্রথম দিকে খুব খারাপ অবস্থা ছিল। ডাক্তারবাবু বলেন, ক্যানিংয়ের অভিজ্ঞতা না থাকলে আমি বাচ্চাটিকে বাঁচাতে পারতাম না। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছে।

কালাচ বা কমন ক্রেইট

বাংলা ভাষায় সাপ নিয়ে বই-এর সংখ্যা গোটা ৫০ প্রায়। বিজ্ঞান পত্রিকা, অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, দৈনন্দিন খবরের কাগজ— এসব জায়গায় সাপে কামড়ানোর, ঘটনা ও চিকিৎসা বিষয়ে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিগত ৬০/৭০ বছরে রেডিও প্রচার ও প্রায় ৪০ বছর টিভিতেও এসব নিয়ে প্রচার কম হয়নি। ‘উৎস মানুষ’ পত্রিকা বিশেষভাবে এ নিয়ে বহু প্রচার আন্দোলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত করেছে। সাম্প্রতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকায় এসব নিয়ে অনেক লেখা হচ্ছে। আলিপুর চিড়িয়াখানায় সাপের আলাদা গ্যালারি দর্শনীয় স্থান হিসাবে জনপ্রিয়। যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং অবশ্যই সর্বাগ্রে তাদের দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতায়। সম্প্রতি তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছেন— সাপ কামড় ও চিকিৎসা। (২০১৫, ৫০০ টাকা, ২১১ পৃষ্ঠা, রঙিন ছবি প্রচুর)। অবশ্য সর্পবিদ অবনীকুমার ঘোষ-এর কথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। সাপ বিষয়ক ওঁর বই পত্র এবং কাজকর্ম থাকবে সবার আগে।

সাম্প্রতিক আমার দু’টি অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে হাজির করছি।

(১) শ্রীকান্ত চক্রবর্তী, বয়স ৩০-৩১ বছর প্রায়। তরতাজা যুবক। সাপ ধরায় ওস্তাদ। সাপ বাঁচানোর জন্য পোস্টার ছাপিয়ে (নিজের পকেটের পয়সায়) বিলি করে। ওর ফোন নম্বর দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার বহু মানুষের কাছে আছে। কারও ঘরে বা আনাচে কানাচে কোথাও সাপ চোখে পড়লে ওর কাছে ফোন আসে। তুরন্ত চলে যায়। বিনা পারিশ্রমিকে সাপ ধরে সল্টলেক বিকাশ ভবনে (২য় তল) বন্যপ্রাণী দপ্তরে গিয়ে সাপ জমা দিয়ে আসে। সময় ও আর্থিক ঝুঁকি —দুটোকেই ও একসাথে করে। এই কাজে পূর্ণ উদ্দীপনায় সক্রিয় থেকে।

থাকে গোবড়ডাঙা রেল স্টেশন সংলগ্ন মেদিয়া গ্রামে (পুবদিকে প্রায় ১ কিমি দূরত্বের)। ফোন - ৭৮৭২৫৭২২০৯। ও দুশো প্রায় বিষধর সাপ ধরে উদ্ধার করেছে— গোখরা, চন্দ্রবোড়া, কেউটে, কালাচ। ছোটো একটি মুদিখানা দোকান চালায়। তাও নেশার তাগিদে প্রায়ই বন্ধ হয়ে থাকে। গত ০৬-০৫-২০১৮, মেদিয়া গ্রামে ঢোকে দু’জন সাপুড়ে। তাদের কাছে ছিল দুটো কালনাগিনী ও একটি গোখরো। তারা মাদুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে সাপ খেলানোর ব্যবসায় গ্রামে ঘোরে। ইতিমধ্যে স্থানীয় বেশ কিছু লোক ৫০ টাকা করে দিয়ে সাপের আশীর্বাদ পুষ্ট মাদুলিও কিনেছে। ও গিয়ে সরাসরি প্রতিবাদ করে। বন্যপ্রাণী আইনে সাপ নিয়ে খেলা দেখানো বেআইনি। বকাঝকা করে সাপ তিনটি কেড়েও নেয়। প্রথমে স্থানীয় লোকেরা সাপুড়ের পক্ষে ছিল। ওরা গরিব মানুষ। মাদুলি বিক্রি করে সংসার চালায়.... ইত্যাদি। কিন্তু

ওর যুক্তিতে হার মানে। সাপুড়েরাও বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে কেটে পড়ার ধান্দা করে। তখন পাবলিক পাল্টি খায়। সাপুড়েদের বলে, টাকা ফেরত দাও। বুজরুকি করে মাদুলি বিক্রি করছো....ইত্যাদি। যারা টাকা দিয়ে মাদুলি কিনেছে, তাদের মুখে উলটো সুর। শেষমেশ টাকা সবাই ফেরৎও পায়।

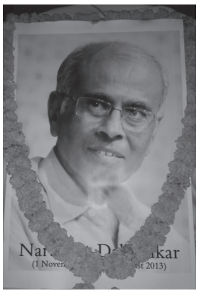
ডা: নরেন্দ্র ডাভোলকার

এর পরের দিন আবার ফোন— হাবড়া এলাকার গোহালবাটি, ফলসরা গ্রাম থেকে। এখানে সাপ আছে। ও নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখে--- সেটি একটি মাটির চাটি তৈরির কারখানা। চারপাশে প্রচুর খেজুর গাছ কাটা জ্বালানির জন্য। তার মধ্যে সাপ তখন পাওয়া যায় নি। কিন্তু ডিম আছে ১৯টি। ডিমগুলো পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে আঁটা। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪.৮ সেমি; চওড়া - ২.৮ সেমি। সংখ্যায় - ১৯টা। ওর বক্তব্য এগুলি কেউটের ডিম। সাপটা আশেপাশে কোথাও সরে পড়েছে। খুঁজে পাইনি।

ডিমগুলি নিয়ে কী করবে? জানার জন্য ও প.বঙ্গ সরকারের বনদপ্তরে পরিচিতজনকে ফোন করে। তিনি বলেন, সাপের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করার মতো কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। ইতিমধ্যে ও চাঁদপাড়া গ্রামে দু'জনের সন্ধান পায়। তারা সাপের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করায় সক্ষম। ও সেখানে ডিমগুলো দিয়ে এসেছে। বাচ্চা বেরোলে বন দপ্তরে জমা দিয়ে আসবে।

(২) দৈনিক সব খবরের কাগজের পাতায় ০৯.০৫.১৮ ও ১০.০৫ - ১৮ দু'দিনের হেডলাইনে বড়ো খবর— অভিনেত্রী কালীদাসী মন্ডলের মৃত্যু সাপের ছোবলে। ওঝা দয়াল বিশ্বাস ধৃত। 'মনসামঙ্গল' পালা চলাকালীন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গায়ে জড়ানো বিষধর সাপের ছোবলে প্রাণ যায় কালীদাসী মণ্ডলের। হাসনাবাদের বরুণহাট বাজারে যেখানে পালা চলছিল, সেখান থেকে হাসপাতালের দূরত্ব মিনিট কুড়ি মাত্র। অথচ, কালীদাসীকে সেখানে না নিয়ে গিয়ে ঝাড়ফুঁক শুরু করে দয়াল।' পরে ছেলেদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দয়াল-কে গ্রেপ্তার করে।

সংবাদে প্রকাশ স্থানীয় লোকজন আক্রান্ত কালীদাসীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে ওঝা দয়াল বিশ্বাস বাধা দেয়। এই বক্তব্য কি বিশ্বাস যোগ্য? একজন অশিক্ষিত ওঝার কাছে গ্রামবাসীরা হার মানল? সচেতনতার শিকড় বলতে কিছু কি আছে? আদৌ কি কণামাত্র বিজ্ঞান মনস্কতার শিক্ষা সমাজে বিস্তার লাভ করেছে?

সস্তায় ওঝা যদি বাঁচিয়ে দিতে পারে, তাহলে গাড়ি খরচা করে, রাত জাগার ঝঞ্ঝাট পুইয়ে হাসপাতালে গিয়ে লাভ কি? এই বিপদের মুহূর্তে কালীদাসীর ছেলেরা কোথায় ছিল? মায়ের মৃত্যুর পর তারা বিপ্লবী হয়ে উঠল?

পুরো ঘটনাটা অনেক কিছুই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে— (১) পুরানো আজন্মলালিত সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের ভিত টলানো যায়নি। এখন ধামাচাপা দেবার জন্য নানা মত উঠে আসছে। (২) যুক্তিবাদী বিজ্ঞান সংগঠকদের কাজের সত্যিকার কোন তাৎপর্য আছে কি? খবরের কাগজ ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম নিয়মিতই সাপে কামড়ানোর বিষয়ে নানাবিধ খবর ছাপে। মানুষ পড়ে। জানে-বোঝে। সচেতন কি হয়? আবেগ, আত্মতৃপ্তি, তার্কিক বিশ্লেষণ এসব পাশে সরিয়ে রেখে গোটা বিষয়টার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে কাজের একটি বাস্তবসম্মত ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হোক।

সমস্ত বিজ্ঞানক্লাব, যুক্তিবাদী সদস্য পুনরায় বসে কাজের অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করুন। আমার প্রশ্ন, ওঝা দয়াল বিশ্বাস কেন একা গ্রেপ্তার হবে? যারা পাশে দাঁড়িয়ে রগড় দেখছিল, তামাশায় তালি বাজাচ্ছিল, সেই দর্শককুল গ্রামবাসীদেরও গ্রেপ্তার করা হোক। শক্ত হাতে আইন প্রয়োগ করতে না পারলে এইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বেড়েই চলবে। দীর্ঘদিন গলায় জ্যান্ত সাপ ঝুলিয়ে মনসাপালা গান চলে কি করে? গ্রামে পঞ্চায়েত, বিডিও, শিক্ষিত-যুক্তিবাদী-বুদ্ধিজীবী মানুষ বলে কেউ নেই? স্থানীয় ক্লাব, তরুণরা কি করছিল? এইসব কিছুকেই তদন্তে নিয়ে এসে দীর্ঘ পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট তৈরি হোক। এবার আসুক-নয়া অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজির সঠিক ব্লুপ্রিন্ট। যা চলছে, তা গোঁজামিলের রকমফের।

সুপারমুন

২০১৮-র জুলাইয়ের শেষ। একই মাসে দুটি পূর্ণিমা। দ্বিতীয় পূর্ণিমায় (ব্লু মুন) চাঁদ ও পৃথিবী সব থেকে কাছাকাছি (সুপারমুন) এবং সেই দিনেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। এই ত্র্যহস্পর্শকে পশ্চিম দুনিয়ায় বলে 'সুপার ব্লাড ব্লু মুন'। শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৮২ তে। 'ব্লু মুন' মানে কিন্তু নীলচে চাঁদ নয়, তবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণে লাল রশ্মির প্রতিসরণে চাঁদকে লালচে দেখায় ('ব্লাড মুন')। পৃথিবীকে পাক খেতে খেতে চাঁদ একবার কাছে চলে আসে এবং একবার দূরে চলে যায়। দূরত্বটা যখন সব থেকে কমে যায়, সেটাকে বলে 'অনুভূ' অবস্থান। এই সময়ে পূর্ণিমা হলে তাকে 'সুপারমুন' বলে। নামটির অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। 'সুপরমুনে'র সাথে ভূকম্পনের সম্পর্ক এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় নি।

আইনস্টাইন অব্যর্থ

বহু আগে আইনস্টাইন ধারণা দিয়েছিলেন যে কোন বড়ো ভরের বস্তুর ক্ষেত্র মধ্যাকর্ষ শক্তি শব্দের মত আলোকরশ্মিকেও বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে দেবে। বিশাল বড় কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলগুলি সেভাবেই আলোকরশ্মিকে শুষে নেয়। 'ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেসট্রিয়াল ফিজিক্স' এর বিজ্ঞানীদের 'গ্রাভিটি' কনশরটিয়াম সম্প্রতি আমাদের আকাশগঙ্গা বা মিল্কিওয়ের সবচাইতে বড় কৃষ্ণগহ্বর, যার ভর সূর্যের চাইতে চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশি, স্যাজিটারিয়াস-এ তে পরীক্ষা চালিয়ে আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বের প্রমাণ পেয়েছেন।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

পাহাড়ি গোরিলার দেশে

মিতালি সরন

প্রবাদপ্রতিম পরিবেশবিদ্ ড: ডায়ান ফসের কাজ দেখে পাহাড়ি গোরিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হই। ড: ডায়ান ফসে অর্ধ শতাব্দী আগে আফ্রিকার রোয়ান্ডায় যান। 'ক্যারিসোকে রিসার্চ ফাউন্ডেশন' তৈরী করেন। তারপর গভীর ও দুর্গম পাহাড়ি অরণ্যের যেখানে পাহাড়ি গোরিলাদের বাস সেখানে থাকতে শুরু করেন। এই বিশাল শক্তিশালী

বৃহদাকার নিরামিষাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। লোভী মানুষের বন্দুকের নিশানায়, গৃহযুদ্ধে, দাবানলে, চোরাশিকারে ততদিনে এই বিরল প্রাণী কমতে কমতে উগান্ডা, কঙ্গো আর রোয়ান্ডার সংযোগ স্থলে ভিরুঙ্গা মাসিফ অঞ্চলে অল্প কিছু বেঁচে আছে। অস্থির আর্থ-সামাজিক-জনজাতি সঙ্ঘর্ষ, যুদ্ধ, হত্যাকান্ডের মধ্যেও তিনি বহু চেষ্টায় রোয়ান্ডা সরকার ও স্থানীয় জনজাতি মানুষদের গোরিলা সংরক্ষণে নিয়োজিত করেন। ততদিনে তিনি পাহাড়ি গোরিলাদের সাথে মিশে গিয়ে, তাদের ভাষা-আদবকায়দা শিখে, তাদের সাথে থেকে, বন্ধু ও রক্ষাকারী হয়ে জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। লিখেছেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'গোরিলাস ইন দ্য মিষ্ট'। একসময়ে তাঁর ক্যাম্পের মধ্যেই চোরা শিকারীদের দ্বারা খুন হন। 'ডায়ান ফসে ফাউন্ডেশন' এখনও তাঁর আদর্শে পরিবেশ ও গোরিলা সংরক্ষণের কাজ করে চলেছে।

অনেক অপেক্ষা ও প্রস্তুতির পর আমার স্বপ্ন সফল। অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিমানযাত্রায় এক ছোট প্লেনে ভিরুঙ্গা মাসিফের প্রান্তভূমিতে আমরা পৌঁছলাম। 'ভলক্যানোজ ন্যাশনাল পার্কে' থাকার পারমিটেই লাগে দৈনিক দেড় হাজার ডলার করে। এছাড়া থাকা, খাওয়া, গোরিলাভূমিতে যাওয়া আসার প্যাকেজে চড়া মূল্য দিতে হয়। মাঝ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর শুরুর মধ্যে যাওয়া সবচাইতে ভাল ওই সময় জঙ্গল কিছুটা শুখনো থাকে। ইয়েলো ফিভারের টীকা এবং ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওষুধ খাওয়াটা আবশ্যক যাওয়ার আগে থাকতে। পার্কের মধ্যে সুন্দর সুন্দর থাকার কটেজ বা লজ আছে। আমরা ছিলাম সুদৃশ স্যাবিনইয়ো সিলভারব্যাক লজে। এখান থেকে আগ্নেয়গিরির অবয়ব, সবুজ বনানী, রক্তজবা সূর্যাস্ত দর্শন এক কথায় অনবদ্য।

গোরিলা দর্শনের আগে অবশ্যই জানানো হবে খুঁটিনাটি নিয়মকানুন, নিরাপত্তার বিষয়গুলি। লজ থেকেই ভাড়া দেওয়া হয় পুরু মাথা ঢাকা রেনকোট, গামবুট, ট্রেকিং স্টিক, গ্লাভস ইত্যাদি যা প্রবল বৃষ্টি এবং জলকাদাভরা কাঁটা ঝোপের মধ্যে রক্ষা করে। যেদিন যাওয়া হল সেদিন খুব ভোরে সমস্ত কটেজ ও লজ থেকে পর্যটকদের ভলকানোজ ন্যাশনাল পার্কের হেড কোয়ার্টারে পৌঁছতে হল। সেখানে রেঞ্জারদের নির্দ্ধারিত রুটে এক একটা গ্রুপ, সর্বোচ্চ আট সদস্যের, একজন করে অভিজ্ঞ গাইডের সাথে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। রেঞ্জাররা গোরিলা দলগুলিকে সব সময় ট্র্যাক করেন এবং পারস্পরিক ওয়াকিটকিতে যোগাযোগ রাখেন। কিছুটা গাড়িতে চলার পর এবার পাহাড় ভেঙে ট্রেকিং শুরু হয়। কঠিন সে যাত্রা জল কাদাভরা ঘন কাঁটা ঝোপ ভেঙ্গে। প্রতিপদে অভিজ্ঞ স্থানীয় জনজাতির গাইডের সাহায্য লাগে। গোরিলাদের বাস পাহাড়ের টঙে। এই গাইডদের গোরিলাদের গতিবিধি নখদর্পণে। এমনকি ওদের কিছু ভাষা বুঝতে পারে এবং কিছু কিছু সঙ্কেত দিতে পারে।

অবশেষে পাহাড় ভেঙে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের এক খাড়া চড়াইয়ে উপস্থিত হলাম। ছোট ও মাঝারি উচ্চতার ঘন ঝোপ। মাঝে কিছু বড় গাছও আছে। আমাদের গাইড নিয়ে এল একটি গোরিলা পরিবারের কাছাকাছি। প্রথমে তো ভয়ে উত্তেজনায় দুপা অবশ হয়ে গেছিলো। এই ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে বাসা করে রয়েছে একটি গোরিলা পরিবার। পরিবারের কর্তা এক বিশালাকার ২০০ কেজির সিলভার ব্যাক পুরুষ গোরিলা। দেখে চরম সাহসীদের বুকও কেঁপে যাবে। আমাদের দূর থেকে একটু মাপল। কিছু বলল না। কিছু করলে আমাদের গ্রুপের কেউ আস্ত থাকত না। অনেকগুলো স্ত্রী বা যৌনসঙ্গিনী। তারা

তাদের নানা বয়সের বাচ্চা কাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। বাচ্চাগুলো ছটফটে। ছোটগুলো খুব মিষ্টি। গোরিলা পরিবারের কেউ খাবার সংগ্রহে, কেউ খেতে বা কেউ বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত। কেউ কেউ ডালপালা দিয়ে তৈরী করা তাদের বাসা থেকে পা ঝুলিয়ে আমাদের দেখছে। এরা এমনিতে শান্তিপ্রিয়, নিজেদের নিয়ে থাকে। দিনের বেলা অনেকটা এলাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, রাতে নিজেদের তৈরী বাসায় ঘুমায়। ওদের দলের নানা ডাক, ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ আমরা স্পষ্ট শুতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। সবাই প্রাণভরে ছবি তুলছিল। এবার গাইড ফেরার সঙ্কেত করলেন। আমার স্বপ্ন আজ সার্থক হল।

[ভাষান্তর : রূপা বাগচী]

দার্জিলিং-কালিম্পং-এর বনবাসী আন্দোলন : উন্নয়ন বনাম অধিকার

সুমন গোস্বামী

২০০৮ সালে লাগু হবার কথা যে আইনের, সেটি এই রাজ্যে এখনও কোথায় আংশিক লাগু হয়েছে, কোথাও একেবারেই হয়নি। আমরা বলছি 'The Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006'। সংক্ষেপে 'বন অধিকার আইন'-এর কথা। উত্তরবঙ্গের সমতলের বনগ্রামগুলিকে আইন মোতাবেক রাজস্ব গ্রামে পরিণত করা এবং আদিবাসীদের জমির দখলিসত্ত্ব বিতরণের কাজটি শুরু হয়েছে। যদিও সেখানেও বিস্তর গরমিল রয়েছে, অসন্তোষ রয়েছে— তবুও এটুকু অন্তত বলা যায় যে, কাজটি শুরু হয়েছে। পক্ষান্তরে, হিমালয়ের পাহাড়ের দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় কিন্তু এই আইনটির এখনও কোনও অস্তিত্ব নেই। বনগ্রামবাসীরা কদাচ আইনটি প্রয়োগের দাবি করলে বা নিজেদের আইনি অধিকার বুঝে নিতে চাইলে প্রশাসন বারে বারে তাদের প্রতি আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, হুমকি দিয়েছে। সংসদে পাশ হওয়া একটি আইনের এখানে কোনও দামই ছিল না।

এখন কিন্তু আছে। কালিম্পং-এর বেশ কয়েকটি বনগ্রামবাসী হাতে পেলেন ১২/০৪/১৮ তারিখে ইস্যু করা একটি সরকারি চিঠি। যে চিঠিতে আইনটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে গ্রামসভার কথা বলতে গিয়ে এর আগে গ্রামবাসীরা প্রশাসনিক হুড়ো খেয়েছিলেন, সেই গ্রামসভার আহ্বান করে বসেছেন 'রাজাধিরাজ' বি.ডি.ও. স্বয়ং! ব্যাপারটি কী! দেখা গেল, চিঠিতে সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য বিষয়টি হল, 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট'। কেন, কেন? গ্রামবাসীদের থেকে 'নো-অপজেশন সার্টিফিকেট' প্রয়োজন হচ্ছে কেন সরকার বাহাদুরের?

এ গল্পের তলটা একটু গভীরে। কর্পোরেট বাটপাড়ি আর উন্নয়নের ধাপ্পাবাজির আজকের এই ভারতে এই একখানা আইন (বন অধিকার আইন) ভয়ানক শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়মগিরিতে কর্পোরেট দস্যুদের আটকে দিয়েছে এই বন অধিকার আইন। মহান পসকোকেও মূলত এই আইনের কারণেই পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে ভারতের মাটিকে ফোঁপরা করার সুমহান উদ্যোগে বারবার এভাবেই বাগড়া দিয়েছেন একটি আইনের বলে বলীয়ান বনগ্রামবাসীরা। হ্যাঁ, আইনটিতে বনগ্রামের মানুষকে এতটাই অধিকার দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, এই সমস্ত ধাক্কার পর থেকেই উন্নয়ন ও প্রগতির মহান কারবারিরা সতর্ক। সরকারি স্তরেও জমি-টমি নেবার প্রয়োজন হলে নানা কায়দা করে চেষ্টা করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকাভুক্ত বনগ্রামের সকলের থেকে স্বাক্ষর যোগাড় করার। গ্রামবাসীকে ডেকে নিয়ে এসে গম্ভীর মুখে ইংরেজিতে লেখা কাগজে সই করতে বলা হচ্ছে। একবার সই হয়ে গেলে ওই কাগজই হয়ে দাঁড়াবে 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট'!

কিন্তু কালিম্পং-এর বনগ্রামের মানুষরা এই চিঠি পেলেন কেন? খুব সোজা— আইনের বাধ্যবাধকতা। তিস্তা উপত্যকায় প্রস্তাবিত সেবক-রংপো রুটে রেললাইন পাতা এবং ১০ নং জাতীয় সড়ক (পূর্বতন ৩১/এ জাতীয় সড়ক) প্রশস্ত করার জন্য জমি দরকার। অরণ্যের জমি। আর অরণ্যের জমি হস্তান্তর করতে বনগ্রামবাসীদের 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' চাই। ফলত এই সরকারি ফতোয়া। এই দুটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অবশ্য কেবল বনভূমি নয়, সম্ভবত গোটা ২৪ গ্রামকেও সরে যেতে হবে। অর্থাৎ ২৪টি বনগ্রামের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বস্তুত, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কি হচ্ছেন না, হলেও কতটা— এসব জানার আগেই 'নো-অবজেকশন' নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সাবাশ! এই না হলে গণতন্ত্র! যে ক'জন বনগ্রামবাসী আগেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলেন, তারা কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন ঘনঘোর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার। ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রতিবাদীদের। রাজ্য সরকার বলুন, গোর্খা টেরিটেরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) বলুন— কেউই এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কর্ণপাত পর্যন্ত করেননি। জিটিএ-র নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান সাহেব তো আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওই প্রকল্পগুলিতে বনগ্রামবাসীদের ওপর কোন আঁচ লাগবে না। যদিও সতেরোটি বনগ্রামকে ব্লক অফিস থেকে চিঠি (পূর্বোল্লিখিত) ধরানো হয়েছে। যেখানে গ্রামবাসীদের ঘুরিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' দেবার জন্য। অর্থাৎ মানুষের হাতে অধিকার পৌছাক, এটা প্রশাসনের উদ্দেশ্য মোটেই নয়। তারা আসলে চাইছেন যে কোনও প্রকারে হোক, 'এন-ও-সি'টি হাতিয়ে নিতে। নোটিশটির সঙ্গে আজব একটি সরকারি অর্ডারও সংযুক্ত আছে। যেখানে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে বিডিও-কে 'গ্রামসভা আহ্বান করার ক্ষমতা' দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে, আইনে এ ধরনের কোনও সংস্থান নেই। বনগ্রাম-এর গ্রামসভা কখনওই বি.ডি.ও. আহ্বান করতে পারেন না। সঠিক ভাবেই দার্জিলিং কালিম্পং-এর বনগ্রামবাসীরা একত্রে (হিমালয়ান ফরেস্ট ভিলেজার্স অর্গানাইজেশন) এই মিটিংগুলি বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, পঞ্চায়েত দপ্তর বা বিডিও-কারওরই এই ধরনের মিটিং ডাকার কোনও অধিকার নেই। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন। সেটা হল : যতদিন

না দার্জিলিং-কালিম্পং-এর বন গ্রামবাসীদের প্রতিটি ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে (বন অধিকার আইন মোতাবেক), ততদিন এই ধরনের এন.ও.সি. নিয়ে কোনও আলোচনাই করা হবে না। প্রশাসনের তরফ থেকে বারংবার বলা হচ্ছে, প্রকল্পগুলি তাঁরা বাস্তবায়িত করেই ছাড়বেন।

উন্নয়ন(!) এর দাপটে ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে তিস্তা। সিকিমে দুটি এবং পশ্চিমবঙ্গে দুটি, মোট চারটি বাঁধ দিয়ে খরস্রোতা উচ্ছল এই পাহাড়ি নদীকে হতশ্রী করে ছেড়েছে উন্নয়ন পাগলেরা। তিস্তার জল ক্যানেল বেয়ে মহানন্দা হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে গঙ্গায়। হ্যাঁ, এই বিষয়টি নিয়েই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাঝেমাঝেই অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন। একইসঙ্গে পাহাড়ের ভূমি হয়ে উঠেছে নড়বড়ে। কখনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য, কখনও রাস্তা চওড়া করার জন্য আঘাত নেমেছে প্রকৃতির বুকে, আঘাত নেমেছে প্রকৃতিকে জড়িয়ে বাঁচা মানুষগুলির বুকে। এখন সংযুক্ত হল সেবক-রংপো রেললাইনের প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ উচ্ছেদের ফতোয়া। এই সেবক-রংপো রেল সংযোগ প্রকল্পটি আবার আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর 'স্বপ্নের প্রকল্প'। উনি তো ঠিক মুখ্যমন্ত্রী নন কিনা! ব্রিটিশ জমানার ছোট লাট বরং। (ইদানীং রাজ্যের ডি.এম. বা এস.পি.-দের আচরণ দেখে সত্যিই ধন্দ জাগে- এটা বর্তমান ভারত নাকি ঔপনিবেশিক!) তা মমতাদেবী মানুষকে 'হাসাতে' পারলে খুব স্বস্তি বোধ করেন! উনি বলে দেন, 'জঙ্গল হাসছে।' ব্যস, সরকারি সাইনবোর্ড বসে গেল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মোড়ে মোড়ে—'জঙ্গল হাসছে'। উনি ঠিক করলেন, এবার পাহাড় হাসছে। ব্যস, সাধ্য কি পাহাড়ের, না হেসে? এবং এই ভাবেই রাজ্যের সর্বত্র, প্রত্যন্ততম এলাকায় পৌঁছে যায় ওনার সহাস্যবদন সরকারি সাইনবোর্ড। না, ব্রিটিশ লাট কার্জন বা ক্যানিং-রাও বোধহয় এতটা করতেন না। সে যাকগে, এর আগে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতাদেবী হঠাৎ খেয়াল করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমে রেলপথে যাবার কোনও উপায় নেই। ইতিহাসে নিজের নাম লিখে ফেলার কোনও সুযোগ কিন্তু উনি কিছুতেই ছাড়তে রাজি নন। তাই ওই স্বপ্নের প্রকল্প পেশ। শিলিগুড়ির কাছে সেবক স্টেশন থেকে হিমালয় পাহাড় আর চিরহরিৎ বৃক্ষের প্রাচীন অরণ্য চিরে একখানা রেললাইন গিয়ে পৌঁছবে সিকিম সীমান্তের রংপোতে। জুড়ে যাবে সিকিম! পর্যটকেরা আসবেন কু-ঝিকঝিক। কত হাসাহাসি! কিন্তু এই হাসাহাসিতে ওই অঞ্চলের হাজার হাজার বনগ্রামবাসী বা অন্যান্য সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হবে কি? উন্নয়নের পসারিরা কেউ হিসেবটা কষতেও বসেনি। পক্ষান্তরে, প্রস্তাবিত রেলপথের নির্দিষ্ট গমনপথটি এখনও জানা না গেলেও ১৭টি বনগ্রামকে নোটিশ ধরানো দেখে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। নবীন হিমালয় পর্বত এবং নিবিড় প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি দিয়ে ছুটবে ট্রেন। কাটা হবে পাহাড়ের শরীর, কাটা হবে জঙ্গলের শরীর। পথে খামোখা আবর্জনাস্বরূপ বনগ্রামগুলিকে তো সরতেই হবে!

ব্রিটিশের তৈরি করা বননীতি (যা এখনও অনুসৃত) আমাদের দেশের জঙ্গলকে মোটামুটি অর্ধমৃত বানিয়ে ছেড়েছে। সর্বত্র প্রাকৃতিক অরণ্য বিনাশ করে তৈরি হয়েছে অর্থকরী লাভদায়ক বৃক্ষরাজির জঙ্গল। এই সর্বঘাতী প্রকল্প থেকে নিজেকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে যে গুটিকয় প্রাচীন অরণ্য এলাকা, এই প্রকল্প তাদেরই অন্যতমের ওপর আঘাত হানতে চলেছে। তিস্তায় একের পর এক বাঁধ নির্মাণ যে ভূমিকম্প এবং ধসের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছে, এই প্রকল্প তার বৃদ্ধি ঘটাবে বলেই আশঙ্কা। ক্রমাগত পাহাড় কাটলে আর কী-ই বা হতে পারে!

ভাঙতে ভাঙতে গড়ার বাঁধনে বিপন্ন সুন্দরবন

সুভাষ মিস্ত্রী

ক

''জল-জঙ্গল-জন''— তিন 'জ' মিলে 'সুন্দরবন'। এক 'জ'-এ জল-নদী-সমুদ্র, দুই 'জ'-এ সুন্দরবনের জঙ্গল, তিন 'জ'-এ জন— সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষজন। হিমালয়, ছোটনাগপুর পর্বতমালার টুকরো টুকরো মাটি পাথর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদী খাঁড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের নোনা জলের সংস্পর্শে এসে সমতল ব-দ্বীপের সৃষ্টি। সুন্দরবন গড়ার আদি লগ্ন থেকে যে ভাঙাগড়ার সূত্রপাত, তা এখনও অব্যাহত। গাঙ্গেয় এই ব-দ্বীপ অঞ্চল এখনও দ্রুত গঠন ও পরিবর্তনশীল হওয়ায় ভূমির স্তর বিন্যাস অসম ও অসমাপ্ত। জলের স্বাদুতানুসারে যদি সুন্দরবনকে আড়াআড়িভাবে ভাগ করা যায় তো দাঁড়ায়— মিষ্টি জলের স্বাদু সুন্দরবন ও নোনাজল কল্লোলিত সুন্দরবন। মিষ্টি জলের এলাকাই পূর্বদিকের সুন্দরবন— এর উৎস মূলত হুগলী, ইছামতী-বিদ্যাধরীর খাল। বাকি অংশ নোনাজল সংপৃক্ত।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড দেশের মতো সুন্দরবনও সমুদ্রসম্ভূত। যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০ মিটার উচ্চে। কোনও অজ্ঞাত অতীতে সুন্দরবনের বেশীর ভাগ অংশ ছিলো ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেক

উঁচুতে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের অবনমন, ভূমিকম্প, নদী-মোহনার অতলগর্ভ, বন্যা, ঘূর্ণাবর্ত্ত, সুনামি ইত্যাদি কারণে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রত্ন-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পুনসৃষ্টির অমোঘ প্রক্রিয়ায় উত্থান ঘটে সুন্দরবনের এবং খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই, বিশেষ করে কুষাণ-পূর্ব থেকে সেনযুগব্যাপী আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এক সুসমৃদ্ধ গ্রাম, নগর, বন্দর গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে এক সুসংহত সভ্যতা। কখনো তা 'মণ্ডলিকা' কখনো বা 'গঙ্গারিডি' সভ্যতা নামে পরিচিতি পায়। কিন্তু তার অধিকাংশই প্রলঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, ভূকম্প, ঝড়-বন্যা, জলস্ফীতি, নদীশ্রোতধারার অতলগর্ভ আবর্তিত প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণী, আয়লা কিংবা পাললিক ভূমির নৈসর্গিক অবনমন প্রক্রিয়ায় জলমগ্ন হয়ে যায়। পুনরায় ছয়-সাত হাজার বছর ধরে নদী-সমুদ্র ভূমিভাগের আপন খেলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জনশূন্য এলাকা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবী বিখ্যাত দ্বীপময় 'ম্যানগ্রোভ' অরণ্য বা বাদাবন।

'ডেলটা' শব্দ গ্রীকবর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর ত্রিভুজের মতো দেখতে। সুন্দরবন মূলত বিশাল গাঙ্গেয় ডেলটা বা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। হিমালয় পর্বতমালার বরফগলা জলরাশি পার্বত্য রেণু বহন করে ছুটতে থাকে সাগর অভিমুখে। বালি-মাটির সমন্বয়ে বা তুষার মৌলির পাললিক মৌল সমন্বয়ে উঁচু হতে থাকে। পঞ্চদশ শতকে গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে জলরাশি ভৈরব ও পদ্মায় প্রবাহিত হ'তে থাকলে মোহনায় এসে গঙ্গারই শাখা পদ্মা-ভাগীরথীর মধ্যবর্তী স্থান ত্রিভুজাকৃতি ঝালর সদৃশ লবণাক্ত পল্ললময় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে শ্বাপদসংকুল, কোথাও জনপদবহুল ভূমিখণ্ড।

পর্তুগীজ 'ম্যংগু' (লবণাক্ত জলসিক্ত উদ্ভিদ) ও ইংরাজি 'গ্রোভ' (তরুবিথিকা) শব্দ সহযোগে (ম্যানগ্রোভ) শব্দের সৃষ্টি। সুন্দরবনে যে অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম ও পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বনভূমি বর্তমান, সেই ভূমির বাস্তুরীতি নিরক্ষণ করলে পলিগঠিত চর ও বিকাশপর্বকে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

প্রথমত ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫ মিটার পর্যন্ত জোয়ারী অবস্থা। ধীরে ধীরে পলি জমে ভূমিগঠন ও উচ্চতা বৃদ্ধি করে। বীরূৎ-গুল্ম-বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদই জন্মে।

দ্বিতীয়ত ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫-৮ মিটার উচ্চ জোয়ারযুক্ত চরভূমি, জোয়ার-ভাঁটা জলে পলি জমতে জমতে ভূমির উত্থান এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সেখানে আর জোয়ারের জল পৌঁছতে পারে না। বীরুৎ-গুল্ম-বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদগণই জন্মে।

তৃতীয়ত ঃ সমুদ্রবক্ষ হতে ৮ মিটার উচ্চে অবস্থিত। মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বাস্তুরীতির ব্যাপক পরিবর্তনশীল এই স্তরেই ধীরে ধীরে জনপদ গঠিত হয়। লবণাম্বু উদ্ভিদ ব্যতীত বিভিন্ন উদ্ভিদগণ জন্মে।

চতুর্থত ঃ সমুদ্রবক্ষ হতে ৮-৯ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমি। মাটির লবণভাব বারংবার বৃষ্টির জলে ধৌত হয়, কৃষি উপযোগী হয়। জঙ্গল-হাসিল ভূমিতে লবণাম্বু মাটিতে উপযুক্ত উদ্ভিদগণ জন্মে।

পঞ্চমত ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৯ মিটার উচ্চে অবস্থিত মরুময়ভূমি। অলবণাম্বু ও চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মে।

উদ্ভিদ-উপযোগী চরসৃষ্টি ও গঠনের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বর্তমান সুন্দরবনের আদিআত্মার পরিচয় খানিকটা মিললেও সুন্দরবনেরই একমাত্র বিকল্প সুন্দরবন। ভাঙা গড়ার অমোঘ প্রকৃতির অস্থির অবস্থানের চিরস্মারক।

সুন্দরবনের একদিকে বছরের পর বছর পলি জমে গড়ে উঠেছে ভূভাগ, সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে 'কলকাতা', অবিভক্ত 'চব্বিশ পরগণা' প্রভৃতি জেলা। আর সাথে সাথে দক্ষিণে সমুদ্র আরও পিছনে সরে যাচ্ছে। গড়ে উঠেছে 'পূর্বাশা' ইত্যাদি। অন্যদিকে চলছে প্রকৃতির অবনমন, অচলগর্ভ ভূকম্পন ইত্যাদি। ফলে দেখা যায়, ২ হাজার বছর আগের মোহনা বর্তমান মোহনার থেকে ২০০ মাইল ভিতরে ছিলো অর্থাৎ ১৪৪ অক্ষাংশের মধ্যে।

টলোমিকৃত ভূগোল থেকে শুরু করে ডব্লু ডব্লু হান্টারের বিবরণ পর্যন্ত এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং এও স্বীকৃত যে ভূমিগঠন এখানো অব্যাহত। আদি-মধ্য-নব্য প্রস্তার যুগের সুন্দরবন বা কুষাণপুর্ব থেকে সেনযুগ পর্যন্ত সুন্দরবন অথবা গত চার-ছয় হাজার বছরের সুন্দরবন আজ ভূ-প্রত্ন-বিজ্ঞান ও প্রত্নপ্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতির আলোচ্য বিষয়। কথিত আছে, সেন পরবর্তী সুলতান মামুদের উজির খাজা-ই-জাহাল বা জাহানআলি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল তথা সুন্দরবন সংস্কার উন্নয়নের সূচনা করেন। আকবরের সময়ে দক্ষিণ পরগণা ছিল সাতগাঁও-র অধীন। চব্বিশ (সংখ্যাবাচক) + পরগণা (ফারসী) = চব্বিশ পরগণা সমাসবদ্ধ দ্বিশাব্দিক স্থাননাম মোগল যুগ থেকেই প্রচলিত। টোডরমল 'সুবেবাংলা' কে ১৫৮৫ সালে ১৯টি 'সরকার' ও তার অধীন ৬৮২টি 'মহালে' বিভক্ত করেন। আওরঙ্গজেবের ভাই সাহসুজা ১৬৫৮ সালে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজার স্থির করতে ৩৪টি 'সরকার' ও তার অধীন ১৩৫০টি 'মহাল' বা 'পরগণা'য় বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে জরিপের পর মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭৭২ সালে তাহাই 'জামা-ই-কালিম তুমার' নামে ১৩টি 'চাক্‌লা' ও ১৬৬০টি 'পরগণা' গঠন করেন। তথ্যভিজ্ঞদের মতে পাঠানশাসক শেরশাহ বঙ্গদেশে 'পরগণা' ভিত্তিক গ্রাম-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক।

বস্তুতপক্ষে, প্রতাপাদিত্যের পতনের (১৬১০) পর সুন্দরবন সম্পূর্ণ অরক্ষিত থেকে যায়। যদিও দক্ষিণাঞ্চলে মোগল শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকলেও 'সুন্দরবন' চলে যায় ফিরিঙ্গিদের হাতে। ১৬৩২-এ তারা সাগরদ্বীপে আরাকান রাজের সহায়তায় দুর্গ বানায়। এই সময় থেকেই বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চল তথা '২৪ পরগনা' তখনও কতগুলি মৌজা, তকসিমজা বা আসল তুমার জমা বা মধ্য যুগের মোগল আমলে ডিহি, চাক্‌লা, গ্রাম সমষ্টি বা জেলার অংশ নামে পরিচিত। ১৭৩৭ থেকে পোর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে মূল ঘাঁটি গড়লে সুন্দরবন হয়ে ওঠে 'মগের মুলুক'। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আমবাগানে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার মাধ্যমে তামাম বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ১৫ জুলাই ইংরাজ কোম্পানি ও নব নবাব মীরজাফরের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষর হয়। উক্ত চুক্তিপত্র বা সন্ধি অনুযায়ী ২০ ডিসেম্বর নবাব কোম্পানিকে '২৪টি পরগণা'র (আয়তন ৮৮২ বর্গ মাইল) সত্ত্বাধিকার প্রদান করেন। বদল হয়

ভারতবর্ষের ইতিহাস, পরিবর্তিত হয় বঙ্গদেশ, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় সচেতনতায় আক্ষরিক অর্থে সুন্দরবনকে নিয়ে টানা-হেঁচড়ার আর এক ক্রান্তিকাল। যদিও এই '২৪টি পরগনা'র মধ্যে 'দেরুবস্ত' বা পূর্ণ পরগণা ছিল ১২টি এবং 'কিসমত' বা আংশিক পরগনা ছিল ১২টি। জল, জঙ্গল, নদী-খাঁড়ি, খাল বিলে পূর্ণ শ্বাপদশঙ্কুল এই অঞ্চলের মধ্যে বর্তমান ৬টি হাওড়া-হুগলী জেলার অন্তর্গত হলেও নদীয়া-যশোর থেকে ২৯টি যুক্ত হওয়ায় ২৪ পরগনার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ - ৬ = ১৮ + ২৯ = ৪৭টি। আর ১৭৬৫-এ ওলন্দাজ উচ্ছেদপর্বে সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫টি। কিন্তু, ২৪ পরগনা পঁচাত্তর পরগনা হয়নি। কলকাতা থেকে ২৪ পরগনার জমিদারি পরিচালিত হলেও কিছুকাল পর কলকাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে কোম্পানির প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। তখনও ২৪ পরগণার আদি ক্ষেত্রভূমি 'সুন্দরবন' কোম্পানির শাসনের বাইরে হুগলী জেলাধীন।

১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পর্বে সুন্দরবনকে ২৪ পরগণা ভুক্ত করা হয়। যদিও সুন্দরবন জরিপ, সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদির কাজ ১৭৮৪-এর ৭ ফেব্রুয়ারি ক্লড রাসেল ও হেংকেল সাহেবের দেওয়া প্রস্তাব মোতাবেক। সে সময় ১৪৪ জন দেশি-বিদেশি জমিদারকে ঠিকা দেওয়া হয় এবং ১৮১৬ সালে ৯ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে 'সুন্দরবন' প্রশাসনের ভার ন্যাস্ত হয় মিঃ স্কট নামে একজন কমিশনারের উপর। ২৪ পরগনা, নদীয়া, যশোহর, ঢাকা, জামালপুর, বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণের সুন্দরবন ভূখণ্ডের চৌহদ্দি নিশ্চিত করেন। এই ১৮১৬ সালে সুন্দরবনের জন্য পৃথক কমিশন নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই 'সুন্দরবন' নামে ২৪ পরগণা ভুক্ত হয় এবং ২৪ পরগনার মধ্যেই এইভাবে জিলা (আরবী) বা জেলা রূপে পৃথক 'সুন্দরবন জেলা'র বীজ রোপিত হয়। ১৮২১ সালে ড. ডেলকে, ম্যাঙ্গেলস এবং ১৮২৮ সালে উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ার ও সার্ভেয়ার লেফটেনান্ট হেজেস সুন্দরবন জারিপে সীমানা নির্ধারণ করেন, (ড্যাম্পিয়ার— হেজেস লাইন), আজও তা সুন্দরবনের সীমারেখা হিসাবে মান্যতা পেয়ে আসছে। ১৮২৯-এ কিছু রদবদলের পর ১৮৩৮ সালে শেক্সপিয়ার, ১৮৪৪-৪৫ সালে বাঙালি কালেক্টর উমাকান্ত সেন কমিশনার নিযুক্ত হন। তখন সুন্দরবনের সদরদপ্তর আলিপুর। ১৮৭০ সালে কালেক্টর হান্টার সাহেব এবং ১৯০৪-০৫-এ সুন্দরবনের শেষ কমিশনার সাণ্ডার ১৯০৫ সালে সুন্দরবন আইন পাশ করেন ও ১৮১৬ সালের রেগুলেশন রদ করেন, সুন্দরবন কমিশন অফিসও উঠে যায়। ভারতের 'টেম্পেস্ট' সুন্দরবনকেও গ্রাস করে নেয় অনুশাসনের অভ্যস্ত ভূগোল। কিন্তু, আজও সুন্দরবন পৃথক 'জেলা' না হয়ে দুই ২৪ পরগনা ভুক্ত হয়েই আছে।

২৪ পরগনার ভাঙাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সুন্দরবন জেলা'র অস্তিত্বও বিপন্ন হতে থাকে বা সুন্দরবনের চেহারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। লর্ড ময়রার সময় ২৪ পরগনার জন্য স্বতন্ত্র কালেক্টর গঠিত হলেও ১৮১৪ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রথম জেলা বিভাজনে নাম হয় শহরতলি জেলা (সুবার্বন ডিস্ট্রিক্ট)। ১৮ বছর পর তা রদ হয়। ১৮২২-২৩ সালে মিষ্টার মরিসনের মানচিত্রের সাহায্যে বনাঞ্চলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ক্রমিকসংখ্যায় নির্দিষ্ট হয়। সীমানা নির্ধারণে ১৮৩০ সালে মিষ্টার ড্যাম্পিয়ার ও মিষ্টার হেজেসের জরিপের ফলাফলকে ভিত্তি করে সুন্দরবনের ভূখণ্ড সীমাবদ্ধ করা হয়। ১৮৩২ সালে পুনঃ প্রশাসনিক কারণে আলিপুর ও বারাসাত যুগ্ম জেলা নামে বিভক্ত হয়। ১৮৬১ পর্যন্ত অলিপুরের মতো সমান্তরাল জেলা সদর হিসাবে কাজ করেছে বারাসাত যুগ্ম জেলা। ১৮৮১ সালে ২৪ পরগনাকে সাতক্ষীরা, দমদম, বারুইপুর, বারাসত, বারাকপুর, ডায়মন্ডহারবার, বসিরহাট ও আলিপুর— এই ৮টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। এরপর ১৮৮৩, ১৮৯৩, ১৯০৪ বা ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত মহকুমার সীমানা বিন্যাসে বহু রদবদল ঘটে। ফলত, ১৯০৫ সালে ২৪ পরগনার সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে সুন্দরবনকে যুক্ত করা হয়। সুন্দরবনও কখনো বা মহকুমার হাত বদলে কখনো বা প্রশাসনিক প্রাসঙ্গিকতায় নিজেকে বদলাতে থাকে। অতঃপর ১৯৮০ সালের ৩০ জুন রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে ২৪ পরগনা জেলার বিভাজন প্রস্তাব কর্মসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নামে দুটি পৃথক পৃথক 'জেলা' রূপে আত্মপ্রকাশ করে আর 'সুন্দরবন জেলা' অনুভাবনাটি তখনকার মতো সমাধি লাভ করে।

কিন্তু, এইটি বাহ্য যে, ১৮১৬ সালের বিধিবদ্ধ আইন মোতাবেক খুলনা-বরিশাল ও ২৪ পরগনা লাগোয়া সুন্দরবনের জন্য আলাদা কমিশনার নিযুক্ত হলেও ১৯০৫ সালে তা রদ হয়। যে সুন্দরবনের বৃহত্তর অংশকে পৃথকভাবে দেখার প্রেক্ষিতে (১৮৬১-১৯০৫) স্বতন্ত্রভাবে 'সুন্দরবন জেলা'-র দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে সাবেক ২৪ পরগনা দুই শরিক উত্তরকে কিছুটা আর দক্ষিণকে বাকীটা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার 'নাম' পুনরায় 'বারাসাত' বা 'বসিরহাট' করার দাবি উঠেছে। ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর প্রয়াণ, সুনেতৃত্বের অভাব, কিছু মানুষের অজ্ঞতা ও উচ্চাভিলাষী অনুদার ও রাজনৈতিক মদতপুষ্ট অভিসন্ধিমুলক আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা নিশ্চয় 'সুন্দরবন জেলা'র ললাট লিখন নয়। বস্তুতপক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিম্নাংশ তথা সুন্দরবন আজও ভূমি গঠনে ক্রিয়াশীল হওয়ায় বা যে ভূস্তর পরিবর্তনশীল ও গঠনানুবর্তী হওয়ায় ভাঙাগড়ার বিজ্ঞানভিত্তিক স্তরায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কালানুযায়ী বসতি বিন্যাসের ভ্রূণচিহ্ন বা সাংস্কৃতিক স্তরায়ন অনুসন্ধান সবসময় সম্ভব হয়না।

খ

সুন্দরবন-ভ্রূণ আবিস্কারে প্রাগঐতিহাসিক আদি-মধ্য-নব্য প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে কুষাণ- মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন যুগের নানাবিধ প্রত্ন উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, হচ্ছে। এরই পাশাপাশি বেদ-পৌরাণিক সাহিত্য, গ্রিক-রোমাঞ্চ, চৈনিক লেখক, পর্যটক-ভূতাত্ত্বিকদের অজস্র বিবরণাদি এক উচ্চতর জীবনের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

তবে সুন্দরবন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে পিছিয়ে যাবার দরুণ অনুভূতি যে, ভূমিভাগে বিভিন্ন ধরনের লবণ ও অ্যাসিড থাকায় মানবগোষ্ঠীর জৈব-সংস্কৃতির অস্তিত্বের স্মারক অস্থি-কঙ্কালের জীবাশ্ম তৈরি অসম্ভব হয়ে পড়েছে, অথবা সমুদ্রে বিপুল জলরাশির দিকে প্রধাবিত হয়ে গেছে, কিংবা পলিজ মৃত্তিকার অতলগর্ভে চিরসমাধি

লাভ করেছে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সুন্দরবনের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মানুষ নিয়ে গঠিত। এই সমস্ত মানুষের ধর্মানুভূতি, বৃত্তি, আচার-আচরণাদিও বিভিন্ন। জাতি-ধর্ম উভয় দিক থেকে এই জনগোষ্ঠী অসমগোষ্ঠীভুক্ত এবং এখানকার মানুষ মূলত নিগ্রয়েড মহাজাতিভুক্ত। এদের মধ্যে প্রব্রজিত হয়েছে আদি অষ্ট্রেলীয় ও নর্দিক বা তথাকথিত আর্যগোষ্ঠী।

প্রকৃতার্থে আধুনিক সুন্দরবনের শুরু ১৭৫৭ থেকে। খন্ড-বিখন্ডের শৃঙ্খলে সুন্দরবন ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে স্বাধীনতাউত্তর পর্যায়ে সরকারিভাবে ঘোষিত 'উদ্‌বৃত্ত' সুন্দরবনকে, সভ্যতার ঘোমটার আড়ালে ধ্বংসস্তূপে নিমজ্জমান সুন্দরবনকে জীব পরিমন্ডলের ভারসাম্য স্থিত রাখতে বাধ্যত সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত করা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ'। ওই বছরই গড়ে ওঠে 'সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প।' ১৯৭৬-এ 'কুমির প্রকল্প'। ১৯৮০-এ 'জাতীয় উদ্যান' বা ভারতের নবম 'অভয়ারণ্য' এবং ১৯৮৯-এ 'সুন্দরবন জীবমন্ডল সংরক্ষণ প্রকল্পভুক্ত' হয় সুন্দরবন। ২০০২-এর ২১ জুলাই থেকে 'সুন্দরবন দিবস' পালিত হচ্ছে। ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ জরাসন্ধ বধের মতো ২৪ পরগনাকে উত্তর ও দক্ষিণে ভাগাভাগি করে সুন্দরবনকে 'চিরস্থায়ীভাবে' দু'ভাগে দু'জেলায় ফেলে নিয়ত বিপন্ন করার জন্য দায়ী কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষেরই অবিমৃষ্যকারী পদক্ষেপ ও অপরিণামদর্শী অসচেতনতা। আর যাই হোক, 'প্রশাসনিক সমস্যায় বিপন্নতা বোধ' করার কোনো কারণ নেই, সুস্থ মানুষের বিপন্ন বোধ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। 'সুন্দরবন' একদিন পৃথক 'জেলা' হয়ে উঠবে নিশ্চয়।

গ

অবিভক্ত ভারতের 'সুন্দরবন' ভারত-পাক বিভাজনে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ৮০০০ বর্গ মাইলের অধিক সুন্দরবনের মাত্র ৩০৮৯ বর্গমাইল পশ্চিমবঙ্গের অংশে আসে। স্বাধীন ভারতে 'পূর্বাশা' সহ সুন্দরবনের দ্বীপ সংখ্যা ১০২। এখনো পর্যন্ত ৫৪ টি দ্বীপ ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার বেঁধে বেঁধে পুরো সাফ করে মানুষ্যবসতি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ ভারতে সুন্দরবন আবাদ-পত্তনে প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্য ছিলো—

১. সুন্দরবনের অফুরন্ত সম্পদকে উপভোগ করা।

২. বাঘ-সাপ-শুয়োর-হরিণগুলোকে দ্বীপ ছাড়া করে জঙ্গলময় জমির অধিকার অর্জন।

৩. দ্বীপগুলোকে চাষ ও বাসযোগ্য উপনিবেশ গঠন করা।

৪. বন্যারোধ ও সেচ সুরক্ষার জন্য নোনা নদীগুলো বাঁধে বন্দী করে ঘিরে ফেলা।

সুন্দরবনের নদীর একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রতিদিন অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় ২ বার জোয়ার-ভাঁটা খেলে ও সব নদীরই সঙ্গে সমুদ্রের নিবিড় যোগ বর্তমান। ৫৪ টি দ্বীপ ঘিরে ৩৫০০ বর্গ কিলোমিটার নদীরই চরভূমি কেটে নদীবাঁধ নির্মিত হয়। আজও তার এক ইঞ্চিও বাড়েনি,হল্যান্ড-ইংল্যান্ড প্রভৃতি সমুদ্রসম্ভূত দেশেরমতো মজবুতীকরণও হয়নি, বরং প্রতিবছর বর্ষার সময় বাঁধ মেরামতির কানামাছি খেলার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা সেবায়েতরা নয়-ছয় করার সুযোগ পান। আস্ত শীতমরশুমে পরিকল্পনামাফিক কেন যে কার স্বার্থে বাঁধ মেরামতি বা নির্মাণ কাজ হয় না বোঝা মুশকিল।

সুন্দরবন আবাদ পত্তনে যে জনপদ গড়ে উঠেছে তার ফলশ্রুতিতে একদিকে বাঘ-সাপ-কুমিরের সহবাস তথা আদিম জাঙ্গলিক সংস্কৃতি, অপরদিকে সুন্দরবনের পূর্বপুরুষদের অন্যত্র থেকে প্রব্রজিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি এবং তাদের ও বর্তমানের মিলিত জীবন চর্যা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্মানুভূতি, অর্থচিন্তা, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি সব মিলেমিশে গড়ে উঠেছে উৎপাদনভিত্তিক এক মিশ্র সমাজ-সংস্কৃতি।

প্রথমতঃ শহর ও গঞ্জ সংলগ্ন সুন্দরবন বা একটা পরিণত দ্বীপপুঞ্জ। কৃষি প্রধান উৎস হলেও নানাধরণের কাজকর্মের সুযোগ আছে। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহারে শহুরে ছায়া আলম্বিত। কলকাতা ও সাবেক ২৪ পরগনার শহর এই সুন্দরবনেরই পরিণত অংশের উপর অবস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ নিবিড় গ্রাম্যময় সুন্দরবন বা আবাদ উত্তর ব-দ্বীপ। মূলত কৃষিভিত্তিক। আবাদ পত্তনের শুরু থেকে আর পাঁচটা গ্রামের মতো স্বপ্ন ভঙ্গের অপরিণামদর্শিতায় আচ্ছন্ন ফসকো গেরোয় প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ক্রীড়নক। বিশেষকরে খোদার ওপর খোদকারি করা নিত্য নিয়ত সমস্যাসঙ্কুল বিপন্ন সুন্দরবন।

তৃতীয়তঃ একেবারে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গল ও সমুদ্রসংশ্লিষ্ট ব-দ্বীপ। চাষাবাদ থাকলেও অনেকটাই জঙ্গল নির্ভর। আদিম এবং প্রধান দ্বন্দ্ব তাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চয়তা ও অসহায়তায় ভরা। জাদুশক্তি, দৈবশক্তি, ধর্মসংস্কার, বিশ্বাস, মন্ত্রতন্ত্র নিত্যসহচর। অন্য নির্ভরতায় বেঁচে থাকাটাই নিয়তি।

চতুর্থতঃ চরভূমি। সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত বনভূমি বা অভয়ারণ্য। ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য বৃক্ষের এই জঙ্গলেই বাঘ, বরা, বানর, হরিণ, শুকর, গন্ডার, সাপ, কুমির, কামোট, মাছ, কাঁকড়া, বিভিন্ন পাখি, মৌমাছি, কীট-পতঙ্গ। ইত্যাদি স্বাধীন বিচরণভূমি ছিল। গন্ডার অবলুপ্ত হয়েছে, অন্যরা কমে এসেছে।

২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী বনকে 'ওয়াইলডারনেশ জোন' (১৩৩০ বর্গ কিলোমিটার) ও 'বাফার জোন' (১২৫৫ বর্গ কিলোমিটার) হিসাবে বিভক্ত করা হয়েছে। চারিত্রিক অবস্থানুসারে বনভূমি—

১। বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী সৈকতাশ্রিত বনভূমি।

২। সুন্দরবনের গভীর ও নদীবক্ষে সর্বদা নিত্যগঠনশীল বনভূমি।

৩। নদীবাঁধ ও চরের বনভূমি।

৪। নিম্নভূমির বনভূমি।

৫। নোনা জলের জোয়ার ভাঁটা খেলা প্লাবিত বনভূমি।

ঘ

দ্বাদশ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুন্দরবন অববাহিকা ভূ-পৃষ্ঠের অবনমনে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে কাত্ হয়ে যাওয়ায় ভাগীরথী হুগলির স্বাদু জলপ্রবাহ কমে গেছে। গড়ে প্রায় ১৮ ফুট নীচে বসে গেছে সুন্দরবন। বর্ষাকাল ব্যতীত সমগ্র নদীগুলিতে সমুদ্রেরই জোয়ার-ভাঁটার

জল ওঠা নামা করে। ফলে নদীর জল ভীষণ নোনা। সমুদ্র সন্নিহিত অধিকাংশ নদীতে জোয়ারের প্রবাহ উঠতে উঠতে বিশেষ অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছায়, আবার ভাঁটিতে সেই জল বেরিয়ে যেতে না যেতেই জোয়ার লাগে। সে কারণে ওই বিশেষ অঞ্চল সমূহ বিশেষ করে সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ প্রভৃতি ব্লকগুলির নদীর জল ভীষণ নোনা। সন্দরবনের ভূ-পৃষ্ঠত্ব নোনা জলে সাধারণ ক্লোরাইড লবণের পরিমাণ প্রতি লিটারে ৩০০০ মিলিগ্রামেরও বেশী।

সমূহ এই এলাকাগুলিতে পানীয় জলের হদিশ ৮০০ থেকে ১৫০০ ফুট মাটির নীচে মিললেও মিলতে পারে। জঙ্গল তথা নদীর জল ও মাটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট বেশি থাকে। গাছগুলিও নোনা জল ও স্রোত সহ্যক্ষম। নরম কাদায় দিব্যি জন্মে। অসংখ্য ঠেসমূল-শ্বাসমুল বা শিকড়ে নিজেদের ধরে রাখতে পারার জন্য ঝড়ে বা জলের তোড়ে উপড়ে যায় না। জঙ্গলের উত্তর থেকে দক্ষিণে গেলে প্রথমে বাইন প্রজাতির জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। এই সমূহ জঙ্গলে গর্জন, কাঁকড়া, সুন্দরী (আবাদপত্তনের সময় কাটার ফলে ও স্বাদুজলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় সুন্দরী তেমন জন্মায় না। বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে সুন্দরী প্রজননে প্রক্রিয়া চলছে), তোরা, ঢালচাকা, পশুর, ধুধুল, পরশ, হেদো, হরগোজা, ওড়া, ঝাউ, গোলপাতা, হেঁতাল, গিলেলতা প্রভৃতির নিবিড় সহবস্থান। শীত বা গ্রীষ্ম উভয় মন্ডলেই এই গাছ-লতা-পাতা ঔষধ প্রস্তুত সহ বিভিন্ন ব্যবহারিক-প্রয়োজনভিত্তিক ভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কর্কটক্রান্তি সামান্য দক্ষিণে (২১°৩২′-২২°৪০′ উত্তর অক্ষাংশ ৮৮°০০′-৮৯°০০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে) অবস্থিত সুন্দরবনে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হয়। নিম্নচাপ এবং জলস্ফীতিও। জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ, আর্দ্র ও গুমোট। সমুদ্রসান্নিধ্য ও জোয়ার ভাঁটার প্রভাবজনিত কারণে বাতাসে নোনা জলীয় বাষ্প বেশী। মার্চ থেকে জুন গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩৬° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০″। শীতের তাপমাত্রা ১৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুন্দরবন বর্তমানে উষ্ণায়নের দিকে প্রভাবিত।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৬টি ও ১৩টি মিলিয়ে ১৯টি উন্নয়নশীল ব্লকে ৩৫ লক্ষাধিক মানুষের বাস। অধিকাংশই তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি তথা নিম্নবর্ণীয় এবং মুসলিম-ব্রাহ্মণ-খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়-শ্রেণি-বৃত্তিভোগী মানুষ আছেন। মোট জনসংখ্যার মধ্যে তফসিলি ১৫ লক্ষাধিক। 'বদর' অর্থাৎ সমুদ্র, আর সমুদ্র সন্নিহিত বনই বদরবন বা বাদাবন। আর লোকালয় মিলিয়ে মোট আয়তন ৪৪৬৫৩৭ হেক্টর। এর মধ্যে ৫৩৬৬ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বর্তমান লোকালয়, কৃষিক্ষেত্র ও মাছের ভেড়ি। নদ-নদী বা নদীর চরা ১৯৬৭ বর্গ কিলোমিটার। ৫৪টি দ্বীপ ঘিরে সুন্দরবনের বসতি অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধ ও সেচের উদ্দেশ্যে জমিদারেরা নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ৩৫০০ বর্গ কিলোমিটার নদীবাঁধ নির্মাণ করেন। বাঁধের মাটি নদীর ভিতরকার চর কেটে নেওয়ায় দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু। বাঁধের কোল ঘেঁষে মাটি কেটে বাঁধ দিলেও গর্ত বা আল্‌গুলির অধিকাংশই পরপর জোয়ারের সঙ্গে আসা পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যায়।

সুন্দরবনের জমির স্তর নদীর জোয়ারের স্তর অপেক্ষা নিচু হওয়ায় বাঁধগুলি দ্বীপমধ্যস্থিত জমি অপেক্ষা ৫-১০ ফুট উপরে থাকে। যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো কারণে নদীবাঁধ ভেঙে গেলে পার্শ্ববর্তী নিচু এলাকায় অকাল বন্যা ঘটতেই পারে এবং সেই নোনাজল বের করানো প্রায় অসাধ্য। অবশ্য সন্দরবনের সব নদীর জল স্বাদু করতে গেলে নোনা জলের প্রবেশ মুখে উপর্যুপরি ব্যারেজ নির্মাণের মতো ব্যয়সাধ্য প্রয়াসের তাগিদ একদা অনুভূত হলেও এখন আর উচ্চারিত হয় না। এও হয়ত বা 'প্রশাসনিক বিপন্নতা বোধ'।

৬

জীব বৈচিত্রের আকর সুন্দরবনের জঙ্গল ও খাঁড়িতে ১৫৮৬ প্রজাতির প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। ২০০ থেকে ২৫০ প্রজাতির পাখি, ৭০ প্রজাতির কাঁকড়া-শামুক-ঝিনুক, ১৩০ প্রজাতির মাছ, ৬৪ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ও অন্যান্য বৃক্ষ লতাদি সহ জলচর, স্থলচর, উভচর জীবজন্তু-প্রাণীর আদর্শ বাসস্থান, বিচরণভূমি।

দক্ষিণবঙ্গের নিম্নভূমি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ হলেও শিরা-উপশিরার মতো যে অসংখ্য ছোট বড়, চওড়া ও সরু নদ-নদী আছে, তার প্রত্যেকটিই সমান্তরালভাবে দক্ষিণ অভিমুখী বা সমুদ্রাভিমুখী। এক নদী থেকে অন্য নদীতে সহজে যাওয়া যায়। এই সকল নদীতে গঙ্গার কোন প্রবাহ নেই। সবই সমুদ্র-জোয়ার জলে পুষ্ট। বর্ষার সময়ে দুই বিপরীতমুখী স্রোত প্রবাহিত হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে । গ্রীষ্মে ও বর্ষায় বাতাসে টান থাকায় জল ফুলে ও ফেঁপে ওঠে। প্রচন্ড ঢেউ হয়। নদীবাঁধ ধসে যায়। আবার অমাবস্যা-পূর্ণিমার এ-দিক ও-দিক ন্যূনতম ১০ দিন জলের প্রবাহমাত্রা বেশি থাকে। এসময় ঝড়-বন্যা-সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস ও নিম্নচাপ ইত্যাদি থাকলে নদীগুলি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জনপদ নোনা জল প্লাবিত হয়। জীববৈচিত্রে নেমে আসে বিস্ময়কর বিপর্যয়। নোনা প্লাবিত অঞ্চল স্বাভাবিক হতে ৩-৬ বছর লাগেই।

যুগ যুগ ধরেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখানদী বাহিত পলি গঠিত ব-দ্বীপে গাছপালা ও জীব জন্তুর বসতি ব্যাপক হারে ঘটার বহু পরে এসেছে মানুষ। অবশ্য, পলিপ্রবাহের পরিমাণ বর্ষায় বাড়ে। শীতে কমে। মাটির আকৃতি অনুযায়ী সুন্দরবনকে উত্তর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে তিনভাগে ভাগ করলে স্পষ্ট হয়—

১. উত্তরে পলি সমৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চল

২. মাঝখানে অঙ্গাবিভূত মৃত্তিকা অঞ্চল

৩. সমুদ্র পর্যন্ত বালিযুক্ত মাটির জলাভূমি ও বালিয়াড়ি

আবার, লবণের পরিমাণ হিসাবে—

ক. লবণযুক্ত মাটি

খ. লবন ও ক্ষারযুক্ত মাটি

গ. কম ক্ষারযুক্ত মাটি হিসাবেও সুন্দরবনকে ভাগ করা যায়।

মাটির মৌল জৈব ও অজৈব উপাদান জল ও মাটির তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের উৎস ও বিকাশ নির্ভরশীল।

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ বা আমাজনের তুলনায় গঙ্গার দৈর্ঘ্য সামান্য হলেও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পৃথিবীতে সবথেকে বড়। প্রায় তিন মিলিয়ন টন পলিমাটি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গঙ্গাপ্লাবিত হয়ে জমে জমে 'সুন্দরবন' সৃষ্টি করেছে। এখানে গঠনতন্ত্র স্থায়ী হয়নি কারণ—

প্রথমতঃ যে হিমালয় থেকে গঙ্গার সৃষ্টি সেই হিমালয়েরই কিছু অংশ পাললিক শিলায় গঠিত, যা সহজে ক্ষয় হয় আবার তার জন্ম সমুদ্রতলের শিলাস্তর থেকে। ফলে, প্রায়শ শিলাবিচ্যুতি ঘটায়। গঠন বিন্যাস স্থায়িত্ব পায় না।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের মধ্যে গঙ্গার অববাহিকা ৮,৬১,৪০৪ বর্গকিলোমিটার হলেও বর্হিভারত বিশেষ করে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান, নেপাল, চিন মিলিয়ে দেড় মিলিয়ন কিলোমিটারের মতো। সমূহ এলাকার জল মিশছে ও নরম মাটি সহজেই ভেঙে যাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ যমুনা, শোন, গোমতী, ঘর্ঘরা, গন্ডক, কুশী, অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী বা নদীবাহিত মাটি গঠনে সহায়তা করে, আবার ক্ষয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থতঃ শত শতাব্দী ধরে গঙ্গা-অববাহিকা ও তার নদীতীর ধরে জনপদ, কৃষিভূমির বিস্তার ঘটানোর পাশাপাশি অরণ্যচ্ছেদন অথবা অরণ্যাচ্ছাদন না থাকায় মাটির বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, জলবায়ুর পরিবর্তিত প্রভাবও পড়ছে। অন্যান্য নদীর তুলনায় গঙ্গার অববাহিকায় সেচসেবিত জমির পরিমাণ বেশি থাকায় (দেড়কোটি হেক্টর) জমি থেকে সেচের জলের সঙ্গে ধুয়ে বিপুল পরিমাণ মাটি গঙ্গায় এসে মিশেছে, ব-দ্বীপের আয়তনের বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে ও নতুন নতুন দ্বীপের সৃষ্টি করছে।

চ

সুন্দরবনের জোয়ার-ভাঁটা খেলা, নোনা দ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ জীববৈচিত্র, মাটি,জলবায়ু—সবমিলে বাস্তুতন্ত্রে। আবার উদ্ভিদগণ শুধু একলা বাঁচে না, মূলজ-জলজ-উভচর-খেচর প্রাণীদেরও বাঁচতে সহায়তা করে। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা লবণ জলে দিনে দু'বার ডুবে যাওয়ার এবং তৎসহ পলি জমার ফলে মাছ বা বিভিন্ন জলজ ও অন্যান্য স্থলজ প্রাণী আশ্রয় ও বিচরণের সুযোগ পায়।

বায়বীয় মূল বা শিকড় বনভূমিকে শক্তপোক্তভাবে ধরে রাখে, গাছের পরিণত পাতা জমে জমে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে, যা ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র প্রজাতির খাদ্য হিসাবে এবং জল-মাটিকে উর্বর করে বা জৈব পর্দার্থের যোগান দেয়। ম্যানগ্রোভবৃক্ষ প্রকৃতির বিপর্যয় প্রতিহত, মাটির ক্ষয়রোধ বা নদীবক্ষে পলিজমা কিছুটা রোধ করে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে। অর্থাৎ জৈব-অজৈব সমবায়ে যে পরিবেশ, জীব ও জড় সমন্বয়ে যে প্রকৃতি, সেই জীব ও মানুষ একে অপরের পরিপূরক বা আজীবন-আমৃত্যু পারস্পারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ।

সম্পূর্ণ বশীভূত করতে না পারলেও মানুষ যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সামাজিক-অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে প্রসারিত হয়েছে, হচ্ছে শহর ও শহরকেন্দ্রিক আনুসঙ্গিকতা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তালে তাল মিলিয়ে ভরাট করা হচ্ছে খাল-বিল-নদী-জলাশয়, কাটা হচ্ছে বনভূমি। বিস্তৃত হচ্ছে কৃষিভূমি। আবার, শহর ও শিল্পের গ্রাসে সংকুচিত হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র, প্রয়োজনিক নির্মমতায় কৃষি-পদ্ধতিতে শিল্পসহায়ক রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের উন্নতি ঘটানো, যানবাহনের সুলভ ব্যবহার, বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি করা হচ্ছে। পরিবর্তন যাই ঘটুক, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন যেটুকু মিটুক, এর ফলে প্রকৃতির মৌলিকত্ব বজায় থাকছে না। যেকোনো সুস্থ মানুষই জানেন, জৈব ও অজৈব বস্তু বা পদার্থের মধ্যে এমন অন্তঃসম্বন্ধ বর্তমান যে একটা নষ্ট হলে অন্যটির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ খাদ্যশৃঙ্খলের কথা বলা যেতে পারে। সূর্য উৎপাদক(উদ্ভিদ) → প্রাথমিক খাদক (শাকাহারী প্রাণী)→গৌণ খাদক (মাংসাসী প্রাণী) → প্রগৌণ খাদক (মাংসাশী ও সর্বভূক প্রাণী)→ দেহের গলিত মৃত অংশ → বিয়োজক ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক প্রভৃতি → অজৈব পদার্থ। এর যে কোনো একটা নষ্ট হয়ে গেলে অন্য বস্তুগুলির স্থিতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। 'সুন্দরবন'-এর ব্যতিক্রম নয়।

ছ

ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী ১৮১০ সালে সচেতনভাবে সুন্দরবনের বন পরিস্কার করার কাজ শুরু হয়। ব্যাপক চাষাবাদের পাশাপাশি লবণ উৎপাদনও চলে। ১৮৭৯ সালে ১৮৭৫ বর্গ মাইল 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' ঘোষণা করা হলেও ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ সরকার জমি নিজেদের মাধ্যমে বিলিবন্টন করে সুন্দরবনের বন ধ্বংসে তৎপর হলেও যেটুকু অবশিষ্ট থেকেছে সেটুকুতে আজও সরকারি বা বেসরকারিভাবে প্রত্যক্ষভাবে বিনষ্টী লীলা অব্যাহত। ভূতত্ববিদদের মতে গত একশত বছরে সমুদ্র আগ্রাসনে ৪২০ বর্গ কি.মি. তলিয়ে গেছে। সাগরদ্বীপসহ সুন্দরবনের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উদ্যোগে যে প্রথমে বাঁধ বেঁধে জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে ওঠে সেখানেই ভাঙন বেশী। ভাঙনের মূল কারণ নদীর নব্যতা হ্রাস, উষ্ণায়ন, ভূমিক্ষয়, মোহনায় পলি জমা ও ম্যানগ্রোভ ধ্বংস। বনধ্বংসের অনিবার্য পরিণতি জেনে-শুনে-বুঝে ও জীবিকার তাগিদে, স্বার্থচিত লোলুপক্ষুধার বশবর্তী হয়ে অথবা একান্ত দৈন্যতায় হনন প্রবৃত্তি আরোও ঊর্ধ্বায়িত। গত প্রায় তিনশত বছর ধরে 'সুন্দরবন' উপহার দিয়েছে 'কলকাতা', 'উত্তর চব্বিশ পরগনা', 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'কে। এখনো উপহার দিচ্ছে গ্রামকে গ্রাম। কিন্তু সুন্দরবন কি পাচ্ছে? তার বুকে কলকাতার ড্রেনের বিপুল পরিমান ময়লার সঙ্গে বিওডি বা বিথিলেটেড মারকারি সুন্দরবনের নদীতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যেন সুন্দরবন ও তার নদ-নদী নগর কলাকাতার ডাস্টবিন। এরই পাশাপাশি সুন্দরবনের নদীর জলে জলযানের তেল ইত্যাদি মিশছে, এমনকী সমুদ্রযানের তেলও ধেয়ে আসছে। গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির বর্জ্যপদার্থে অহরহ পড়ছে নদী-খাঁড়িতে। বনভূমি ধ্বংস করে তৈরি হচ্ছে জনপদ ভূমি, কৃষি ভূমি, প্রমোদ-প্রাসাদ, মাছের ভেড়ি, বেসরকারি মল্ ইত্যাদি। খুলনার রামপালে তৈরী হয়েছে দূষণকারী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

শুধু চিংড়ির বীজ ও মিন সংগ্রহের সময় নোনা জলের অন্যান্য মাছের বীজ ও পোনা যেভাবে ধ্বংস করা হয় তা অপরাধপ্রবণ, নিষ্ঠুর অবিমৃষ্যকারীতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যথেচ্ছ মাছ ধরতে ধরতে নদীর পাড় ভাঙা জনিত প্লাবনের আশঙ্কা সহ ভূমিক্ষয়ের পাশাপাশি মানুষের অসচেতনতার কারণে কী পরিমাণ বাগদা চিংড়ির মিনের জন্য একটি জালে যদি ১০০ টি অন্য মাছের বীজ ধ্বংস করা হয়, তাহলে একহাজার চিংড়ির বাচ্চার জন্য কত হাজার অন্য মাছের উৎসকে খতম করা হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া চোরাগোপ্তা শিকার তো আছেই, আছে 'হাই সাউন্ডিং'। 'হাই সাউন্ডিং'-এর ব্যবহারে কে না জানে—অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে। ফলশ্রুতিতে সুন্দরবনের পরিবেশগত সমস্যা নগ্ন হয়ে উঠেছে।

সুন্দরবনের পরিবেশের বিপর্যয়গত সমস্যা দু'রকম ঃ

ক. প্রাকৃতিক—ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, ভূমিস্খলন। আবহাওয়াগত সমস্যায় সাইক্লোন, সুনামি, আয়লা, খরা, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

খ. মনুষ্যকৃত— মানুষ যেগুলো নিয়ত প্রত্যক্ষ ভাবে করছে। একই সঙ্গে রাসায়নিক নিক্ষেপণ, বিস্ফোরণ ও জৈবঘাটতি।;

সুন্দরবনে পরিবেশ ধ্বংসে মূল উৎসগুলি সংক্ষেপেঃ

১. নির্বিচার অরণ্য ধ্বংস (১৬২ ব্যাসমিটার একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ ঘণ্টায় ২২৫২ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং ফেরত দেয় ১৭২১ কিলোগ্রাম অক্সিজেন)। ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নদীর চর কেটে বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিমুখ বন্ধ করা, জলকর বা ভেড়ি বৃদ্ধি, ঝড়-বন্যা-জলস্ফীতি ও নদীর অতলস্পর্শী ঘূর্ণাবর্ত এবং ভূমিক্ষয় ইত্যাদি।

২. নগরায়নের অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক প্রয়াস, অপরিকল্পিতভাবে স্থান অনুশোষণ এবং যত্রতত্র গাজোয়ারী শিল্পোদ্যোগ, কলকারখানা, খনিজ উত্তোলন, কৃষি জমি গ্রাস, জঙ্গলে মানুষের উৎপাত ইত্যাদি।

৩. জৈব আবর্জনা, কীটপতঙ্গ বা জীবের দেহাবশেষ।

৪. হাটবাজার ও গৃহস্থালির ব্যবহৃত বর্জ্য, কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত পদার্থ ও শিল্প বর্জ্য।

৫. কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্গত জল, কীটনাশকবাহিত বর্জ্য, শোধনাগার ও হাসপাতালের বর্জ্য, মলমূত্র ইত্যাদি।

প্রতিকারক সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হল—

ক. মানুষের হনন প্রবৃত্তিকে সংযত করা।

খ. প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক নিয়মাদি বজায় রাখা বা প্রকৃতির উপর অকারণ হস্তক্ষেপ না করা।

গ.বাণিজ্যিক ভিত্তির চিরস্থায়ী উৎপাদন বজায় রাখতে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপকে উপেক্ষা না করা।

ঘ. প্রকৃতিকে আর দূষিত হতে না দেওয়া।

ঙ. চোরোগোপ্তা উৎস সন্ধান ও বিনষ্ট-সহ জঙ্গলের বাসিন্দাদের উত্যক্ত না করা, ক্ষতি না করা।

চ. আশু প্রয়োজনে একটির জন্য অন্যটির ক্ষতিসাধন না করা, যেমন, সাহারার জন্য সুন্দরবনকে সাহারায় পরিণত না করা বা একটি চিংড়ি মিনের জন্য অসংখ্য অন্য মিনকে ধ্বংস না করা বা সুন্দরবনে কেমিক্যাল হাব করার হনন প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করা ইত্যাদি।

ছ. স্থানীয়ভাবে যতটুকু বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্প বা প্রযুক্তির প্রয়োজন তার একটুকুর বেশি বিন্দুমাত্র না বাড়ানো।

জ.জরুরিভিত্তিক কর্মপন্থা নির্ধারণ, রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখানো, নির্ভরতা ও বিশ্বাস উৎপাদন।

ঝ. প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন ও সচেতনতার প্রসার ঘটানো ইত্যাদি।

জ

সুন্দরবনের নদী বাঁধের ভাঙন জনিত সমস্যা সর্বজনবিদিত।প্রকৃতি সম্ভূত সুন্দরবন সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয় ক্ষমতারই অধিকারী । সাবেক জমিদাররা ৫৪টি দ্বীপ ঘিরে ৩৫০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তার দায়িত্ব বর্তায় ভারত সরকারের উপর। কিন্তু নদীবাঁধজনিত সমস্যাগুলি কিছুটা নির্ণিত হলেও সমাধান প্রকল্পে দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতার বড়ই অভাব। নদীর নাব্যতা হ্রাসজনিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষেত্রেও বোধহীনতা প্রশ্নাতীত। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত ৫৮০ বর্গ কিলোমিটার অতিক্রমকারী মোটরগাড়ির দূষণও শুষে নেয় একটি পরিণত গাছ। অক্সিজেনের মূল উৎস যে সবুজ উদ্ভিদ যার অপর নাম 'নীলকণ্ঠ' আজ সুন্দরবন থেকে তাকেই উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই নির্মম আত্মহননের ফলে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতিবছর ০.১৯° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও কমে যাচ্ছে ওজোন স্তর। আবার পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলে ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের বৃদ্ধি যেমন পাচ্ছে, তেমনি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়ছে বছরে ৩.১৪ মিটার। এরই ফলশ্রুতিতে বাড়ছে ভূমিক্ষয় ও ভাঙন। উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলপৃষ্ঠ ১০সে.মি. বাড়লে সুন্দরবনে ১৫%, ২৫ সে.মি. বাড়লে ৪০%, ৪৫ সে.মি. বাড়লে ৭৫% এবং ১মিটার বাড়লে গোটা সুন্দরবনটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া অঞ্চলগতভাবে নির্মাণ কাজ, অপরিকল্পিত কর্মপ্রয়াস, মৎস শিকার ইত্যাদিতো রয়েইছে। রয়েছে বঙ্গোপসাগরের আগ্রাসন। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, নিম্নচাপ বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, আয়লা, সুনামি, বিধ্বংসী ঝড়জনিত প্রতিক্রিয়া, প্রকৃতির অবনমন, নদীর গতিমুখ পরিবর্তন, নাব্যতার অভাব, আর মনুষ্য সৃষ্ট নদীভরাট-জলকর-জনপদভূমির বিস্তার ইত্যাদি। গত দুই দশকে সুন্দরবনের রেডফোর্ড, সুপারীডাঙ্গা, কাবাসগাদি, লোহাচাড়ী উপগ্রহ ছবি থেকে মুছে গেছে। ইতিমধ্যে ডালহৌসি ও ভাগ্যদোয়ানীর ২০%, মৌসানির ৪০% এবং ঘোড়ামারার ৬০% নদীগর্ভে।

সমস্যা প্রতিকারকল্পে সংক্ষিপ্ত সুত্রাকারে বলা যায়—

১. সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয়কারী টাস্ক ফোর্স গঠন, নিবিড় গবেষণা ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

২. সুন্দরবনবাসীর সার্বিক ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

৩. জোয়ার ও ভাঁটা ধরে সমুদ্র পর্যন্ত প্রতিটি নদী ও নদীবাঁধের প্রতি নজরদারী ও তথ্য সংগ্রহ মোতাবেক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. জুট ও ওয়াটার বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৫. বাগদা বীজ শিকার সংগ্রহে ঘন মশারি বা চট জাল দিয়ে নদীর এপার ওপার বেঁধে জলপ্রবাহের গতি রুদ্ধ না করা।

৬. বাগদার বীজ সংগ্রহের সময় নদী বাঁধ ও চরাভূমি না ধসানো ও মাটি না কাটা।

৭. আপন আপন ও সেবায়েত স্বার্থে বর্ষাকালে, কেবলমাত্র বর্ষাকালে নদীবাঁধ, জেটি নির্মাণ,শ্লুয়েজ বসানো বা খাল খনন থেকে বিরত হওয়া। এই প্রক্রিয়াদি একমাত্র শীতমরশুমেই করা শ্রেয়।

৮. নদীর গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, দ্বীপের ভৌগলিক আকৃতির পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি।

ঋ

সুন্দরবনের ভাঙাগড়ার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জনপদ। আর এই জনপদ বিপন্ন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ঝড়-বন্যা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবর্তন সুন্দরবনে বাৎসরিক পালা-পার্বনের ব্যাপার। অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত,প্লাবন, ভূমিকম্প, খরা বন্যায় বিধ্বস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবথেকে বেশি। হতদরিদ্রের ক্ষতির পরিমাণ আনুগতিক হারে যেমন সর্বাধিক তেমনি সমুদ্রে বা নদীতে অবস্থানকারীদের আঘাত হয় আরও গুরুতর। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির সৃষ্টি কিন্তু এরজন্য অনেকাংশেই দায়ী মানুষ স্বয়ং। দায়ী ভোগবাদী উৎপাদন কাঠামোর সম্প্রসারণ, নির্বিকার চিত্তে দূষণ প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটানো ও প্রকৃতির উপর খবরদারী।

(সংক্ষেপিত) [কৃতজ্ঞতা :'অতএব']

National Convention on 'Save River Save Life' – A Report

Tapas Das & Tapan K. Mishra

The National Convention on Save River Save Life — a peoples' initiative, was held at Gandhi Peace Foundation, Mourigram, Howrah, West Bengal. The Convention was presided over by eminent social worker Sri Samar Bagchi. Sri Bagchi was the former director of Birla Technical Museum and a frontline activist of NAPM (WB).

Stalwarts from the fields of environment and river activism, geologist, river scientist, bio-diversity expert, social workers, teachers and above all people linked to rivers from the states of West Bengal, Bihar and Jharkhand all attended the convention.

The main issue of the convention was to discuss the necessity of formation of a "River Consensus" *(Nodi Istehar)* in the present socio-economic-political-environmental scenario of our country. Seven broad issues (as mentioned later) were raised for discussion and were mostly agreed upon. Some new issues were proposed to be included in this consensus; (a) Involvement and inclusion of the SAARC countries towards addressing the issues of trans boundary rivers and (b) re-drawing the river maps of India, re-arrangement of the flood plains along with a proper landscape management and ensuring re-settlement of the people living in those flood plains. Most of the speakers highlighted the necessity of unhindered flow of the rivers, small and big, as the prime measure to ensure existence of humankind and all other life forms. It was agreed that the urban practice of polluting the rivers must be expressly stopped to enable the whole ecological web to function and thrive. Mostly spoken topic was de-commissioning the faulty river plans of the government and de-commissioning the large dams in phases and in a manner which will acknowledge and put into effect the traditional wisdom and modern scientific knowledge. It was decided upon to pressurise the government to accept the natural resources as the mountains, rivers, water bodies, forests, as the right of all the living forms and not to be used for ulterior motives of certain profiteering companies, then only the calamities can be managed and dignity of all living-non living forms can be upheld. It was agreed that there is no place of endless greed as far as our own existence is concerned. It was further agreed upon the necessity of a clear 'river-policy' of the government and towards developing the habit of a public vigilance and express political good-will so that the policy is being followed to the point.

The scopes of further discussion were stressed upon in a wider national, international level in formulation of this consensus with inputs of all the stakeholders.

The issues put-up for discussion were :

(l) We are all aware that the flow of life in India, its nature and environment are all the gifts of the Himalayas. We can never save the rivers and environment of our country by causing damage to the Himalayas. The rivers have their origin in the ice-caps of the Himalayas and the forests all along it, but the faulty development plans of the Himalayas is leading to its speedy depletion and destroy all of the uncountable springs, rivulets, streams and falls. We demand a long term, sustainable development policy (Himalayan Policy) looking towards the preservation of the natural diversity and environment of the Himalayas.

(2) Unhindered flow of the rivers is the expressed policy of the government, but quite contradicting to this are the countrywide projects on river dams, embankments, barrages etc. which are all leading to the choking of the flow of the rivers- leading to their deaths. We demand honest implementable policies for banning and dismantling all projects that hinders the natural flow of the rivers ('aviram nodi') and ensures the right of a river to flow un-hindered. We further demand a re-evaluation of the erstwhile projects and that the committee for this should include representations from all the stake-holder groups. The projects, which have failed to deliver, should be de-commissioned and dismantled on an emergency basis.

(3) More than just a flowing water body, rivers give birth to, nourish and thrive a wide range of ecology and organism chain in this living world. The human civilisation is greatly indebted to rivers for the origin and development of their cultural and economic identity. We can only repay this debt by ensuring that none of our wastes of civilisation is discharged into the rivers (zero-discharge).

(4) We have to develop all the villages in our country into such that they are all independent in their water use.

(5) *For* thousands of years, the fishermen folk lived in happy co-existence with the dolphins in the parts of The Ganga, in the Bhagalpur district of Bihar. The policy of the government in declaring it into a dolphin sanctuary (Vikramshila Dolphin Sanctuary) and banning fishing has dealt a severe blow to the livelihood of thousands of those fishermen family. We demand reinstatement of the rights of the fishermen to their profession.

(6) We demand reinstatement of the natural flow of all the rivers of the state. There are 54 inter-boundary rivers flowing within India and Bangladesh. Joint commission of these rivers is to be developed towards ensuring the interest of the innumerable people living along the course of these rivers.

(7) The Sundarbans, abode of an intricate network of streams, canals and rivers, home to the worlds unique forest of mangroves and the great Royal Bengal Tiger is to be preserved not only as a tourist reserve but also for the greatly diverse population of nearly 10 lakhs in the 19 blocks, solely dependent on the produce of the forest and the network of water bodies and canals, their diverse cultural and unique professional resource. The flow of life is to be preserved in its totality.

Further Amendments :

- The reasons as to why the occurrences of flood has lessened in the areas of Bhagabanpur, Pataspur, Moina are to be analysed and the knowledge to be put into effect
- To ensure the flow of the big rivers, the importance of the small rivers, streams etc. are to be properly acknowledged and deforestation and soil erosion must be checked all along the course and active policy must be taken towards this direction
- To completely ban dangerous and devastating program of 'river connectivity'
- To set up clear policy for a balanced use of sub-soil water and make ways for necessary recharge of the underground water level
- To work towards developing a society that is capable enough to manage the effects of flood and other calamities rather than succumbing to the faulty ideas of such disasters
- To acknowledge and promote the 'guardianship of all forms of water bodies and the forests of the people living on and with these natural identities as a fundamental right

SOME SUGGESTIONS :

In the river catchment areas plantation of exotic species exposes soil to different types of erosions. Deep in the forests, India has experienced massive plantations of exotics like *Eucalyptus sp (pottas),Cryptomeria japonica* (dhupi), *Prosopis Juliflora* (jangaljalebi) and planting teak in sal dominated forest areas has made the forest ecologically fragile. A nationwide campaign against various mismanagement of our forests is to be planned.

Erosion of natural ecosystems by human being in the name of development has caused serious damage to the rivers. Many streams are meeting their death in the mining areas due to lack of proper management measures. Historical satellite data can prove these misdeeds. During the process of making mining plan, commitment to save these prime water bodies from such anthropogenic activities are emphatically made.Even Public Sector undertakings in Central India are responsible for such damages to our natural ecosystems causing severe damage to livelihood of indigenous people. Action to be taken- A National programme to keep vigil on small streams draining water to rivers is to be taken especially in the mining areas.

In various parts of the country indigenous people are being denied of their rights on natural resources in the name of making islands of conservation like 'Reserve Forests', 'Aquatic Reserves'. Though there are some acts and rules in our country to protect livelihood of people depending on various natural ecosystems, instances of breaking these rules are plenty. Action to be taken- Act and rules like FRA, JFM etc. are to be strictly abided by.

Micro-water shade management supposed to be a better ecological alternative to

'River Linking' unless it is urgently felt.

Action to be taken- Debates on such an issue is to be initiated in all possible levels.

রামসার কেন্দ্র ঘোষণার পথে সুন্দরবন

৪,২৬৪ বর্গ কি.মি. বিস্তৃত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট, যার মধ্যে ২,০০০ বর্গ কি.মি. বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, ১২৫ বর্গ কিমি. জলাভূমি, যার মধ্যে ২,১১৪ বর্গ কিমি. ভারতে, বাকীটা বাংলাদেশে অবস্থিত, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ভারতের মোট ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ৪৩% সুন্দরবনে অবস্থিত। ভারতে মোট ২৬টি রামসার ঐতিহ্য কেন্দ্র আছে যার মধ্যে দুটি পূর্ব ভারতে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ও গুয়াহাটির দীপোর বিল।

- কৃষি ঋণ মকুব, বর্দ্ধিত সহায়ক মূল্য ও আয়ের নিশ্চয়তার দাবিতে ১৭২ টি কৃষক সংগঠন ২২টি রাজ্যে ১ থেকে ১০ জুন 'গাঁও বন্ধ' করল। ৬২ টি কৃষক গোষ্ঠীকে নিয়ে তৈরি 'কিসান একতা মঞ্চ' সমর্থন করল। রাষ্ট্রীয় কিসান মজদুর সঙ্ঘ গতবছর ৬জুন মধ্যপ্রদেশের মান্দসৌরে পুলিশের গুলি চালনায় হত কৃষকদের স্মরণে ১০ জুন ভারত বন্ধ করলেন। কৃষকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে মেধা পাটেকর, যোগেন্দ্র যাদব প্রমুখের নেতৃত্বে 'অল ইন্ডিয়া কিষান সঙ্ঘর্ষ কো-অরডিনেশন কমিটি (এ.আই.কে. এস.সি.সি) লোকসভা চলাকালীন সংসদের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দ্ধারিত পানীয় জলে ইউরেনিয়ামের সহনশীলতা মাত্রা সর্বোচ্চ ৩০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটার জলে। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও চাষ ও অন্যান্য কাজে বেশি বেশি করে ভূর্গভস্থ জল তুলে নেওয়া এবং নাইট্রেট দূষনের কারণে ইউরেনিয়ামের বেশি করে পানীয় জলে মিশে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের ২৬ টি জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের রাজস্থান সহ নয়টি জেলা এবং ঝাড়খন্ডের যদুগোড়া অঞ্চল মারাত্মক সংমিশ্রনজনিত তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার।
- চার দশক হয়েছে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে ফরাসি জাওয়ার যুদ্ধবিমান যুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে প্রশিক্ষণ অবস্থাতেই ক্ষতির হার প্রচুর। ২০১২-১৬-তে ২৮ বার দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে পড়েছে বা ক্ষতি হয়েছে জাগুয়ারের। এ বছরে এখনবধি দুবার দুর্ঘটনা এবং একবার পাইলটসহ ধ্বংস।
- সুইডেনের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা জানিয়েছে যে ২০১৮-র শুরুতে বিশ্বের নয়টি পরমাণু শক্তিধর দেশের কাছে মোট ১৪,৯৩৫টি পরমানু বোমা রয়েছে। এর মধ্যে চীনের ২৮০টি, পাকিস্থানের ১৪০-১৫০ টি এবং ভারতের ১৩০-১৪০। উত্তর কোরিয়ার হাতে ২০১৭-র শুরুতে ছিল ২০টির মত পরমাণু বোমা।
- জাপানের মহাকাশযান হায়াবুসা-২ তিন বছর ধরে তিন কোটি কি.মি পাড়ি দিয়ে এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি কে পর্যবেক্ষণ বার্তা পাঠাতে শুরু করেছে।
- চলতি বছরের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে মহারাষ্ট্র সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেনার দায়ে ৬৩৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।
- 'ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি (ই.এস.এ)-র 'মার্স এক্সপ্রেস অরবিটার (মার্সিস)' শুধু জল নয় আস্ত একটি হ্রদের সন্ধান দিল মঙ্গলগ্রহে।
- ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ সোনাম ওয়াংচুক এবং মনরোগ বিশেষজ্ঞ ভারত ভাটওয়ালী সমাজসেবার জন্য ২০১৮-র ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেলেন। ২০১৮-তে গণিতে 'ফিল্ড মেডেল' বিজয়ী হলেন ভারতের অক্ষয় ভেঙ্কটেশ।
- ২৮ এপ্রিল' ১৮, জ্যোতি বসুর ২৩ বছর ১৩৭ দিনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিং।

বর্বরতার আঁধারে শিহরিত আলোকশিখা : হাইপাসিয়া এবং ...

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

সময় বড় বিচিত্র তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। অথচ তার সাথে দ্রুত পরিবর্তিত হয় সমগ্র সৃষ্টি। পৃথিবী তার কক্ষপথে ছুটে চলে দুরন্ত গতিতে। মুহূর্ত মুহূর্ত জুড়ে ফুটে ওঠে ইতিহাস, মানব ইতিহাস, ভালোবাসা, ক্রোধ, হিংসা, যুদ্ধ, বিপ্লব, আবিষ্কার, ভাঙা-গড়ার সোপানগুলি পেরিয়ে রচিত হয় এক একটি অধ্যায়। গিরিকন্দর থেকে মহাকাশের অনন্তে, সভ্যতা সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই চলার পথে সেও থমকে দাঁড়ায় যখন ইতিহাসের বিস্তৃতপ্রায় কোনো অধ্যায় সামনে এসে প্রশ্ন করে, 'সভ্যতা তুমি সত্যিই অনেক পথ হেঁটেছ? নাকি প্রস্তরবৎ স্থবির?"

ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশির তীরে সুসজ্জিত আলেকজান্দ্রিয়া, মহান গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, ঐতিহাসিক, শিল্পী-দের জ্ঞানতীর্থ; **ইউক্লিড, টলেমি, এরাতোস্থেনিস, আর্কিমিদিস, হেরন**-এর আলেকজান্দ্রিয়া। মিশরের বুকে গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের প্রতীক আলেকজান্দ্রিয়া।

415 খ্রীষ্টাব্দ, ধর্মীয় বিবাদের রণক্ষেত্র, ক্রমক্ষয়িষ্ণু আলেকজান্দ্রিয়া। মার্চ মাস একদল উন্মত্ত লোকের হিংস্র উল্লাসে শিহরিত আলেকজান্দ্রিয়ার বাতাস। রাস্তা দিয়ে তারা টানতে টানতে নিয়ে চলেছে এক মহিলাকে। কী বীভৎস তাদের চিৎকার, কী ক্রূর তাদের অট্টহাস্য; তারা প্যারাবলনি (Parabalani) অর্থাৎ সেইসব স্বেচ্ছাসেবক যাদের মূল কাজ অসুস্থদের সেবা ও মৃতের সৎকার, যাঁকে তারা টেনে নিয়ে চলেছে, তিনি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ প্রথম মহিলা গণিতবিদ— **হাইপাসিয়া**; যাঁর নির্মম পরিণতিতে আজও কেঁপে ওঠে মানবিকতা।

স্বনামধন্য গ্রীক গণিতবিদ **থিওন**, তাঁর সন্তান হাইপাসিয়াকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নিখুঁত মানুষ হিসেবে। তাই তো হাইপাসিয়ার বড় হওয়া ছিল আর পাঁচটা মেয়েদের থেকে আলাদা। পিতা থিওনের কাছে তিনি শিখেছিলেন গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান। পারদর্শী ছিলেন অলঙ্কার শাস্ত্রে, পড়েছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্যও। সাথে সাথে অশ্বারোহন, সাঁতার, নৌচালনা-এসব তো ছিলই। এমনকী থিওন তাঁর কন্যাকে এথেন্স ও ইটালীতেও পাঠান। এথেন্সেও হাইপাসিয়া শিক্ষালাভ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এসে খুব শীঘ্রই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন গণিতবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং অবশ্যই শিক্ষিকা হিসেবে।

"There was a woman at Alexandria named Hypatia, daughter of the philosopher Theon, who made such attainments in literature of her own time."– Socrates Scholasticus

সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী হাইপাসিয়ার জ্ঞান ও বাগ্মিতার আকর্ষণে দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা ছুটে আসত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। ধর্মসহিষ্ণু হাইপাসিয়াও শিক্ষাদান করতেন ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে। নিজে অখ্রিষ্টান হলেও তাঁর বহু শিষ্য ছিলেন খৃষ্টান এবং অনেকেই রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যাঁদের মধ্যে অন্যতম **সাইনেসিয়াস**, টলেমেইস (Ptolemais)-এর বিশপ। হাইপাসিয়াকে লেখা তাঁর সাতটা চিঠি যা এখনও সময়ের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি সেগুলিকেই হাইপাসিয়া সম্পর্কিত প্রধান সূত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই চিঠিগুলি থেকে জানা যায় অ্যাস্ট্রোল্যাব (Astrolabe) তৈরিতে হাইপাসিয়ার দক্ষতার কথা। অপর একটি চিঠিতে সাইনেসিয়াস তাঁকে অনুরোধ করেন হাইড্রোমিটার (Hydrometer) তৈরি করতে। আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যতম গণিতজ্ঞ **ডিওফানটাস**-এর রচিত 'অ্যারিথমেটিকা'-র উপর টীকা লেখেন হাইপাসিয়া। এছাড়া **অ্যাপোলোনিয়াসের** 'Conic Section'-এর উপর আট খণ্ডের রচনাও লেখেন, যা দুর্ভাগ্যবশত এখন আর নেই। তিনি গ্রহনক্ষত্রের গতি সম্পর্কিত একটি সারণীও গঠন করেছিলেন। এও বলা হয়ে থাকে যে বর্তমানে টলেমির 'অ্যালমাগেস্ট'-এর যে সংস্করণটি পাওয়া যায় তা সম্ভবত হাইপাসিয়াই সংশোধন করেছিলেন। এমনকি ইউক্লিডের 'এলিমেন্টস্'-এর উপর পিতা থিওনের কাজেও হাইপাসিয়ার অবদান আছে বলে মনে করা হয়। গণিতজগতে হাইপাসিয়ার কৃতিত্ব সম্পর্কে আজকের পৃথিবী খুবই অল্প জানতে পারে, যার অন্যতম কারণ সময়। তবে যতটুকুই এখনও পর্যন্ত জানা যায় তারই ভিত্তিতে আধুনিক জগৎ তাঁকে নিজের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের আখ্যা দিয়েছে।

দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাইপাসিয়া অনবদ্য ও ব্যতিক্রমী হাইপাসিয়া— পুরুষপ্রধান সাম্রাজ্যে যিনি বিনা দ্বিধায় প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন। এমনকী পুরুষদের জমায়েতে নিজের বক্তব্য রাখতেন ও সক্রিয়ভাবে আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। সমাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অবশ্যই জনপ্রিয়। কিন্তু

ইতিহাসের যে সময়ের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন তা ছিল বড়ই অস্থির। রোমান সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন, পাশ্চাত্যের দরজায় কড়া নাড়ছে মধ্যযুগ। খ্রীষ্টধর্মের উত্থানের সাথে সাথে ধর্মীয় দাঙ্গা তখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিশপ থিওফিলাসের নেতৃত্বে গ্রীক মন্দির সেরাপিয়াম (Serapeum) ভেঙে ফেলা হয় 391 খ্রীষ্টাব্দে। হাইপাসিয়া বা তাঁর শিষ্যেরা কখনও ধর্মীয় বিবাদ বা দাঙ্গায় জড়াতেন না। তাই পরধর্মবিদ্বেষী থিওফিলাসও তাঁকে বিরক্ত করেননি।

কিন্তু 412 খ্রীষ্টাব্দে থিওফিলাসের মৃত্যু হয়। বিস্তর রক্তক্ষয়ের পর নতুন বিশপ হল সাইরিল। শুরু হয় প্রতিহিংসার রাজনীতি। বিরোধীদের সমূলে বিনাসের অধ্যায়। সাইরিলের সঙ্গে বিবাদ চরমে পৌঁছায় আলেকজন্দ্রিয়ার প্রশাসন — ওরিস্টেসের। দুজনের রক্তক্ষয়ী বিবাদে শ্রান্ত আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টান সমাজের উচ্চবর্গীয়রা তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন পারস্পরিক সন্ধির জন্য।

ঘটনাচক্রে ওরিস্টেস ছিলেন হাইপাসিয়ার বন্ধুস্থানীয়। সকল ধর্মের মানুষের কাছে হাইপাসিয়া জনপ্রিয় তো ছিলেনই, উপদেষ্টা হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। শোনা যায় অনেক উচ্চস্তরীয় মানুষ তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য আসতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতাও কম ছিল না। সাইরিলের সাথে সন্ধির ব্যাপারেও ওরিস্টেস প্রায়শই হাইপাসিয়ার পরামর্শ নিতেন।

সাইরিল ও তাঁর অনুগামীরা হাইপাসিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেন। রটনা হয় তিনি ডাকিনীবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, তিনি ওরিস্টেসকে সন্ধি করতে দিচ্ছেন না এবং তাঁরই জন্য ওরিস্টেস চার্চের কথা শুনছেন না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে, নিকিউ (Nikiu)-এর বিশপ জনের লেখায় সেইসব ভয়ঙ্কর গুজবের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

"And in those days there appeared in Alexandria a female philosopher, a pagan named Hypatia, and she was devoted at all times to magic, astrolabes and instruments of music, and she beguiled many people through satanic wiles. And the governor of the city [Orestes] honoured her exceedingly; for she had beguiled him through her magic."

অবশেষে মার্চ মাস, 415 খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় হাইপাসিয়াকে। তখন তিনি ঘরে ফিরছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কাছের একটি চার্চে। বিবস্ত্র করে পিটিয়ে মেরে তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করা হয় এবং সবশেষে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

নিকিউ-এর বিশপ জনের ভাষায়—

"and they burned her body with fire. And all the people surrounded the patriarch Cyril and named him 'the new Theophilus'; for he had destroyed the last remains of idolatry in the city.:

গৌরবময় জীবনের ইতি নৃশংসতার পৈশাচিক উল্লাসে। এরপর সময় তার নিজস্ব ছন্দে এগিয়েছে। প্রাচীন যুগের অবসানে, মধ্যযুগ পেরিয়ে মানব সভ্যতা একবিংশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে আছে। রথ থেকে রকেট, পুঁথি থেকে ই-বুক, তুলির কারুকাজ থেকে ফোটোশপিং, চিঠি থেকে ই-মেল, তলোয়ারের আঘাত থেকে পারমাণবিক বোমা— উন্নতির গগনভেদী শিখর ছুঁয়েছে মানুষ। হবে নাই বা কেন? হাইপাসিয়ার মৃত্যুর প্রায় দু'হাজার বছর কেটে গেছে। এগিয়েছে সময়, এগিয়েছে মানবসভ্যতা।

তবুও আজও এই আধুনিক সভ্যতা থেমে যায় ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে ভাঙা মন্দির-মসজিদ-গির্জার ধ্বংসাবশেষের পাশে; চোখ ফেরায় অসিফার নিষ্প্রাণ দেহ থেকে। সভ্যতা শিউরে ওঠে জ্যোতি সিং-এর চিৎকারে। সভ্যতা নিশ্চুপ হয় গৌরি লঙ্কেশের কণ্ঠরোধে, এত সময় পেরিয়েও শেষ হয় না প্রতিহিংসা, নৃশংসতা, বর্বরতার রক্তমাখা অধ্যায়। হাইপাসিয়ার দেহভস্ম সময়ের পথ ধরে আজও ওড়ে আধুনিক মানব সমাজের আনাচে-কানাচে, একটাই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ''মানুষ আজও সভ্য হয়েছে কী?"

বিঃদ্রঃ হাইপাসিয়ার জন্মের সঠিক তারিখ এবং তাঁর মায়ের পরিচয় সম্বন্ধে ইতিহাস এখনও নীরব। তবে অনুমান করা হয় 350 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 370 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্ভবত তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিন-তালাক বন্ধে স্বস্তি, তবে আরো লড়াই বাকি

খাদিজা বানু

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিন-তালাক অবৈধ-অসাংবিধানিক। এই রায়ে উল্লসিত হয়েছে দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। খুশি নির্যাতিতা নারী ও সাধারণ নারীরাও। কেননা ভারতের বিচার ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তবে এই রায়ে অখুশি হয়েছেন, কিছুজন। ইতিমধ্যে তারা প্রতিবাদে সোচ্চারও হয়েছেন ধর্মের উপর আঘাত বলে। শত শত বছরের প্রথায় একটি নারীকে (সন্তান সহ) গৃহচ্যুত হতে হয়, বন্যা, ভাঙ্গন, সুনামী, যুদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নয়, নিজ নিরাপদ স্বামীর আশ্রয় থেকে তারই পরম নিকটজন স্বামীর দ্বারা। এই প্রথায় যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ নারীকে হারাতে হয়েছে খাদ্য, নিরাপত্তা, মর্যাদা। খাদ্যের সন্ধানে হারিয়েছে বহু নারী, বিক্রি

করতে হয়েছে নিজেকে। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় স্বস্তির নিঃশ্বাস তো বটেই। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় এটাই ইঙ্গিত করে যে মুসলিম মহিলাদের অধিকারের প্রশ্নে চাপানো জগদ্দল পাথর অন্ততঃ একটু নড়েছে।

মুর্শিদাবাদের জাহেদা এই রায়ে উল্লসিত। সে নিশ্চিত যে তার মেয়ের জীবনে তার মত আর কষ্ট হবে না। বিয়ের দুবছর পর পিতৃ-মাতৃহীন জাহেদাকে স্বামী তিনতালাক দেয়। এবার অসহায় জাহেদা কোথায় যাবে? প্রতিবেশীরা চাপ দেয় তার স্বামীকে সে যেন ফিরিয়ে নেয় জাহেদাকে। স্বামী রাজি হয়। তবে সোজা পথে সম্ভব নয়। অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে, সে তালাক দেবে তারপর নিজের স্বামীর সঙ্গে নিকাহ। প্রতিবেশীদের চাপে খাদ্য ও আশ্রয়ের কথা ভেবেই জাহেদা রাজি হয়। স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে হয় এই বিধি ব্যবস্থাতেই। কয়েক বছর পর জাহেদার কোলে ছোটো কন্যা-সন্তানকে

শাহ্ বানো

রেখে স্বামী পুনরায় বিয়ে করে অন্যত্র সংসার পাতে। কেননা পুনরায় বিয়েতে মুসলিম ধর্মীয় কোন বাধা নাই। এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে সেই ছোটো কন্যা সন্তানকে বড় করেছে জাহেদা। মেয়ের মুখপানে চেয়ে আংশকা উৎকণ্ঠায় উদগ্রিব হয়ে থাকে। ধর্মের নামেই নির্যাতিতা হয়েছে জাহেদা তালাকে, ধর্ষণে (হালালা নিকাহ), বহু বিবাহের শিকার হয়ে। উৎকণ্ঠা তো থাকারই কথা। লক্ষ লক্ষ নারীর এমন জীবন যন্ত্রণার খবর ক'জন রাখে? ধর্মের নামেই ধর্ষিতা হতে হল জাহেদাকে। এমন ধর্মীয় আইনের চোখে নারীকে কি মানুষ বলে গণ্য করা হয়? এমন ধরণের ব্যক্তিগত আইন রচনা করে যারা মানবতাকে বিপন্ন করছে তারা কি ধার্মিক?

তিনতালাক বন্ধ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের খবর গ্রামে গঞ্জে সাধারণ নারীদের কাছে পৌঁছাতে সময় লেগেছে অনেকটাই। বেশির ভাগ গ্রামীণ মুসলিম পুরুষরাই এই খবরের চর্চায় আগ্রহী নয়। এক্ষেত্রে বরং অশিক্ষিত, অসচেতন মেয়েদেরই সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সাহস ও উৎসাহ বাড়তে দেখা গেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে পদযাত্রায় ও অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মুর্শিদাবাদে। মোমিনার ১৩ বছরে বিয়ে, ১৬ বছরে তালাক। ছেলের বয়স ২২। ছেলে বাধ সাধল তালাক বন্ধের মিছিলে যাওয়া হবে না। লোকে নিন্দা করবে। মোমিনার জবাব, 'ভারতের বিচার আমাদের দিকে তাকিয়েছে। আমরা আর কাউকে ভয় পাই না। সরকার যদি একবার মুখ তুলে তাকায় আমাদের আর কষ্ট থাকবে না। তোমাকে বড় করতে অনেক কষ্ট করেছি বাবা। বহু-বিবাহ বন্ধ করতে হবে এখনও অনেক কাজ বাকি।'

এই ভাবে যদি নারী জাগরণ হতে থাকে আইন না করে উপায় কি? তাই শুধু তিন-তালাক বন্ধ নয়। বন্ধ করতে হবে বহু বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হবে কোর্টে, সরকারি হস্তক্ষেপে, সম্পত্তির সম-অধিকার প্রয়োগ করতে হবে, বিধবা (শ্বশুর জীবিত) তাদের গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না, হালালা নিকাহ বে-আইনি ঘোষণা করা দরকার। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য চাই আইনি সুরক্ষা। তাদের প্রতি যথার্থ মর্যাদা এখানেই। মুসলিম নারীদের অধিকারের প্রশ্নে ভারতীয় আইনি অস্ত্র না থাকায় যুগ যুগ ধরে বিপন্ন হয়েছে তারা। এবারের সুপ্রিম কোর্টের রায় ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণেই যে এই রায়ে বিপন্ন নারীরা মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চলেছে।

গোটা দেশ জুড়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিন-তালাক বন্ধ সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে চলেছে, সেমিনার, পদযাত্রা, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালিখি, মত বিনিময় ইত্যাদি। অদ্ভুতভাবে লক্ষ্যণীয় এই রাজ্যের সরকার এই বিষয় সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত নীরব। মুসলিম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রতিবন্ধক, যারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের রায় মানি না। এই রায় ধর্মের উপর আঘাত এনেছে। তেমন একটা মৌলবাদী শক্তিকে এই নিরবতার দ্বারা সমর্থন ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করা হচ্ছে না কি? রাজ্য সরকারের এমন আচরণ নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা হতে সাহায্য করবে কি? অন্যদিকে বি.জে.পি সরকার ও প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তাদের কৃতিত্ব বলে দাবি করছে ও প্রচার করছে। তাহলে বলতে হয় ভারতের বিচার ব্যবস্থার আর কোন স্বাধীন-সত্ত্বা নেই, এর দ্বারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ আদালতকে মোদি সরকার অপমান করলেন। ১৯৮৬ সালের শাহাবানু মামলার পর থেকেই মুসলিম মহিলা আইনকে সংশোধন ও সরকারি আইনি সুরক্ষার দাবিতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন আন্দোলন করে চলেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতা নারীদের আবেদন, বিচার প্রার্থী হিসাবে। সায়রাবানু, আফরিন রহমান, ইশরাত জাহান, গুলসান পারভীন ও ফারহা ফয়েজ ছাড়াও সারা দেশ থেকে পাঠানো আবেদনের সংখ্যা কম নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে নারীর অধিকার সুরক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সরকারের আইন তৈরিতে বিলম্ব কেন? সারা পৃথিবীতে ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন হয়েছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, আলবেনিয়া, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে পরিবর্তন হয়েছে। ইসলামিক দেশগুলোতেও কম পরিবর্তন হয় নি। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইয়েমেন, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশে মুখের কথায় তালাক বন্ধ হয়েছে। তালাক হয় আদালতে। মরক্কো, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশে আইন করে বহু-বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। কম পক্ষে ২২টি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত আইনের

পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যারা পরিবর্তনের বিরোধিতা করছে এদেশে- তারা কি বলবেন যে ওই সব দেশে মুসলিম নাগরিক মুসলমান নয়?

সকলেরই জানা ইসলাম ধর্মেই প্রথম নারীদের সম্পত্তির অধিকার, বিবাহে মত প্রকাশের অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদে অধিকার, বিধবা বিবাহ অধিকার, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকার চাইতে গেলে মৌলবাদী গোষ্ঠী গেল গেল রব তুলে বলেছে খোদার নির্দেশে তৈরি হয়েছে শরিয়ত, সেখানে কারুর কলম চালানোর অধিকার নাই। একই নিয়মে প্রশ্ন করি খোদার দেওয়া শরীরে কোন অসুবিধা দূর করার জন্য চিকিৎসককে আমরা ছুরি চালাতে দিই কেন? মোবাইল, নেট, ওয়েবসাইট, প্লেনে ধর্মীয় স্থানে যাওয়া কোথায় নির্দেশ ছিল যে গুলো আমরা ব্যবহার করি। এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে সমাজ পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনের ধারায় সমাজের সমস্ত মানুষই সে সুযোগ গ্রহণ করবে। এখানে অপরাধ কোথায়? আইনের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য আইন। মহান ব্যক্তি হযরত মহম্মদের নির্দেশ স্মরণ করেই বলতে হচ্ছে, 'শরিয়তের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান না বলে মনুষ্যত্বকে কাজে লাগাবে।' তাই মনুষ্যত্বের প্রয়োজনেই ইসলামের বহু আইনের পরিবর্তন হয়েছে। ডঃ ওসমানগণি ইসলামতত্ত্ববিদ এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরানে সুরা মাহিদা, (৫.৩৮) পুরুষ বা নারী চুরি করলে হাত হাত পা কেটে দাও। আরবে এ জিনিস চলত। সেই সব দেশেও আইনের পরিবর্তন হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি ছিল—তাদের ঘরে আবদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু হয় (৪.১৫) (কোরান)। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককে ১০০ ঘাত বেত মার (২৪.২) (কোরান)। ব্যভিচারের শাস্তির পরিবর্তন হয়েছে এক নারী থেকে অন্য নারীতেও, এটাই তো পরিবর্তনের ইতিহাস।

এই দেশেও ইসলামিক ক্রিমিনাল আইনের পরিবর্তে সকল নাগরিকের জন্য ভারতীয় দন্ডবিধি সংক্রান্ত আইন প্রযোজ্য হয়েছে। সমস্ত অপরাধমূলক কাজের জন্য মুসলিম সমাজ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইনের বিচারপ্রার্থী। শুধু বাদ কেন থাকবে নারীর অধিকারের প্রশ্নে? ব্যাঙ্কিং সিস্টেম, জীবনবীমা শরিয়তি আইনের বিরোধী ছিল। এখন পরিবর্তন হয়েছে। আজ মুসলিম সম্প্রদায় ব্যাঙ্ক থেকে সুদ নেওয়াকে অধর্ম বলে মনে করে না। মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনেই তা সম্ভব হয়েছে। পরিবর্তনশীল সমাজে সমাজ বদলাবে, মানুষ বদলাবে, সমস্যা বদলাবে আর ধর্মীয় আইন থাকবে অচল অনড়? আজকের দিনে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজের একটা দিক যেমন আলোকিত করেছে, মনের বিজ্ঞানের অগ্রগতি যদি পাশাপাশি চলতে না পারে এক পা খোঁড়া নিয়ে সমাজের অগ্রগতিকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সমাজের কল্যাণেই চাই বিজ্ঞান মনস্ক মনন। আর এই মনের বিকাশের দায়ভার নিতে হবে এদেশের চেতনশীল শিক্ষিত সমাজকেই।

[কৃতজ্ঞতা : রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি]

তিন তালাক নিয়ে

পথিকৃৎ : শাহ্ বানো

পাঁচ আবেদনকারী

সায়রা বানো, ইশরাত জাহান, গুলশান পারভিন, আফরিন রেহমান ও আতিয়া সাবরি

দুই লড়াই চালিয়ে যাওয়া নারী

অধ্যাপিকা জাকিয়া সোমান, সমাজকর্মী নূরজাহান সাফিয়া নিয়াজ

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের নির্যাস

- তিন তালাক ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ নয়। এটা সাংবিধানিক নৈতিকতার লঙ্ঘন
- মর্জি হলেই কেউ বিয়ে ভেঙ্গে দেবেন, এমন হতে দেওয়া স্পষ্টভাবে অযৌক্তিক
- ধর্মে যেটা পাপ, আইনের চোখেও তা বৈধ হতে পারে না
- তিন তালাক অসাংবিধানিক ও যুক্তি হীন। এটা ইসলামের অঙ্গ নয়

প্রধান বিচারপতি জগদীশ সিংহ খেহরের নেতৃত্বে পাঁচ ধর্মের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দেন

কোন তালাক অসংবিধানিক

মুসলিম সমাজে মূলত তিন রকমের তালাক প্রচলিত। **'তালাক-এ এহসান'**, **'তালাক-এ-হাসান'** এবং **'তালাক-এ-বিদ্দত'**। প্রথম দুটি হয় নির্দিষ্ট সময় কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে, যেখানে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরেও আসা যায়। তৃতীয় ক্ষেত্রে পরপর তিনবার তালাক বলেই বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি ছিল শুধু তৃতীয় পথটির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে। চিঠি, ফোন, এস.এম.এস. বা ইন্টারনেটেও তিন তালাক দেওয়ার বহু ঘটনা সামনে এসেছে বারবার। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ বহু মুসলিম দেশেই তিন তালাক নিষিদ্ধ।

নিকা হালালা

কোন মহিলাকে তালাক দেবার পর তার স্বামী যদি আবার তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে মাঝে ঐ মহিলাকে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে অর্থাৎ তার সাথে সহবাসে বাধ্য হতে হয়। আবার তালাক পাওয়া নারীর অন্যত্র নিকা হওয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে নিকা হালালায় বাধ্য করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় পাত্রের পিতা, দাদা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়রা মহিলাদের বলপূর্বক ধর্ষণ করে নিকা হালালার নামে।

মুক্তি সংগ্রামের উপেক্ষিত নায়িকা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ফটিক চন্দ্র দে

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় **প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** একজন ব্যতিক্রমী মহিলা। মাত্র ২১ বছর বয়সে মহীয়সী এই মহিলা সমাজ শরীরে যে চিহ্ন রেখে গেছেন, তা পর্যবেক্ষণের জন্য অবশ্যই গবেষণার প্রয়োজন। সুতরাং আমরা গবেষণা করে দেখি কি অমূল্য রতন পাওয়া যায়।

শহীদ প্রীতিলতা

এক সময়কার অবিভক্ত বাংলার প্রান্তিক জেলা শহর এবং বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রধান বন্দর নগরী চট্টগ্রাম পাহাড়। আর সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে চট্টগ্রাম শহর অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের স্থান করে নিয়েছে। ১৯১১ সালে এ শহরেই এক শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রয়াত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জন্ম গ্রহণ করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঁধাবিঘ্ন-দায়দায়িত্ব, শ্রেণিগত অবস্থান আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার মত মানসিকতা, তখনও সম্ভবত হয়নি প্রীতিলতার। স্বাভাবিক কারণে অন্যান্য মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মতো প্রীতিলতারও হয়তো মনোগত ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করে চাকরি বাকরি ঘর সংসার করবে। সে লক্ষ্যেই চট্টগ্রামে স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ-শিক্ষার জন্যে ঢাকায় গিয়ে ইডেন কলেজে ভর্তি হন। আই এ পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ পাশ করেন। এবং চট্টগ্রাম এসে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষায়িত্রীর চাকরি গ্রহণ করেন।

মানুষ যা আশা করে সব সময় তা হয় না। প্রীতিলতার জীবনেও তা হল না। না হওয়ার কারণগুলি খতিয়ে দেখা যাক। প্রধানত জনগণের দুঃখ দারিদ্র আর ব্রিটিশ সরকারের নির্মম অত্যাচার প্রীতিলতার মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নিরন্তর এই যন্ত্রণা উপশমের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি **লীলা নাগের** সংস্পর্শে এসে তত্ত্বগতভাবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ পরিবর্তনের দিশার সন্ধান পান। তাই কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের কার্যকলাপ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। উভয় দলের রাজনৈতিক বক্তব্য এবং কর্মসূচিগুলি তিনি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারেন যে—

দুটি দলই সংস্কার পন্থী। কোন দলই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চায় না। স্বাধীনতার নামে স্বায়ত্ত্বশাসনই এদের লক্ষ্য। যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা হস্তগত হলেই হল। শোষণ-মূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, শুধু শাসকদের পরিবর্তন হলেই এদের কার্যসিদ্ধি হয়। তাই প্রীতিলতা কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কোন দলের সঙ্গেই নিজেকে সংপৃক্ত করতে পারেন নি। প্রীতিলতা প্রয়াত হওয়ার পর দেখা গেল ওই দুটি দল সম্পর্কে ওনার অনুমান কত নির্ভুল ছিল। ১৯৪৭ সালে যে স্বাধীনতা এলো সে তো একমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরই হল। শোষণ শাসন সহ রাষ্ট্র ব্যবস্থা পূর্বাবস্থায়ই রয়ে গেল।

১৯২০ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেস দলের বহু কর্মী বিদ্রোহ করেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ ছাড়া করা যে সম্ভবপর নয়, তা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। চট্টগ্রামের **সূর্য সেন** এবং তাঁর অনুগামীরাও বিদ্রোহী হলেন। বিদ্রোহের পরিমাণ বুঝতে হলে সূর্য সেনকে দিয়েই বোঝা যায়। কারণ তিনি কংগ্রেসের একজন সাধারণ সদস্য মাত্র ছিলেন না। তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এ সকল বিদ্রোহীরা সশস্ত্র অভুত্থানের লক্ষ্যে **'অনুশীলন'** ও **'যুগান্তর'** নামে দুটি গোপন দল গঠন করেন। স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু সদস্য ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র অভুত্থানের প্রয়োজনে গোপন দলগুলিকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। গুপ্ত সংগঠনগুলি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দুজন মহীয়সী মহিলার অবদান ভারতবাসীর কখনও ভোলা উচিত নয়। ভগিনী **নিবেদিতা** আর **সরলা দেবী**। যাঁদের পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় প্রীতিলতা ও উদ্বুদ্ধ হয়ে সূর্য সেনের সাথে যোগাযোগের কথা ভাবতে থাকেন।

সূর্য সেন যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত আছেন জানতে পেরে প্রীতিলতা চট্টগ্রাম এসে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন এবং ১৯৩২ সালে তাঁর দলের সাথে যুক্ত হন। ওই বছরই প্রীতিলতার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ হয়। এবং সফলভাবে ক্লাবটি বিদ্ধস্ত করে ফিরে আসার পথে তিনি গ্রেপ্তার হন। ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভেবে সঙ্গে রাখা পটাশিয়াম সায়নাইডের সাহায্যে শহীদ হন। একজন বিপ্লবী নেতা বা নেত্রী দলের কথা ভেবে যা করা উচিত ২১ বছর বয়সী প্রীতিলতা সে নিদর্শনই রেখে গেছেন।

প্রীতিলতা শহীদ হওয়ার পর ওনার পোশাকের ভিতর নিজহাতে লেখা একটি চিঠি পাওয়া যায়। তাতে তিনি পরিস্কার লিখে গেছেন যে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের অংশ হিসাবে তিনি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেছেন। ঐ চিঠিতে সমস্ত ভারতবাসী বিশেষ করে নারী সমাজকে এ সংগ্রামে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন।

শিরোনামের তাৎপর্য এ কারণে যে শ্রেণি বিভক্ত সমাজটাকে রক্ষা করার জন্য যে মহিলারা আধুনিক সাজসজ্জায় সিনেমা, টিভির পর্দায় নেচে গেয়ে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখেন, সমাজের ধারক বাহকরা তাদের জীবিত এমন কি মরার পরেও নানা পুরস্কারে সম্মানিত করে থাকেন। আর যারা এ সমাজটাকে আমূল পরিবর্তন করে শ্রেণিহীন

সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছেন, তাঁরা কিন্তু উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দু'জন ব্যক্তির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা থাকছে। (১) প্রীতিলতার এক দাদা প্রয়াত সন্তোষ ওয়াদ্দেদার, যিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ১৯৬৪ কি ৬৫ সলি ঠিক মনে নেই কর্মচারি আন্দোলন করতে গিয়ে ওনার সাথে আমার পরোক্ষে যোগাযোগ হয়। সে সময় প্রীতিলতা সম্বন্ধে সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে অনেক খবর জানতে পারি। (২) দ্বিতীয় ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়েছি।

বীরাঙ্গনা কল্পনা দত্ত

''ধরা পড়ার পর মাস্টারদা, ফুটুদা আর আমাকে নিয়ে নতুন করে মামলা শুরু হয়েছিল। আমরা কাঠগড়ায় একসঙ্গে দাঁড়াতাম। সেইসময় একদিন ফুটুদা বলেছিলেন, তোকে ভালো লাগে। যদি ফিরে আসি, আমার জন্য অপেক্ষা করবি? আমার মৌনতায় হয়তো সম্মতি ছিল। কারণ এর প্রায় দশ বছর পরে যখন জোশী (পিসি জোশী) আমাকে প্রোপোজ করে তখন আমি বলেছিলাম আমি যে তারকেশ্বর দস্তিদারকে কথা দিয়েছি।''

—''চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা', লেখিকা -কল্পনা দত্ত, পৃষ্ঠা ১২১।

'ফুটুদা' ফিরে আসেননি। ১৯৩৩-এ একইসঙ্গে মাস্টারদা সূর্য সেন এবং ফুটুদা, অর্থাৎ **তারকেশ্বর দস্তিদারের** ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। দিনটি ছিল ১৪ আগষ্ট।

কে জানতো, তার ঠিক চোদ্দ বছর পর চট্টগ্রামে পা রাখতে পার্সপোর্টের প্রয়োজন শুরু হবে? কে জানতো একটা জঘন্য বেইমানীর কাঁটাতার লক্ষ কোটি বছরের জন্য পেতে দেওয়া হবে সংগ্রামী, আত্মত্যাগী একটি জাতির বুকে? কে জানতো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে একা 'দখল' করার উদ্যোগ শুরু হবে একটি দলের পক্ষ থেকে? কে জানতো শাসক আর রাষ্ট্রের সব দখলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতেও, স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও রুখে দাঁড়াবে কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদাররা?

আজও লড়াই আছে। কারণ শোষণ আছে। কাঠগড়া আছে, শোষিতের জন্য। তবু স্বাধীন সার্বভৌম, হেমন্তের আকাশের মত স্বপ্ন আছে আজও। আর আছে আজও, তাকে ধারণ করার দুর্জয়, অনবদ্য হৃদয়। সেই হৃদয়ের দুটি প্রকোষ্ঠ—একটির নাম ফুটুদা। আর একটি সূর্য সেনের বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি তারকেশ্বর দস্তিদার। কিন্তু দুই প্রকোষ্ঠের মাঝে কোনও দেওয়াল নেই। কোনদিন ছিল না। কাঠগড়ার সেই কয়েক মুহূর্তের বিবরণই তার প্রমাণ।

কল্পনা দত্তের 'শাস্তি' হয়েছিল যাবজ্জীবন দীপান্তরের। রায়ে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি বলেছিলেন, ''মেয়ে বলে এবং কম বয়স বলেই প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা গেলো না।'' তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের চিঠি এবং লক্ষ মানুষের আবেগ, প্রতিবাদের মুখে কল্পনা দত্তের আন্দামানের কারাগারে পাঠানো রদ করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ শাসকরা। তবে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ দেশের বিভিন্ন জেলে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল। রাজশাহীর জেলে বসে মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির খবর পেয়েছিলেন। কল্পনা দত্তের কথায়, ''মাস্টারদার ফাঁসি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তবু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম রাজশাহী জেলে বসে: 'তোমার আদর্শ বহন করে নিয়ে আমরা চলব।''

সেই আদর্শের স্রোত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সেনানী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, **অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষদের** সহযোদ্ধা কল্পনা দত্ত খুঁজে পেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের মধ্যে।

আর 'ফুটুদা'? সেই কথা দেওয়া? কল্পনা দত্ত জানিয়েছেন, ''দুর্ভিক্ষের পরে বোম্বেতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল। সালটা সম্ভবত ১৯৪৩। আমি চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে সেই কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানেই জোশী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমি বললাম আই হ্যাভ প্রমিসিড তারকেশ্বর দস্তিদার। জোশী বলল, তুমি জানো না ওর ফাঁসি হয়ে গেছে। ও তো আর কোনদিন আসবে না।.....তাও আমি দোনা মোনা করছিলাম। বিটি (বিটি রণদিভে), ডক (ড: গঙ্গাধর অধিকারী) এরা ইনসিস্ট করাতে বিয়ে করলাম।'' তারপরও ১৯৯৫-র ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কমরেড কল্পনা দত্ত বেঁচে ছিলেন। সব লড়াইয়ে 'ফুটুদা'র ঐতিহ্য, আত্মত্যাগের শিক্ষা তাঁর পাথেয় ছিল।

[কৃতজ্ঞতা : শঙ্কর নাথ]

মাতৃত্বের সহজ স্বাভাবিক বার্তা

এর আগে পার্লামেন্টে শিশু সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নারী প্রধানমন্ত্রী ও কানাডার এক নারী মন্ত্রী। ১৯৯০ তে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মা হয়েছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো। এবছরেই অকল্যান্ডের হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিণ্ডা আরডেন। এবার প্রসব বেদনা ওঠায় নিজে সাইকেল চালিয়ে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হয়ে সন্তান প্রসব করেন ৩৮ বছর বয়সী নিউজিল্যান্ডের নারী কল্যাণ মন্ত্রী জুলি অ্যান জেন্টার।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে

পোশাক শিল্প : বাংলাদেশ

নির্ম্মলেন্দু নাথ

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিশ্বায়ন এবং একই সঙ্গে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের যুগ। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং পাশাপাশি বিশ্বায়নের ফলে একসাথে দু'ধরনের চলাচলের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে কাজের সন্ধানে মানুষ/শ্রমিক একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাচ্ছে অর্থাৎ দেশান্তরী হচ্ছে অন্যদিকে সস্তা শ্রমের সন্ধানে 'কাজ' (জব) এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দিচ্ছে। কাজ ও শ্রমের সমান চলাচলই এই বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য। শিল্পবিপ্লবের প্রথম একশ বছরে এই চলাচল মূলতঃ শ্রমের চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে 'কাজ' ও শ্রম উভয়ই চলমান হয়েছে। এই চলমানতা বিগত দুই-তিন দশকে অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

একদিকে 'কাজ' ও 'শ্রমে'র এই অভাবনীয় চলাচলের ফলে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার প্রয়োজন-এর ধারণাটি পরিবর্তিত হয়েছে অপরদিকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট শ্রমিকের প্রয়োজনের ধারণাটিও পরিবর্তিত হয়েছে। সাবেকী 'কাজের' জায়গার পরিবর্তে নতুন নতুন 'কাজে'র জায়গা তৈরি হচ্ছে। ওইরকম একটা জায়গা হল বাংলাদেশের গারমেন্টস শিল্প বা পোশাক শিল্প। আমাদের মতে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন 'কাজ' ও 'শ্রমে'র চলাচলের ক্ষেত্রে যে গভীর পরিবর্তন এনেছে তা অনুধাবন করার জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্প হল আদর্শ জায়গা।

১

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাকশিল্প (রেডিমেড গারমেন্ট) এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে 'কোটা' ব্যবস্থার সুবিধাতে এই শিল্প ২০ বছরে দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত বিকশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশকে পাটের রপ্তানিকারক দেশ থেকে পোশাকের রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরিত করেছে। বাংলাদেশ গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারস এবং এক্সপোর্টারস্

অ্যাসোসিয়েশান (বি জি এম ই এ)-র হিসাব অনুযায়ী ১৯৮০ সালের গোড়ায় দেশের মোট রপ্তানী বাণিজ্যে পোষাক শিল্পের অবদান ছিল ৪ শতাংশ, ১৯৮৫-৮৬ সালে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ শতাংশ। ২০০১-০২ এ রপ্তানি বাণিজ্যে পোশাক শিল্পের অবদান হয়েছে ৭৭ শতাংশ। বি জি এম ইএ-র হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৫-৮৬ সালে পোশাক শিল্পে মাত্র ২ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল বর্তমানে ঐ শিল্পে প্রায় ১৮ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি নিয়োজিত রয়েছে। বি জি এম ইএ-র তথ্যে এটাও বলা হয় যে পোশাক-এর প্যাকেজিং, ক্যুরিয়র প্রভৃতি কাজে আরো ১৮ লক্ষ শ্রমিক কমবেশী নিয়োজিত আছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ শ্রমিক পোশাক শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। ওই সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৮৫-৮৬ সালে। পোশাক তৈরির কারখানা ছিল ৫৯৪টা আর ২০০১-০২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৬০০।

আশির দশকের শুরুতে আন্তর্জাতিকভাবে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে দু'ধরনের পরিবর্তন আসে। প্রথমতঃ সত্তর দশকে খনিজ তেলের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম (সিন্থেটিক) তন্তুর উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে সাধারণ সূতিবস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ সাবেকী কাপড়/তাঁত বোনার পদ্ধতির পরিবর্তে পশম/গেঞ্জি বোনার পদ্ধতিতে বোনা সূতি বস্ত্রের চাহিদা বাজারে বেশি সমাদৃত হতে থাকে। এই পদ্ধতিতে বোনা ফ্যাব্রিকের কাপড় অপেক্ষাকৃত মসৃণ হয়। এছাড়া এই পদ্ধতিতে অনেক কম সময়ে পছন্দমত ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা যায়। এই দ্বিবিধ কারণে গেঞ্জি বোনার পদ্ধতিতে বোনা সূতিবস্ত্রের পোষাকের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে সূতিবস্ত্রের পোশাকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নতুন আদলে পোশাকশিল্প গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে বয়নশিল্পের পুরানো এলাকাগুলো যেমন পাবনা, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি একইরকম থেকে যায়। এর পরিবর্তে নতুন নতুন এলাকায় এই পোশাকশিল্প গড়ে ওঠে।

২

আশির দশকে মাঝামাঝি সময় থেকে গড়ে ওঠা এই পোশাকশিল্প বন্দরনগরী চট্টগ্রাম ও ঢাকা শহরের আশপাশে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কয়েকশ একর জমির উপর বিস্তৃত সাবেকী ধরনের কারখানার (যেমন পাটশিল্প) পরিবর্তে এই কারখানাগুলো এক একটা বড় বাড়ির মধ্যে অবস্থিত। শহরের কাছাকাছি বিস্তৃত জমির অপ্রতুলতার জন্য কারখানাগুলি এ ভাবেই গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের কে. টি. এস গারমেন্টস্, ঢাকার তেজগাঁও-এ ফিনিক্স গারমেন্টস্ সবগুলোই বড় বড় ভবনে অবস্থিত। এইসব কারখানার মালিকানা মূলতঃ বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে কনট্রাক্ট (চুক্তি)-তে কাজ করে। বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমী দেশগুলোর এক বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির ('মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট, সংক্ষেপে এম.এফ.এ) বলে এইসব কারখানার মালিকরা পশ্চিম দেশ থেকে ফ্যাব্রিক, সুতো ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র আমদানী করে, তারপর স্থানীয় শ্রমিকদের সাহায্যে পোশাক তৈরি করে বিদেশী

কোম্পানীগুলোকে সরবরাহ করে। বেলজিয়ামের কটন গ্রুপ গ্যাপ, স্পেনের ইন্ডিটেক্স, জার্মানীর কাসটার্ড কোয়েল ইত্যাদি হল এই ধরনের কোম্পানী। এরাই বাংলাদেশের বিভিন্ন পোশাক তৈরির কারখানা থেকে তৈরি পোষাক কিনে থাকে। এদের মধ্যে স্পেনের ইন্ডিটেক্স বাংলাদেশের ৭৩ টি পোশাক কারখানা থেকে পণ্য ক্রয় করে থাকে।

৩

বাংলাদেশের শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ৩৬০০ কারখানায় পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি হচ্ছে, বাকী ১১০০ কারখানা নানান কারণে বন্ধ। যেসব কারখানা চালু রয়েছে তার মধ্য সকলের মান একই রকম নয়। বি জি এম ইএ-র হিসাব অনুযায়ী মোট কারখানার মধ্যে ৬০-৭০টি আন্তর্জাতিক মানের আর মধ্যম মানের কারখানার অবস্থা একশতর কাছাকাছি। বাকিগুলোর মান হতাশাব্যঞ্জক। সরকারী তথ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৪৭ শতাংশ কারখানায় কাজের কোন পরিবেশ নেই। ঢাকার মালিবাগ থেকে রামপুরা রোডের অধিকাংশ কারখানা এই পর্যায়ে পড়ে। এইসব কারখানার পরিবেশ যেন শ্রমিকদের মৃত্যুফাঁদ। এখানে গুদামের মত ঘরে একসঙ্গে শত শত শ্রমিক কাজ করে। কারখানার সিঁড়ি অত্যন্ত অপরিসর। দুজন মানুষ কোনমতে পাশাপাশি ওঠানামা করতে পারে। প্রায়শই এসব কারখানায় আগুনে পুড়ে পায়ের নিচে চাপা পড়ে এবং ভবন ধ্বসে শ্রমিকরা মারা যায়। এক হিসাবে দেখা যায় গত ১৫ বছরে প্রায় পাঁচ শতাধিক পোশাক শিল্প শ্রমিক মারা গেছেন, যাদের বড় অংশ হল নারী।

এর বিপরীতে আন্তর্জাতিক মানের কারখানার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। এই কারখানাগুলো কয়েক একর জায়গা জুড়ে সাত-আট তলা বাড়িতে অবস্থিত। বাড়িগুলো ঝকঝকে তকতকে। এসব বাড়িতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশুদের দোখাশোনার জন্য ডে কেয়ার সেন্টার ও লেখাপড়ার ঘর আছে। এসব বাড়ির সিঁড়ি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। সিঁড়ি ছাড়া লিফ্‌ট আছে। প্রতিটি তলা অত্যন্ত খোলামেলা। টয়লেট যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই ধরনের ভবনে অবস্থিত কারখানায় প্রায় চার হাজার শ্রমিক কাজ করে থাকে। ঢাকার অদূরে সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুর এলাকায় এই ধরনের কারখানা রয়েছে। বিদেশী কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধিরা এখানেই আসেন।

ক্রেতাদের চাহিদামতো কারখানায় পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বড় বড় মালিকরা তাদের কতকগুলো ইউনিটকে এভাবেই সাজিয়ে রেখেছে। ক্রেতা বা তার প্রতিনিধিদের এগুলোতে পরিদর্শন করানো হয়। আর কাজ পেলে ভাগ করে দেওয়া হয় সব নিম্নমানের কারখানায়। কারণ নিম্নমানের কারখানায় মুনাফার হার বেশি। এছাড়া বড় বড় পোশাক শিল্পগোষ্ঠীগুলো বেশি রপ্তানির অর্ডার পেলে নিম্নমানের কারখানায় সাব-কনট্রাক্ট দিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই সাব কনট্রাক্টের কাজ করা কারখানাগুলোতে কাজের পরিবেশ অত্যন্ত বিপজ্জনক ও অস্বাস্থ্যকর।

৪

আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে বর্তমানে প্রায় ১৮ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। এই শিল্পের কাজ মূলতঃ শ্রমনিবিড় আর সাধারণ মানের কারিগর-এর সাহায্যে এই কাজ করা যায়। এই কারণে এই শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বর্তমানে পোযাক শিল্পে ১৮ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশ মহিলা।

সাধারণভাবে দুধরনের শ্রমিক এই শিল্পে আছে। একদল শ্রমিক অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পোশাক উৎপাদনে নিযুক্ত আছে অপরাপর শ্রমিকরা সাহায্যকারীর (হেলপার) কাজ করে। অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পোশাক তৈরিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১৭৫০ টাকা আর হেলপারদের বেতন মাসে ৯৩০ টাকা। নারী ও পুরুষেদের মধ্যে বেতন-এর বৈষম্য এই শিল্পে আছে। প্রায় ৮৫ শতাংশ মহিলা পুরুষ শ্রমিকদের বেতন অপেক্ষা ৬৫ শতাংশ কম পান। অধিকাংশ কারখানাতে মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না। সন্তান হবার আগে চাকুরী ছেড়ে দিতে হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের কারখানাগুলোতে শিশুশ্রমেরও প্রচলন আছে।

১৯৮৫ সালে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের (হেলপারদের) সর্বনিম্ন বেতন ছিল ৬০০ টাকা। বর্তমানে এই বেতন ৯৩০ টাকা। টাকার অংকে এই মজুরি ৩৩০ টাকা বাড়লেও ডলালের অংকে তা কমে গেছে। ১৯৮৫ সালে হেলপার শ্রমিকের আয় ছিল ২০ ডলার আর বর্তমানে এই আয় কমে হয়েছে ১৩ ডলারের একটু বেশী। একথার অর্থ হল বিগত ২০ বছরের পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়নি বরং তা হ্রাস পেয়েছে।

৫

বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে নিয়োজিত একজন শ্রমিক তার কারখানায় যে মূল্য সংযোজন ঘটায় তার বার্ষিক আর্থিক মূল্য ২২ হাজার ৫০০ ডলার। এ তথ্য বিশ্বব্যাংকের। অথচ মালিক বছরে গড়ে একজন শ্রমিকের জন্য ব্যয় করেন ৭০০ ডলার। বিশ্বব্যাংকের মতে এটা সর্বনিম্ন। বাংলাদেশের একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি মাসে ৯৩০ টাকা। দৈনিক হিসেবে এই মজুরি ১ ডলারের কম। অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের পোষাক যেসব শ্রমিকরা তৈরি করে, তাদের মজুরি দিনে ১ ডলারের কম। এখন আন্তর্জাতিক হিসাবে যারা দিনে ১ ডলারের নীচে আয় করে তারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন বলে ধরা হয়। এই হিসাবে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। এরা যে পরিবেশ-এ বাস করে তা দুর্বিসহ। মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ লাগোয়া নবোদয় হাউজিং-এ এইরকমই একটা বিষময় পরিবেশ রয়েছে। অপুষ্টির কারণে এসব এলাকার মানুষজনকে কখনই প্রাপ্তবয়স্ক মনে হয় না।

পোশাকশিল্পের নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকলেও এই শিল্পের মালিকদের বিত্তবৈভব উত্তরোত্তর বেড়েছে। এই শিল্পের মালিকরা আয় করেছেন ডলারে। এর বিপরীতে শ্রমিকরা পেয়েছে স্থানীয় মুদ্রা। ফলে টাকার অবমূল্যায়ন বা বিনিময় হারের সুবিধা মালিকরা পুরোপুরি পেয়েছেন। মুদ্রাস্ফীতিও মালিকদের স্পর্শ করতে পারে নি। আর শ্রমিকরা তাদের মজুরি টাকায় পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি যত বেড়েছে শ্রমের মূল্য তাদের সেই অনুপাতে বাড়ে নি। সেন্টার ফর পালিসি ডায়ালগ নামে একটি বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০০১-০২ আর্থ বছরের হিসাব ধরে পোশাক শিল্পের উপর একটি সমীক্ষা করে। সমীক্ষায় দেখা যায় ২০০১-০২ আর্থবছরের পোশাকশিল্পে রপ্তানী আয় ৪৫৮ কোটি ডলার। এর মধ্যে শ্রমিকরা পেয়েছে ২২ কোটি ১০ লাখ ডলার অর্থাৎ মোট আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ শ্রমিকরা পেয়েছে। সমীক্ষায় এটাই দেখা গেছে মালিকরা নিজেদের মুনাফা বাবদ নিয়েছে ৩৫ কোটি ৬ লাখ ডলার যা মোট আয়ের ৮ শতাংশ।

৬

একদিকে কিছু প্রদর্শনী কারখানা, অপরদিকে অস্বাস্থ্যকর বিপজ্জনক পরিবেশের অধিকাংশ কারখানা, একদিকে মালিকদের মুনাফার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অপরদিকে শ্রমিকদের দারিদ্ররেখার নীচে অসহনীয় অবস্থান— এভাবেই বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শিল্প (পোশাক শিল্প)। উদ্বৃত্ত অর্থ খুব কম ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো, কারখানার মান উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রভৃতি কাজে ব্যয় করা হয়েছে। ফলে ৯০-এর দশকের শেষ পর্যায়ে উৎপাদন শ্লথ হয়ে পড়ে। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। একথা সুবিদিত যে বাংলাদেশ মাল্টিফাইবার এ্যারেঞ্জমেন্টের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে সুবিধা পেত তারই ফলশ্রুতিতে গার্মেন্টিস শিল্প বাংলাদেশে বিকশিত হয়েছে। এই সুবিধা বর্তমানে আর বলবৎ নেই। বিপরীতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড-অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তি) বা সংক্ষেপে টিফা নামক একটা বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত হতে চলেছে। এই চুক্তির ফলে গার্মেন্টিস শিল্প আরো কঠিন অবস্থায় পড়বে বলে অনেকের ধারণা। বর্তমানে তৈরি পোষাক শিল্প পণ্যের উপর গড় আন্তর্জাতিক শুল্ক ১২ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশের পণ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরো বেশি— ১৯ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত ১ ডলার মূল্যের একটি তৈরি পোশাকে এই বাড়তি ১৯ শতাংশ শুল্ক যোগ হয়ে মার্কিন বাজারে তার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ১.৯ ডলার। ফলে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের দাম বিদেশী বাজারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তার পক্ষে অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। এর ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রবল। কেন না বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৭৭ ভাগ হল গার্মেন্টিস শিল্পের অবদান। বাংলাদেশের গার্মেন্টিস শিল্প এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০ দশকের শুরুতে আন্তর্জাতিক বাজারে সুতিবস্ত্রজাত পোশাকের চাহিদা ও বয়নশিল্প বাংলাদেশে আপেক্ষিক সুবিধা থাকার সুবাদে গার্মেন্টিস শিল্প এখানে বিকশিত হতে শুরু করে। তারপর বিদেশের সাথে 'কোটা' ব্যবস্থার সুবিধাতে এই শিল্প বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সিংহভাগ দখল করে। বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ থেকে গার্মেন্টিস রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরিত হয়। সাম্প্রতিককালে 'কোটা' ব্যবস্থার অবলুপ্তি এবং 'টিফা'র জমানায় এই শিল্প তার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কতটা সচল রাখতে পারবে, জাতীয় অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব কিভাবে বজায় রাখবে তা আলোচনার দাবি রাখে।

গোরু কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিপন্ন ভারতীয় সমাজ ও মানবিক ঐতিহ্য

প্রশান্ত সেন

হরিয়ানার বল্লবগড়ে ট্রেনের মধ্যে জুনাইদ খান নামে ১৯ বছরের এক যুবককে নির্মমভাবে হত্যা অথবা অতি সম্প্রতি বিজেপি সহচর নীতীশের রাজত্বে খোদ বিহারের ভোজপুরে তথাকথিত গোরক্ষকদের তান্ডব, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের কিছু মানুষের

অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক গুন্ডাগিরির নিকৃষ্ট রূপকে প্রদর্শন করছে, যা জাতীয় লজ্জা। ঠিক একই সময় গোমাংসের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও বেওয়ারিশ গোরুর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পাঞ্জাবের 'গো-হসপিটালে' আনা নিরুপায় কৃষকদের, ধারালো অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত বয়স্ক গোরুগুলি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রতিমাসে কম করে ৬০-৭০ টি অত্যাচারিত পরিত্যক্ত গোরুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে ওই 'গো-হসপিটাল' [Indian Express 14.07.2017]। ইতিমধ্যেই কম করে ৩৫টি গোরু বিজেপি শাসিত হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে সরকারি খরচে তৈরি 'গোশালা'তে খাবার,জল ইত্যাদির অভাবে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। ছত্তিশগড়ের তিনটি গোশালাতে ১৭৩টি গোরুর মৃত্যু ঘটেছে একইভাবে। উভয়ক্ষেত্রেই বিজেপির গোরক্ষকদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ আনা হয়েছে। গো-মাংসের বিরোধিতার নামে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে গুন্ডাগিরি চলছে।

বল্লবগড়ের জি আর পি এস এই ধর্মান্ধদের তুষ্ট করতে মন্তব্য করেছেন 'এমন ঘটনাগুলি ঘটে থাকে।' নির্মম সত্য হল, বিজেপি,

এবং সঙ্ঘ পরিবারের নেতাদের কর্মসূচি হিসাবে তথাকথিত গো-রক্ষক গুন্ডারা মহম্মদ আখলাকের হত্যা দিয়ে গো-মাংস ভক্ষণকে দেশ বা 'জাতীয়তার বিরুদ্ধে' বলে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক মাধ্যমে বর্বরতা চালাচ্ছে, তা গোটা ভারতবর্ষকে বিষাক্ত করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানুষের খাদ্যাভাস, যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা, সাংস্কৃতিক বহুত্ব ইত্যাদিকে যেভাবে কষাঘাত করছে, তার পরিণতি ভয়ংকর। ধর্মীয় আগ্রাসন ও গণহত্যা শুধুমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশে নয় ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদিকেও জর্জরিত করে তুলছে, ভারতবর্ষও ওই একই ধর্মান্ধ চিন্তায় বিজেপি, আর এস এসের দৌলতে ওই পথে এগিয়ে চলেছে। একে ঠেকাতে না পারলে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এত কিছুর মধ্যে প্রকৃত অর্থে হিরন্ময় নীরবতার খ্যাতি অর্জন করেছেন আর এস এসের কর্মসূচির তাড়নায়।

ভারতবর্ষের কৃষি সংকটের ফলে জর্জরিত কৃষক সমাজ যখন ঋণের বোঝা সামলাতে না পেরে ক্রমাগত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, দিনে প্রায় কুড়ি একুশ জন করে পণের বলি হচ্ছেন; বেকারত্বের বোঝা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, বিমুদ্রাকরণের বা জি ডি পি বৃদ্ধির ফানুস ফেটে গেছে, এমন সময় বিজেপি শাসকরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে গোরু নিয়ে যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, হিংসা ও বিদ্বেষকে রাজনৈতিক কুউদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। গোরু রক্ষার নামে মানুষ খুন, আতঙ্ক সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি আজ বিজ্ঞান বিরোধী, ধর্মান্ধ ও একই সঙ্গে কর্পোরেটদের কাছে আত্মসমর্পণে সিদ্ধহস্ত বিজেপি রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে বর্বর তালিবান ও আই এস আই এস-এর ভারতীয় সংস্করণ হিসাবে। গোরু নামক প্রাণীটি রাজনৈতিক আঙিনায় হিন্দু ধর্মান্ধদের খেলার পুতুল হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, বিবেকান্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, বিবেকানন্দের কাছে গোরক্ষার দল যখন হাজির হন, বিবেকানন্দ তাঁদের প্রশ্ন করেন, দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য কী করেছেন? তাঁরা জানান মানুষের জন্য নয়, গোমাতার প্রাণরক্ষাই তাদের লক্ষ্য। বিবেকানন্দের জবাব— এমন মাতা না হলে এমন সন্তান হয়!

মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দুধর্মে বেদ যাহা বলে উপনিষদ সকল ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একমত নয়। আবার পুরাণের অনক শিক্ষা অনেকস্থলে অন্যরূপ। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম এর সঙ্গে নতুন নিয়মের অনেক পার্থক্য। প্রোটেস্ট্যান্ট মতের সঙ্গে মতানৈক্য রয়েছে ক্যাথলিক মতের। পবিত্র কোরানপন্থীদের মধ্যে শিয়া, সুন্নী, ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, খারীজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতামত সম্পূর্ণ এক নয়। আবার একই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত— হানাফী, শাফী ইত্যাদি চারী মজাহাবের মত বহুক্ষেত্রে এক নয়। এখন যদি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী সব পার্থক্য, ভিন্নতাকে মুছে ফেলতে চায় বা ইরাকের সিয়া সুন্নীদের মধ্যে চলতে থাকা গণহত্যার মধ্যে দিয়ে যুদ্ধংদেহী পথকে বেছে নিতে চায় তবে তা মানবতার পক্ষে ভয়ংকর।

হিন্দুধর্ম হল একটি জীবন ধারা 'সমস্ত মানুষের কাছে সবকিছু'। হিন্দুধর্মের বিশাল ক্যানভাসে রয়েছে এক সামাজিক অসম শ্রেণীভুক্ত যৌগিক পূজো পদ্ধতি, মতবাদ, বিশ্বাসসমূহ এবং প্রয়োগপদ্ধতি। এর যেমন কোনো একজন প্রতিষ্ঠাতা বা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংগঠিত যাজকবর্গ নেই তেমনি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মমতসমূহ বা সর্বজন স্বীকৃত শাস্ত্র। এর বিপরীতে রয়েছে বহুরকম চিন্তাধারা এবং অগুন্তি অতীন্দ্রিয়বাদী ও চিন্তাবিদদের হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। Hinduism কথাটাই ইউরোপিয়ানদের দেওয়া, যা এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্ম (ইসলাম নয়), সংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক বিশ্বাসসমূহের সম্মিলিত রূপকে বোঝায়। হিন্দুধর্মের বহুধা বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে আমরা ধর্মীয় সমন্বয়ের অতি মহান রূপটি পাই, কিন্তু কখনই একটি মাত্র ধর্মমত বিশ্বাস, একই ছাঁচে ফেলা কর্মপ্রণালী, একমাত্রিক দার্শনিক ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের একমাত্রিক পথের প্রস্তাবনা দেখি না। বহু রকমের দেবদেবী, আচার অনুষ্ঠান এমনকি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বিবাহের বহুবিধ রূপের স্বীকৃতি সমস্ত বিশ্বাসীদের স্বাধীনতা দিয়েছে যত মত তত পথের পরিক্রমায় এগিয়ে যেতে, যা কখনই আর এস এস বা তালিবানদের ফতোয়া মেনে বিশ্বাস ও কাজকর্মে বহুত্বের সহাবস্থানকে ধ্বংস করে না।

ভারতবর্ষে অন্য দেশ থেকে মুসলমান আগমনের অনেক আগে প্রথম বিজাতীয় আগন্তুক হল আর্যরা, যারা প্রাগার্যদের পরাভূত করলেও মিশ্র বিবাহে তাদের সাথে একাত্ম হয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে যবন, পারদ, পহ্লব, মুতিব, কুষাণ, শক, হুন ইত্যাদি বহু জনগোষ্ঠির আগমন ঘটে। ঋগ্বেদে কিন্তু অহিষ্ণুতার বাণী শোনা যায়নি। ঋগ্বেদে শেষ সুক্তে বলেছে 'প্রাচীনেরা যেমন ভোগ্যসমূহের সমবন্টন করেছিলেন, আমরাও যেন তেমন করতে পারি। বাক্যে ও চিত্তে আমরা যেন সমভাবাপন্ন হই। আমাদের মন্ত্র, আমাদের চলাফেরা যেন ঐক্যবোধযুক্ত হয়, আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধি যেন এদের সঙ্গে ঐক্যসংহত হয়। আমাদের কামনা, বাসনা, হৃদয় ও সত্তা যেন একীভূত হয়। আমরা যেন তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতায় সৌম্য হয়ে উঠতে পারি।' (সুকুমারী ভট্টাচার্য, বেদের গরল বেদের অমৃত, মুখপত্র চেতনা ৬৪)। এমন উদার প্রার্থনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তার বাস্তব রূপায়ণের জন্য আজন্ম নিয়োজিত থেকেছেন। বিধর্মী বা অন্যদেশ থেকে আগতদের প্রতি ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো নয়। আজকে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি, তার মধ্যেকার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবদের বিষাদ বিতর্ক বহু শতাব্দী ধরে চলেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মতগুলি ভারতীয় ঐতিহ্য হিসেবেই টিকে গেছে। যদিও একটি আধারের মধ্যে সবকিছুকে এককেন্দ্রিকতায় অন্তর্ভুক্তকরণের উগ্র প্রচেষ্টা কখনও সফল হয়নি। সহাবস্থান ও অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার মহানচিন্তা ও তার প্রয়োগই ভারতীয় ধর্মচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই ঐতিহ্যই আমাদের গর্বের বিষয়। এর বিপরীত বিজেপি, আর এস এস উগ্রধর্মান্ধতা, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো ভারতীয় ঐতিহ্য নয়।

সরকারি ফতোয়া :

গত ২৩ মে ২০১৭ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে [Prevention of Cruelty to animals

(Regulation of Livestock Markets) Rules, 2017] ফতোয়া জারি করা হয় যে চাষাবাদ বাদে অন্য কাজের জন্য গোরু, মোষ, বলদ, বাছুর, উট বাজার থেকে কেনা বা বেচা যাবে না। পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে এই ফতোয়া পশুবাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে চাইছে, যা সাংবিধানিক ক্ষমতার জোরে (Entry 28, List II) যা রাজ্যগুলির অধিকারের মধ্যে পড়ে। এই বিজ্ঞপ্তি যা সুপ্রিম কোর্ট স্থগিত রেখেছে, আসলে গোহত্যা বন্ধের হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচিকে আইনি রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা যা শুধুমাত্র গোমাংস নিষিদ্ধকরণে নয়, ধর্মীয় ফ্যাসীবাদের মডেলে গোটা দেশের মানুষের মধ্যে খাদ্যাভাসের ওপর নিয়ন্ত্রণের দিকে এক নিশ্চিত পদক্ষেপ। সরকার গোরুকে 'বিশেষ নাগরিক' মর্যাদা দিচ্ছে। আধার কার্ড দিচ্ছে। গোরক্ষকদের গুন্ডাগিরিতে সাধারণ মানুষ জীবন হারাচ্ছেন আর গুন্ডারা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তুলনীয় মর্যাদা পাচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গঠন করেছেন হিটলারের 'গেষ্টাপো'র অনুকরণে হিন্দু যুব বাহিনী, যারা গোরক্ষার নামে তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের ৫টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, যার রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত গোরু পাহারাদারি সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের নোটিশের উত্তর দেয়নি। আর এস এস তথা বিজেপির নেতৃত্বে একই সঙ্গে দেশজড়ে 'love jihad' এবং 'গোরক্ষার' নামে সামাজিক, রাজনৈতিক যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তাতে ধর্মভিত্তিক বিভাজন রেখাকে ঘৃণার আগুনে তীব্র করে নির্বাচনী বৈতরণী পারের পথ সহজ করে তোলা হলেও সমস্যা সঙ্কুল দেশের কোনো মঙ্গল হবে না।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু গোরক্ষকদের গুন্ডাগিরিকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়ে মন্তব্য করেছেন যে 'একজন তার পছন্দ মতন খাবার খেতে পারে কিন্তু এমন খাবারকে এড়িয়ে চলা উচিত, যা আমাদের সংবিধান নিষিদ্ধ করেছে।' ডাহা মিথ্য কথা। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতেই গোরক্ষার প্রচেষ্টা উল্লেখ করেছে যা কার্যকরী করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গোরু, বাছুর ইত্যাদি প্রাণীর সংরক্ষণের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের কোনো অংশেই গোমাংস ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়নি। ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী রাজনীতি কোথায় পৌঁছেছে তার নমুনা পাওয়া যায় আইনসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী নির্মলা সিতারমণের ধৃষ্টতার সীমা ছাড়ানো এই ঘোষণায়, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে যে মনন/ মানস কাজ করেছে, তা হল গোরক্ষার মতবাদ'! শ্রীমতী সিতারমণ উত্তরপ্রদেশের বেআইনি কসাইখানাগুলি বন্ধের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এমন ভয়ংকর তত্ত্ব হাজির করেন। গত এপ্রিল মাসে পেহলু খান নামে হরিয়ানার এক কৃষককে গোরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগ তুলে গোরক্ষকরা বর্বরভাবে হত্যা করে, ওই হত্যাকারীদের এখন তুলনা করা হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান সংগ্রামীদের সঙ্গে। 'গোরক্ষাবাদী দল'-এর নেত্রীর চাপের কাছে জয়পুর প্রশাসনকে বাধ্য করা হয় মিথ্যা অজুহাতে একজন মুসলিম হোটেল মালিকের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে। তার নেতৃত্বে তান্ডবের ছবি ভিডিয়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেখানে ওই মহিলা গোরক্ষক গুন্ডাদের প্রশংসা করে বলেছেন যে তারা, 'আজকের সময়ের ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদ।'এর চাইতে নির্মম রসিকতা আর কী হতে পারে? দাদরি থেকে লাতেহার, উনা থেকে আলওয়ার এবং জম্মু থেকে দিল্লি সর্বত্র মানবতার হত্যাকারীরা গুন্ডামি ও নরহত্যায় নেমেছে গোরু রক্ষার নামে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করতে। এর সঙ্গে সাধারণ হিন্দুজনগণের আর্থিক সাংস্কৃতিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই।

Prevention of Cruelty to Animals Acts, 1960 কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক বিভাজনের উদ্দেশ্যে। যদিও ওই আইন কখনই এমন কোনো নিষেধাজ্ঞার কথা বলেনি, যাতে কৃষি অঞ্চলের বাজারে গোরু বাছুর ইত্যাদি প্রাণীকে হত্যা করা যাবে না। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার ধুয়ো তুলে এই ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্টরা গোটা দেশে আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষ যে পশু হত্যা করে, তাও নিষিদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কিছু কিছু অঞ্চলে গোহত্যা মেনে নিলেও, বিজেপি সরকার আক্রমণ চালাচ্ছে মানুষের খাদ্য বাছাইয়ের অধিকারের ওপর। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে (যা কার্যকরী নয়) অথবা অন্য কোথাও ধর্মীয় কারণে গোরু বা অন্য প্রাণী রক্ষার কথা বলা হয়নি। নির্দেশমূলক নীতির গোহত্যার বিষয়টি কৃষি এবং পশুপালনের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা হয়েছে। এখানেও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সংবিধান গোহত্যার বিষয়টি রাজ্যগুলির হাতে ছেড়ে দিয়েছে এই বিবেচনায় যে, বিষয়টি প্রতিটি অঞ্চলের কৃষি, সামাজিক রীতিনীতি, খাদ্যের বিষয়ে মানুষের পছন্দ ইত্যাদি অবশ্যই অঞ্চল সাপেক্ষ। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৬ সালের সময়কার ইন্দিরা গান্ধির উদ্যোগে গঠিত গোহত্যার বিষয়টি নিয়ে যে কমিটি তৈরি হয়, তার মধ্যে আর এস এসের তাত্ত্বিক গুরু হেডগেওয়ার ছিলেন। ওই কমিটি দু'দশকের মধ্যে কোনো রিপোর্ট না জমা দেওয়ায় বাতিল হয়ে যায়।

বিজেপি-র গো-বিজ্ঞান :

রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি অসামান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, যা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছে অভাবনীয়। ওই শিক্ষামন্ত্রী বিজেপি সরকারের, যাঁর নাম বাসুদেব দেবনানী। গো-ভক্ত ওই মন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, গোরুই একমাত্র প্রাণী, যাহারা অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন নিঃসরণ করে, তাই অক্সিজেনের

অভাবে যখন মানুষ কষ্ট ভোগ করবে, তখন গোশালায় আশ্রয় নিলে তাদের শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি আসবে। অক্সিজেন সিলিন্ডার নয়, গোরুর গোয়ালঘরই শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার উপায়। এবার থেকে ভারতীয় ছাত্ররা পরীক্ষায় খাতার ওই শিক্ষামন্ত্রীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত মহাজ্ঞান যদি উত্তর হিসাবে লেখে, পরীক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষক ভিরমি না খেয়ে পারবেন না। বিজেপি মন্ত্রীর এই তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেবার জন্য বেছে নেন জয়পুরে অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশনের একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, যার শ্রোতারা ছিলেন ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্যরা। রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রীকে বাদ দিলে বিশ্বজুড়ে যে প্রাণী বিজ্ঞানীরা আছেন, তাঁদের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে একটি গরু কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও বছরে একশো কেজি মিথেন গ্যাস নিঃসরণ করে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের চাইতেও। গোরুর উপকারিতা মনুষ্য সমাজের কাছে এতটা বেশি যে, ওই ক্ষতিকারক দিকটি কম গুরুত্ব পায়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, বিজেপি মন্ত্রীরা বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের প্রচার করে ভারতবর্ষকে কোন ছেলে-ভোলানো কল্পনার জগতে বিচরণ করতে বলেছেন?

সম্প্রতি আর এস এস অনুগামী এক গৈরিক সন্ন্যাসী বিধান দিয়েছেন, প্রসূতি নিরামিষ আহার করলে এবং প্রসূতি অবস্থায় যৌন সহবাস না করলে সুসন্তান লাভ করতে পারবেন। এটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, অযৌক্তিক বিশ্বাস। উপনিষদও এই অবাস্তব প্রচারকে সমর্থন করে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হচ্ছে যে, প্রসূতি অবস্থায় যদি ঘৃত সহযোগে গোমাংস যুক্ত অন্ন আহার করা যায়, তবে সুপন্ডিত, সুযোগ্য সন্তান লাভ করা সম্ভব। এটাও এক ধরনের বিশ্বাস। মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোরক্ষকরা গোমাংস ভক্ষণের ওই পরামর্শের কারণে দাবি তুলবেন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সব গ্রন্থকে বাতিল অথবা পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে!

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে, ধর্মভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি করে, ভোটযুদ্ধ জেতার কৌশলে, বিজেপির জুড়ি মেলা ভার। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে, বিজেপির রথ গতি পায়। যেখানে ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা হত্যার পর কংগ্রেস যখন ৪০০-এর বেশি আসন পেয়ে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তখন বিজেপির ঝুলিতে মাত্র দু'জন সাংসদ। দাঙ্গা, ক্ষমতাসীন দলের ব্যর্থতা, আন্তর্জাতিক স্তরে ইসলামোফোবিয়া, কর্পোরেটদের সমর্থন ইত্যাদি বিজেপির পালে হাওয়া তোলে অভাবনীয়ভাবে। অঙ্কটা হল, যত বিদ্বেষ চালাও, যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে রক্তপাত ঘটাও, তত বেশি ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসবে, অন্তত কিছুকালের জন্য। ইতিহাসের আজকের স্তরে এসে সাম্প্রদায়িক দলটি আস্তে আস্তে ট্রাপিজের নয়া খেলায় যোগ্যতা দেখিয়েছে : মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতাকে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বলে চালানোর সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ফসলকে অতীতের বাতাবরণে হাজির করে কর্পোরেট দুনিয়ার কোলে সমর্পণ করেছে বেশ অনায়াসেই। আদবানী যেমন মোটর চালিত রথে চড়ে সাম্প্রদায়িকতার বার্তা দেশে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনই সাম্প্রদায়িক মোদী দেশাত্মবোধের নামে, ক্যাশলেস দেশ বানানোর লক্ষে, কর্পোরেট ও তাদের প্রযুক্তি না ব্যবহার করলে, তাদের ফোন বিক্রির দেশজোড়া ফেরি করার বিরোধিতা করলে দেশবিরোধীরা তকমা লাগাতে বদ্ধপরিকর।

হিন্দু শাস্ত্রে গোমাংস পাপ ছিল না :

সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক হয়ে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ধারাটি এদেশে যুগযুগ ধরে বহমান, তাতে গোহত্যা বা গোরক্ষার প্রশ্নটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উদ্ভূত সাংস্কৃতিক বিবর্তনের নিরিখে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের খাদ্য কী হবে তা, সব অঞ্চল বা সব সময় একই রকম হতে পারে না। মনুস্মৃতিতে (ch5 verse 30) বলা হয়েছে, ভক্ষণীয় প্রাণীর মাংস খাওয়া কখনই পাপ নয়, কারণ ভগবান একই সঙ্গে খাদ্য ও খাদক সৃষ্টি করেছেন। ঋগ্বেদ (10/85/13) বলেছে, 'ভগবান ইন্দ্র গোরু, বাছুর, ঘোড়া এবং মোষের মাংস খেতেন।' হিন্দু শাস্ত্রভুক্ত গ্রন্থগুলিতে গোমাংস খাওয়া ও খাওয়ানোর প্রচুর পরিমাণ উল্লেখ আছে। অপস্তব্য গৃহসূত্রে (1/3/10) পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, 'অতিথির আগমনে, পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এবং বিবাহ উপলক্ষে গোহত্যা কতে হবে।' আরো পরিস্কারভাবে বশিষ্ট ধর্মসূত্রে (11/34) বলা হয়েছে, 'যদি একজন ব্রাহ্মণ মাংস (meat) বা গোমাংস (beef) যা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রদান করা হয়, তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তবে তাঁর নরকে আশ্রয় হবে।' এমনই ভুরি ভুরি প্রমাণ পাই আশ্বলায়ন গৃহসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাল্মীকির রামায়ণ, চরক ও সুশ্রুত সংহিতা ইত্যাদিতে, যা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতের হিন্দুধর্মে গোমাংস ভক্ষণ ও গোহত্যা কোনোটাই অধার্মিক বলে বিবেচিত হত না।

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত 'The History and Culture of The Indian People'- এর দ্বিতীয় খন্ডতে মহাভারতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, রাজা রতিন্দ্র মাংস দানের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ২০০০ টি করে প্রাণী হত্যা করতেন এবং এছাড়া ২০০০টি গোরু জবাই করতেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে আসে, কেন বা কখন থেকে গোমাংস ভক্ষণের ধর্মীয় মোড়কে পাপের ধারণা এদেশের মাটিতে ডানা বাঁধতে শুরু করে।

যারা গোমাংস বন্ধের জন্য হুংকার দিচ্ছে, তারা কেরালা বা ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গোমাংস ভক্ষণকে কোনো পাপ বলে মনে করছে না আঞ্চলিক খাদ্যভাসের ঐতিহ্যের যুক্তি দিয়ে। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক তথা ঐতিহাসিক ডি.এন.ঝা তাঁর 'The Myth of the Holy Cow' গ্রন্থে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্য থেকে অসংখ্য তথ্য দিয়ে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সুদূর অতীতে গোরু কোনোরকম পবিত্র প্রাণী হিসেবে গণ্য হয়নি। অন্যান্য প্রাণীদের মত গোরুবলির প্রচলন ছিল বিভিন্ন যজ্ঞে, যার মধ্যে অশ্বমেধ এবং রাজসুয় প্রধান। বৈদিক দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া হত দুধ, মাখন, বার্লি, ষাঁড় বা ভেড়ার মাংস, তেমনি অগ্নিদেবের পছন্দের খাদ্য হিসেবে দেওয়া হত ঘোড়া, ষাঁড় এবং গোরুর মাংস। বৈদিক গ্রন্থগুলিতে ২৫০ রকমের প্রাণীর নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৫০ টিকে বলির

যোগ্য হিসেবে (যা অবশ্য মানুষেরও খাদ্য) গ্রাহ্য হয়েছিল। তৈত্রিরিয় ব্রাহ্মণ স্পষ্ট করে জানাচ্ছে 'অবশ্যই গোরু হল খাদ্য', যাজ্ঞবল্ক জোর দিয়ে জানান দেন যে, গোরুর নরম মাংস খাদ্য হিসেবে বিশেষভাবে উপযুক্ত। ব্রাহ্মণের ধারায় পৈতে অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে একজন স্নাতকের শরীরের উপরের অংশ গোরুর চামড়া দিয়ে আবৃত করার কথা অথবা মৃত মানুষের শবের অন্ত্যেষ্টিকরণের জন্য গোরুর চর্বি মাখানোর প্রথা বহু ঐতিহাসিক লিখে গেছেন। বৈদিক যুগের ব্যাপক যাগযজ্ঞ, বলি হিসেবে গোরু, বাছুর, ঘোড়া, মোষ ইত্যাদি ব্যাপক নিধন প্রথমত কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে ও দ্বিতীয়ত অহিংসবাদী গৌতমবুদ্ধ ও অন্যান্য বেদ বিরোধী ধর্মমতের সগৌরবে উত্থান হওয়ায় বাধা প্রাপ্ত হয়। রাজনারায়ণ বসুর রচনা 'Beef in Ancient India' গ্রন্থে আমরা জানতে পারি যে, ব্রাহ্মণদের গোমাংস ভক্ষণ এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, মুনি বিশ্বামিত্র অতিরিক্ত পরিমাণ ওই মাংস খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই গোমাংসকে অভিশাপ দিয়ে গোমাংস ভক্ষণকে পাপ বলে নিদান দেন। জৈনধর্ম কঠোরভাবে নিরামিষ ভোজনের পক্ষে থাকলেও বুদ্ধদেব কখনই সাধারণ মানুষদের গোরু ও অন্যান্য পশুর মাংস ভোজনের গোঁড়া বিরোধিতা করেননি। বৈদিক যুগের ধর্মীয় ধারা বৌদ্ধ যুগে ব্যাপক ধাক্কা খেলেও নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম প্রথমত আদি শংকরাচার্যের দার্শনিক উত্থান ও রাজা সমুদ্রগুপ্তের আমলে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ই জাত-পাত ও বর্ণব্যবস্থা,পবিত্র রক্তের ধারণা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি গোঁড়া ধর্মীয় সামাজিক বিধিসমূহ সমাজ জীবনে দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসতে শুরু করে। এরই সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সমাজের প্রয়োজনে গোহত্যার ওপর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করা হয়। সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এই প্রচেষ্টা আর্যাবর্তে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রধানত উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে গোহত্যা পাপের এক বোধ গড়ে উঠলেও বিশাল এই ভারতবর্ষে হিন্দু পরিচয় প্রদানকারী জনগণের এক বড় অংশের মধ্যে গোমাংস ভোজন কখনই ব্রাত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

গোরু রক্ষণের ক্ষমতা কি গরিব ভারতের আছে?

গোরু হত্যা না হয় জোর করে বন্ধ করা হবে, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় খাবার দিতে হবে। তথ্য বলছে যে, ৩০০ কেজি ওজনের একটা গোরুকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিদিন ৬ কেজি খড়, ৫ কেজি সবুজ ঘাস আর প্রায় দেড় কেজি বাদাম-সর্ষের খোল দিতে হবে। যার খরচ কম করে ৬০ টাকা। দুধ দিলে তো ভাল, না দিলে সেই গোরুকে খাবার যোগান দেবার ক্ষমতা কজনের? ২০১২ সালের গোসুমারিতে ২০ কোটির মধ্যে ১২ কোটি গোরু পাওয়া গিয়েছিল। ২০১৬ সালের সংখ্যাতত্ত্বের হিসেব বলছে গোরুর সংখ্যা তুলনায় বেড়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো অঞ্চলে, যেখানে যেখানে গো হত্যা নিষিদ্ধ নয়। গবাদি পশুদের মধ্যে হত্যা করা হয় প্রধানত ষাঁড়দের। কেবলমাত্র বয়স্ক, এছাড়া রোগগ্রস্ত এবং অনুৎপাদনশীল গোরুদেরই (মেয়ে) প্রধানত হত্যা করা হয়। ১২ বছরের পর ষাঁড় চাষের কাজ করতে পারে না। আধুনিক ট্রাক্টর, ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকাজ যত বাড়ছে ষাঁড়ের ব্যবহার তত কমছে। আবার ১২ বছরের পর চাষের কাজে ষাঁড় কর্মক্ষমতা হারায়। দুধ দেওয়া বা জোয়াল টানার কাজে গোরু বা ষাঁড়ের কর্মদক্ষতা ৮ থেকে ৯ বছরের বেশি নয়। অর্থাৎ তাদেরকে আরো অন্তত ৭ বছর লালন করতে হবে।

১৯১২ সালের হিসাবে ভারতে ১৯ কোটি দেশীয় ও হাইব্রিডের গোরুর দেখভাল করতে হবে, যাদের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেলেও বহু বছর ধরে, যদি কম করে দৈনিক ৫০ টাকা প্রতিটি ৩০০ কেজি ওজনের গোরুর পেছনে খরচ করতে হয়, তবে ১৯ কোটি গোরুর পেছনে অবসরকালীন খরচ ১ লক্ষ কোটি টাকা। এই বিশাল খরচ আর্থিক দিক দিয়ে ২০১৭-১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশাল সংখ্যক SC ও ST, সংখ্যালঘুদের মঙ্গলসাধন এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সম্মিলিত খরচের সমান। অক্ষম/অনুৎপাদনশীল গোরু রক্ষার জন্য ১.৫ লাখ হেক্টর জমি হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু খাবারের সরবরাহ ছাড়া যে পরিমাণ জল সরবারহ করতে হবে, তা ২০ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের চেয়েও বেশি। এরপর বিষাক্ত মিথেন গ্যাস নিস্ক্রমণের বিপদ তো আছেই।

ভারতে গোরু ও ষাঁড় পালন জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে চলে এসেছে, তাদের খেতের কাজে ব্যবহার, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং মাংস ভক্ষণের জন্য। গোমাংসের নিষিদ্ধকরণ কৃষিজীবীদের ভয়ংকর আর্থিক চাপের দিকে ঠেলে দেবে। অক্ষম বা অনুৎপাদক গোরু বা ষাঁড়কে কম করে ৭ বছর পালন করার খরচা, সংকটে দীর্ণ কৃষক সমাজ কী করে বহন করবে? ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে গোরু কেনাবেচা বা গোমাংস ভক্ষণের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষক সমাজ ও চামড়ার ব্যবসায়ীরা। এই কারণেই গেরুয়া ফেট্রি লাগানো তথাকথিত গোরক্ষদের দল গ্রামের মানুষের কাছে পরিগণিত হচ্ছে নেহাত গুন্ডা হিসাবে। ২০১৩-১৪ সালের হিসাবে মোষের সংখ্যা ছিল ১০ কোটি আর কসাইখানায় পাঠানো হয়েছে ১কোটিরও কম। ফলত শুধু চামড়া নয়, বহু হাজার কোটি টাকার মাংসের রপ্তানিও বন্ধ হল। গোরক্ষার ধর্মীয় রাজনৈতিক দাপটে অর্থনৈতিক দাপটে অর্থনীতি বিপর্যস্ত তো হচ্ছেই, এরপর গোরুর গলায় ইলেকট্রনিক টিকিটের জন্য যে বিশাল খরচ হবে, তার বোঝা আপামর জনগণকেই বহন করতে হবে।

গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীরা গোটা দেশে নিরামিষ ভোজনের পক্ষে এক তাত্ত্বিক আক্রমণ চালাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের থেকে বহু যোজন দূরে। সংবিধান রচনার সময় আম্বেদকর গোঁড়া হিন্দুদের গোরক্ষার নামে বজ্জাতি রুখতেই দ্ব্যর্থবোধকভাবে নির্দেশমূলক নীতিতে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন, যা আইনি মান্যতা দেয় না। ভারতীয় ইতিহাসে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে অনেক সময় কিছু মানুষ খাদ্যাভাস পাল্টেছেন, একটি ক্ষুদ্র অংশ নিরামিষাশী হয়েছেন। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ অংশটি আমিষভোজী থেকে গেছেন।

এটা বলা প্রয়োজন যে, সরকারি ওই ফতোয়ার জেরে একলাখ কোটি টাকার মাংস ও সংশ্লিষ্ট শিল্প, যা বহু লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান

নিশ্চিত করে, তা বড়সড় ধাক্কা খাবে। যত প্রাণী এদেশে জবাই হয়, তার মোটে ৩০ শতাংশ খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় (দেশের মধ্যে ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে)। আর বাকি ৭০ শতাংশ মৃত পশুর মৃতদেহ বিভিন্ন শিল্পের কাজে লাগে, যা থেকে তিন ডজনের বেশি দৈনিক ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গোরুর চামড়া দিয়ে জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি চর্মজাত দ্রব্য তৈরি হয়। গোরুর শিং, পায়ের ক্ষুর দিয়ে তৈরি হয় চিরুনি, কোটের বোতাম, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র। গোরুর হাড় থেকে তৈরি হয় বোনডাস্ট, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জৈবসার। এখানেই শেষ নয়, সাবান টুথপেস্ট, ক্যামেরার ফিল্ম, কুকুরের প্রতিষেধক টিকা, ইনসুলিন, হেপারিন, কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, বেহালার তার, কুড়মুড়ে বিস্কুট ইত্যাদি বহু প্রকারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্যের জন্য আমরা গোরু নামক প্রাণীটির কাছে ঋণী। আর এর জন্য বয়স্ক, অকমর্ণ্য গোহত্যা না করে উপায় নেই। প্রধানমন্ত্রী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে ২৫টি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মধ্যে চর্ম ও চর্মজাত পণ্য রয়েছে দ্বাদশ স্থানে। ২০১৫ সালে ভারতে চর্মজ উৎপাদন হয়েছিল ৭৯,৩৯২ কোটি টাকার। গোহত্যা বন্ধ করলে মোদী ঘোষিত ওই চর্মজ উৎপাদন ২০২০ সালে ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় কীভাবে সরকার নিয়ে যাবে?

কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে যে, বাজার থেকে গোরু কিনে কসাইখানায় সেটা বিক্রি করা যাবে না, কেবল গোরুর মালিকের কাছ থেকেই সেটা কিনে কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে জবাই করা যাবে। গভীরভাবে বিবেচনা করলে চালাকিটা বোঝা যাবে। যত গোরু কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তার শতকরা ৯০ শতাংশ আসে বাজার থেকে, গোরুর মালিকের কাছ থেকে মাত্র ১০ শতাংশ কসাইখানায় আনা হয়। এটা কদাচিৎ ঘটে, যখন কসাইখানার লোকেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গোরুর মালিক খুঁজে তারপর গোরু যোগাড় করে কসাইখানায় নিয়ে যায়।

আসলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিবাদের চাপে পড়ে বলেছেন যে, মানুষের খাদ্যাভাসে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না। এটা মিথ্যা কথা। আসলে নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে কখনও সরকারি আদেশ বা আইনের মোড়কে, কখনও বা হিংস্র বর্বরতা প্রদর্শন করে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এদেশে আদিবাসী, দলিত, মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ বা অসচ্ছল নাগরিকরা গোমাংস খান কম দামের জন্য। তথাকথিত গোরক্ষক গুন্ডারা, সাম্প্রদায়িক মোদী-অমিত শাহদের ধর্মান্ধ বানানোর

বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিয়ে গবাদি পশুর ব্যবসায়ীদের হয় হত্যা বা চাপ সৃষ্টি করে দলিত, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ হানছে, তাতে শুধু সাধারণ মানুষরা তাদের প্রোটিনজাতীয় খাদ্য থেকেই বঞ্চিত হবে না, চর্ম শিল্পের সাথে হাজার হাজার মানুষ কর্মহীনও হয়ে পড়বেন। স্মর্তব্য পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে চর্মজাত শিল্প সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে। গো-রক্ষক বা গোরু নিয়ে রাজনীতি আসলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ভয়াবহতার দিকে নিয়ে যাবে। সঙ্ঘ পরিবার বা তালিবানরা কোনো প্রশ্ন বা যুক্তির ধার ধারে না। কারণ প্রশ্ন বা যুক্তি তাদের কাছে হয় দেশ বা ইসলাম বিরোধী।

গোরু নিয়ে রাজনীতির পেছনে রয়েছে বহুত্বের ধারণা ধ্বংস করে আর এস এস/ বিজেপির ব্যাখ্যা করা হিন্দুত্বের সাঁড়াশি আক্রমণ। অন্য ধর্মের মানুষদের শুধু নয়, হিন্দুধর্মের বহুবিধ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী অথবা হিন্দুধর্মের থেকে বেরিয়ে নিজস্ব ধারার চর্চা ও প্রয়োগ এবং ভারতবর্ষের বিশাল আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব ধর্ম ও বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী একমাত্রিক হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা বল্গাহীন রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদ। [কৃতজ্ঞতা : 'টুয়ার্ড এ নিউ ডন']

মানবতাবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠাই ধর্মীয় বর্বরতা দূর করার একমাত্র পথ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

'সর্বধর্ম সমন্বয়' বা 'যত মত তত পথ' জাতীয় কিছু জনপ্রিয় প্রথার কথা আমরা জানি। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের অভাব যখন তীব্র হয়ে বৈরিতার পর্যায়ে চলে যায়, পারস্পরিক হানাহানি, হিংস্র আচরণ ইত্যাদি যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করে, তখন এ ধরনের নৈতিকতার প্রচার করে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। উগ্র হিংস্র ধর্মীয় বৈরিতাকে কিছুটা প্রশমিত করার ক্ষেত্রে তা কার্যকরী বলেও ভাবা হয়। কিন্তু তবু আমরা দেখি, পৃথিবীর নানা প্রান্তে, ভারতীয় উপমহাদেশ সহ নানা দেশ, নানা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মাঝেমধ্যেই ভয়াবহ বৈরি আচার আচরণ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চলে নির্বিচার নরহত্যা, নিপীড়ন, ধ্বংসলীলা।

তাই সত্যিই কি 'সর্বধর্মসমন্বয়' জাতীয় কথাবার্তা দিয়ে চূড়ান্তভাবে ধর্মীয় বৈরিতা দূর করা সম্ভব? বা আদৌ কি এই নৈতিক নির্দেশকে চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব?

বর্তমান বিশ্বে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর বিশ্বাস কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানিক নানা ধর্মে বিশ্বাস থেকে মুক্ত বলে নিজেদের মনে করেন, ওইভাবে ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু স্পষ্টতই এখনো সিংহভাগ পৃথিবীবাসী নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন, নিজেদের পরিচয় হিসেবে ওই ধর্মপরিচয় ব্যবহার করেন এবং ওই ধর্মের নানা আচারবিধি, নিয়ম কানুন ও নির্দেশনাবলী কমবেশি অনুসরণ করেন। প্রায় সব ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের সঙ্গে

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও একটি স্তর অবধি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মানসিকতা বজায় রেখে চলেন। তবু দেখা যায় বিশেষ বিশেষ সময়ে— যেমন ধর্মীয় দাঙ্গার সময় ওই সব মানুষদের একাংশ হঠাৎই উগ্র হিংস্র হয়ে ওঠেন এবং এতদিনকার প্রতিবেশি বন্ধুদের আক্রমণ ও নিপীড়ন করতে পিছুপা হননা। তাই সন্দেহ হয়, মানুষে মানুষে ধর্মবিশ্বাসের এমন বৈষম্য টিকিয়ে রেখে সত্যিই কি সব মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সত্যিকারের বাতাবরণ সৃষ্টি করা সম্ভব?

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য মানবসভ্যতার বড় একটি শত্রু। নিপীড়িত শোষিত মানুষ এই বৈষম্য একটি পর্যায়ে পৌঁছনোর পর নানা ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হন। শাসকশ্রেণি এই শ্রেণিবৈষম্য টিকিয়ে রেখেই নিজেদের এই আন্দোলনের আগুন থেকে বাঁচাতে, নানা ধরনের অর্থনৈতিক সামাজিক সুবিধা বা উৎকোচ দিয়ে, শোষিত মানুষের বিক্ষোভের আগুনে জল ঢালার চেষ্টা করেন। যখন তা হাতের বাইরে চলে যায়, তখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে বিক্ষুব্ধ মানুষ বা বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করার মরিয়া উদ্যোগ চালানো হয় এবং সাধারন মানুষদের থেকে ওই বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করতে তাদের জঙ্গী, রাষ্ট্রদ্রোহী, দেশদ্রোহী, শত্রু রাজ্যের চর, জাতীয়তা বিরোধী ইত্যাদি নানা নামে দেশে ব্যাপক প্রচারের কাজ করা হয়।

কবে পৃথিবী থেকে এই শ্রেণিবৈষম্য তথা অর্থনৈতিক সামাজিক বৈষম্য দূর হবে, তা কারোর জানা নেই। তবু শাসকশ্রেণির হাজারো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীর নানা প্রান্তে অসংখ্য বিপ্লবী এই লক্ষ্যে সংগ্রাম করে চলেছেন, আত্মবলিদান ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জনের জন্যও তাঁরা পিছপা হন না। এর ফলে মাঝে মাঝেই শাসকশ্রেণি তাদের ক্রমবর্ধমান নিপীড়নে রাশ টানতে বাধ্য হয়, জনগণকে নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে— তা ললিপপ হলেও, মানুষের দুর্দশা দমনের চেষ্টা করে, সাধারণ মানুষকে তাদের পাশে পাওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা চালায় (ভোটের মাধ্যমে যার প্রতিফলন ঘটে এবং মানুষের ভোটেই শাসক হওয়া সম্ভব হয়)। তাই প্রকৃতই শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দূর করা তথা বৈষম্য মুক্ত (অন্তত একটি উন্নত স্তর অবধি) মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কাজই এবং শাসকশ্রেণিকে উচ্ছেদ করার কাজই শোষিত মানুষের চরম লক্ষ্য— তা যত কষ্টকর, জটিল, দীর্ঘ মেয়াদি কাজ হোক না কেন। এক্ষুনি শ্রেণি বৈষম্য দূর হবে না ইত্যাদি ভেবে অন্তত সচেতন মানুষেরা— সংশয় কম হলেও, নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষয় করেন না। তাঁরা জানেন সমাজে এইভাবে শাসকশ্রেণির অস্তিত্ব থাকবে, চরম অর্থনৈতিক-সামাজিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখা হবে, আর পাশাপাশি আশা করা হবে, সমাজের সব মানুষ সুখে শান্তিতে থাকবে, বিশ্বশান্তি বিরাজ করবে,— তা হয়না, হওয়া সম্ভব নয়। এর অর্থ এও নয় যে, তাড়াহুড়ো করে গরিষ্ঠ সংখ্যক নিপীড়িত মানুষের প্রস্তুতি ও সচেতনতা ছাড়া, ব্যাপক হত্যালীলা ও ধ্বংসকার্য করে শাসকশ্রেণিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হবে, বা তা সফল হবে।

ধর্মবিশ্বাসের বৈষম্য ও ধর্মকে কেন্দ্র করে হানাহানির প্রসঙ্গে, কিছু সাধারণ বোধবুদ্ধি থেকে এই কথাগুলো বলা কারণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও অবস্থার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সৃষ্টি, টিকে থাকা, তাকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা জাগানো এসবের মিল অনেক আছে।

এখন থেকে প্রায় ৪০-৫০ হাজার বছর আগে, নিয়ানডার্থাল থেকে আধুনিক মানুষে (হোমো স্যাপিয়েনস্) রূপান্তরের একটি পর্যায়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষের মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস (যা পরবর্তী কালে ঈশ্বর, আল্লা, গড ইত্যাদি নানা পরিভাষায় পরিচিত হয়েছে) এবং মৃত্যু পরবর্তী প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাস (যা পরবর্তী আত্মা, সোল ইত্যাদি) পরিভাষায় পরিচিত হয়েছে। কল্পনার আকারে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়। তখন এবং তারো পরে আরো বেশ কিছু কাল মানুষের মধ্যে কোন শ্রেনিবৈষম্য ছিল না, (যে সময়টাকে অনেকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার সময় বলে চিহ্নিত করেন) এবং মানুষে মানুষে ওই ধরনের বিশ্বাসের মধ্যেও কোন বৈষম্য বা নিজেদের মধ্যে হানাহানি ছিল না। বিভিন্ন এলাকার মানুষ নিজেদের মত করে এই ধরনের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে, যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে নিজস্ব কিছু আচার অনুষ্ঠান, আচরণ বিধি, করণীয় বা অকরণীয় কাজ ইত্যাদির সৃষ্টি করে। কল্পনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এগুলিও ছিল কাল্পনিক, বস্তুত কিছু না করলেও মানুষের মানসিক তৃপ্তি ও আপাত নিরাপত্তার বোধ দেওয়ার কার্যকারিতা এদের ছিল —তাই টিকে ছিল এবং বিকশিত হয়েছিল। অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পূজা আচ্চা, নাচগান, বলিদান ইত্যাদি ইত্যাদি ধীরে ধীরে জন্ম নেয়, কল্পনা হলেও এগুলি ছিল অন্য জীবজন্তুর মত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ না করে, নিজের চেষ্টায় নিজের জীবনকে উন্নত সুরক্ষিত করার চেষ্টা। প্রাকৃতিক এত কাজ কে করছে তা জানার বা প্রাণচঞ্চল একজন মৃত্যুর পর কোথায় যায় তা বোঝার স্থূল আদিম বৈজ্ঞানিক বোধের পরিচয় ছিল তা। বিবর্তনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নত হতে থাকা মস্তিষ্কের জোরে কল্পনা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অসাধারণ মানবিক তৎপরতার পরিচয় ছিল এসব।

এই তৎপরতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ছিল অসাধারণ সব আবিস্কারের মধ্যেও কৃত্রিমভাবে আগুন জ্বালানোর কৌশল আয়ত্ত করা, চাকার আবিস্কার, কৃষিকাজ ও পশুপালনের পদ্ধতি, নদীতে বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদির মত যুগান্তকারি কাজ মানুষের জীবনযাত্রা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে দ্রুত উন্নত করতে থাকে। এই সব আবিষ্কারও কারোর কুক্ষিগত ছিল না, এককথায় সত্ত্ব পেটেন্ট নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে অন্যের উপর অধিপত্য করার মানসিকতাও ছিল না।

কিন্তু এসবের ফলেই মানুষের উৎপাদন যেমন বাড়ল, সম্পদ বৃদ্ধি পেল তেমনি সৃষ্টি হল উদ্বৃত্ত সম্পত্তি। শুরু হল নিজেদের গোষ্ঠীকে আরও সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত করার জন্য অন্যের এলাকা দখল, অন্যের সম্পদ ও দখল করার মত কাজ। তখনকার ওই ঈশ্বরবিশ্বাস, যাদুবিশ্বাস, মৃত্যুপরবর্তী প্রাণে বিশ্বাসকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য এক সময় এক একটি গোষ্ঠীতে সৃষ্টি হল পুরোহিত স্থানীয় বিশেষ ব্যক্তি— আদিমতম শাসকশ্রেণির প্রতিভূ। এদের বুদ্ধিসত্তা, কৌশলী কাজ করার ক্ষমতাও ছিল। একইভাবে গোষ্ঠীতে নেতৃত্ব দেওয়া, অন্যের এলাকা দখল করা ইত্যাদি কাজ ভালভাবে করার ক্ষমতাও বিশেষ কিছুজন আয়ত্ত করল। শতশত বছরের সামাজিক বিবর্তনে এরা হয়ে উঠল দলপতি রাজা। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হল শ্রেণিবিভক্ত সমাজ— ছয় হাজার থেকে দুই হাজার বছর আগে। গোড়াতে ওই পুরোহিত স্থানীয় ব্যক্তি আর এই নেতৃত্ব দায়ী ব্যক্তি ছিল একই মানুষ, কোথাও আলাদা হলেও বাস্তব কারণেই তাদের যৌথ মস্তিষ্ক গোষ্ঠীর সুরক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন ছিল।

ধর্মের প্রসঙ্গে তখনো ছিল আদিম ধর্মাবিশ্বাস। এখনকার মত হিন্দু, খৃস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ জাতীয় কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। শুরুতে ওই আদিম ঐশ্বরিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মানুষের উপর আধিপত্য করা বা শোষণ করা, হানাহানির সৃষ্টি করারও পরিমন্ডল ছিল না। কিন্তু রাজা-পুরোহিতের মত শাসকশ্রেণি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় কয়েক শত বছরের মধ্যেই শুরু হল অর্থনৈতিক শাসন-শোষণ যেমন, তেমনি ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক শাসন-শোষণও, —প্রথমটি ছিল উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কের মত ঘোরতর বাস্তব কর্মকান্ডের ফসল, দ্বিতীয়টি ছিল অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তি, যাদুর ক্ষমতা, মৃত্যু পরবর্তী প্রাণের মত নিছক কল্পনার ফসল।

কত হাজার বছর ধরে মানুষ এই কল্পনার অসারত্ব ও অলীকত্বকে অনুভব করতে পারেনি। ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া শাসকশ্রেণিও, এই কল্পনাকে ব্যবহার করেছে, সমাজে অন্যদের উপর আধিপত্য শাসন করার কাজে। এবং এ কাজ বাড়তে থাকে দ্রুত হারে। হাত ধরাধরি করে চলা পুরোহিত ও রাজন্যবর্গ সমাজের অন্য সবারই মত ওই ধরনের অলীক ঐশ্বরিক অলৌকিক কল্পনাগুলিকে নিছক কল্পনা বা মিথ্যা বলে অনুভবও করত না।

মানুষের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেতনতা মোটামুটি শুরু হয় মাত্র হাজার আড়াই বছর আগে। একদিকে ভারতীয় **গৌতম বুদ্ধ- মহাবীর জৈন**-এর মত মানুষেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হাজারো কাজকর্ম আর পশুবলি জাতীয় ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির কার্যকারিতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেন। আসলে তাঁরাও ছিলেন **জকুথকাত্যায়ন, আজিবিকাশ, চার্বাক গোষ্ঠী** ইত্যাদির মত সমসাময়িক নানা চিন্তাবিদের অন্যতম, -যাঁরাও এই ধরনের বিতর্ক করেন ও প্রশ্ন তোলেন। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গ্রীক সভ্যতাতেও **ত্রাস্টিকুবাস, অ্যাকিস্টর্কাস**-এর মত চিন্তাবিদেরাও এতদিনকার ঈশ্বরবিশ্বাস ও ওই অনুসারি ক্রিয়াকান্ডের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান। জন্ম হয়েছিল **সক্রেটিস**-এর মত চিন্তকদের। তাই মোটামুটি বল যায়, অলীক ঈশ্বরবিশ্বাস বা আস্তিকতার ইতিহাস বহু হাজার বছরের হলেও, নাস্কিকতার ইতিহাস মোটামুটি আড়াই হাজার বছরের, যখন পৃথিবীর কিছু মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কিত কল্পনার অসারত্ব, সেটি যে নিছক কল্পনা ওই অনুভব, ওই মিথ্যা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয়তা ও বিপদ, বেঁচে থাকার জন্য ওই ঈশ্বরবিশ্বাসকে আঁকড়ে রাখারও যে কোন প্রয়োজন নেই এই বোধ এবং সর্বোপরি ওই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ (শাসক শ্রেণি) কিভাবে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের উপর আধিপত্য ও শাসন-শোষণ চালায়, অত্যাচার চালায়— এসব সম্পর্কে তাত্ত্বিকভাবে সচেতন হন ও তা জন সমক্ষে রাখেন। ভারতীয় ভূখন্ডে যেমন গৌতমবুদ্ধ প্রমুখেরা বেদ ও চতুর্বর্ণ প্রথা তথা ব্রাহ্মণত্ব-কে অস্বীকার করে, নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত হন। এখনকার নাস্তিকত্বের মত সরাসরি ঈশ্বরের অনাস্তিত্বের কথা না বল্লেও পরোক্ষভাবে তাঁদের মতাদর্শ ছিল ঈশ্বর ও আত্মার কল্পনার বিরুদ্ধে। পরবর্তী কালে এই ধরনের নানা মতাদর্শ গড়ে ওঠে যেমন, **শূন্যবাদ, অ্যাগনস্টিসিজম বা অজ্ঞাতবাদ** থেকে শুরু করে **মার্কসীয় দর্শন**, মার্কসবাদে সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দিকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হয়। ওই দর্শনের অনিবার্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ঈশ্বর-আত্মা জাতীয় কল্পনা নিছক মানুষের কল্পনাই, শোধিত মানুষ ওই কল্পনাকে আঁকড়ে রেখে অলীক শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন ও শাসকশ্রেণি তাকে ব্যবহার করে শাসন শোষন নিপীড়নের পথ মসৃণ করে। তাই মার্কসীয় দর্শনে শিক্ষিত সব মানুষই নাস্তিক, কিন্তু পৃথিবীর সব নাস্তিকই মার্কসবাদী নন।

সত্যজিত রায়ের স্ত্রী বিজয়া রায় তাঁর স্মৃতিকথায় (আমাদের কথা) লিখেছিলেন, সত্যজিত রায় ছিলেন ''ঘোরতর নাস্তিক।'' কিন্তু এটি ফলাও করে প্রচার যেমন করেন নি, তেমনি তাঁর গুণমুগ্ধ অসংখ্য মানুষই তাঁর এই দিকটি সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নন। এবং তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না। এই ধরনের অসংখ্য মানুষই পৃথিবীতে আছেন।

নাস্তিকতারও অনিবার্য সিদ্ধান্ত, ওই অলীক ঈশ্বরবিশ্বাস কেন্দ্রিক নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুক্তি, এবং তারও অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এই ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বিভেদ, হানাহানি ও বৈরিতা থেকে মুক্তি। বিচ্ছিন্নভাবে নাস্তিক্যবাদী চিন্তার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, তা মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার কথা বলে না বা এই ব্যাপারে কোন দিশা দেখায় না।

অন্যদিকে শ্রেণি বৈষম্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, শাসকশ্রেণি ধর্মকে তার শাসন-শোষনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। **রাহুল সাংকীর্তায়ন** যেমন তাঁর '**ভোলগা থেকে গঙ্গা**' - য় দেখিয়েছিলেন কিভাবে যাজ্ঞবল্ক ও প্রবাহন (পুরোহিত ও নৃপতি) মানুষের সরল ঈশ্বর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ব্রহ্ম ও জন্মান্তরের কথাবার্তার সৃষ্টি ও প্রচার করে। 'ব্রহ্ম' যাকে চোখে দেখা যায় না, শোনা যায় না এবং যাকে উপলব্ধি করার সাধনায় যুগ যুগান্তর কেটে যাবে। জন্মান্তর অর্থাৎ পূর্বজন্মের পাপ বা পূণ্যের ফসল এই জন্মে পাওয়া যাবে— এমন গাঁজাখুরি চিন্তার সাহায্যে মানুষকে বোঝানো যায় যে, এই জন্মের দারিদ্র দুর্দশার জন্য শাসকশ্রেণি নয়, পূর্বজন্মের কাজকর্মই দায়ি; তাই এই জন্মে পূণ্য করলে, ঈশ্বরের আরাধনা করলে আর তার প্রতিভূ রাজা-পুরোহিতের সেবা করলে, এই জন্মে না হোক পরের জন্ম সুখে কাটবে। সঙ্গে স্বর্গ-নরক ইত্যাদি নানা হাবিজাবি। আর এরই ধারাবাহিকতায় এখনকার ভারতে সঙ্ঘ পরিবারের সংকীর্ণ **হিন্দুত্ববাদী** মতাদর্শের নেতৃত্বে চলছে চরম ইতিহাস বিরোধী, বিজ্ঞানবিরোধী, জনবিরোধী, কাজ করবার। নতুনভাবে শুরু হয়েছে হিন্দু মুসলিমের অবিশ্বাস, তথাকথিত কিছু হিন্দুর হাতে মুসলিম নিগ্রহ। ধর্মের এই ধরনের হিংস্র প্রয়োগের সমাধানে বলা হয় সর্বধর্মসমন্বয়, যত মত তত পথ, অন্য ধর্মের মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো, তথা শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থান— ইত্যাদি কথা। এমনকি সুন্দর গানও রচিত হয়েছে হিন্দু পরিবারের বা বিজেপি নেতার-পুত্রবধূ হোক এক মুসলিম মেয়ে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিভেদ আছে থাক, (যেহেতু তার বিরুদ্ধ লড়াই করাটা অনেক কঠিন এবং তার সাফল্য সময়সাপেক্ষ), শুধু নিজেদের মধ্যে নিখাদ বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা বজায় থাকে।

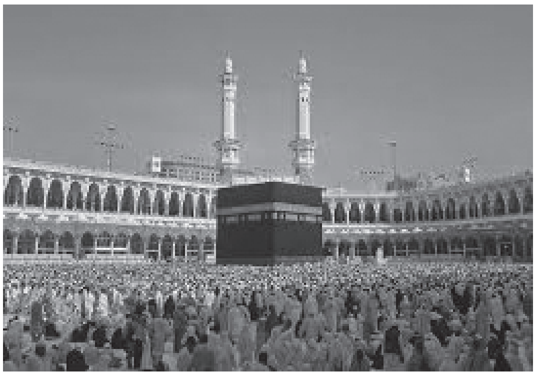

কিন্তু সত্যিই তা সম্ভব? বিশেষ একটি ধর্মে বিশ্বাস ও ওই অনুযায়ী নিজের ধর্মপরিচয় থাকার অর্থই হচ্ছে, অন্য ধর্মবিশ্বাসীর বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে বিভেদ ও নিজের স্বাতন্ত্র। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে, নিজের অস্তিত্ব সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি সমাজের অন্যদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকা, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা বজায় রাখা। কারণ অভিজ্ঞতায় জানা আছে যে, একা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই মানসিকতা ধর্মসৃষ্টির আগেও ছিল, পরেও আছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস মানুষের এই স্বাভাবিক ঐক্য ও বন্ধুত্বের মানসিকতাকে খর্বই করে। কৃত্রিম ওই ধর্মপরিচয় থাকার অর্থই হচ্ছে, আমি অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা এই ধরনের উপলব্ধি। একজন হিন্দু যতই মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে মিশুক, সে পুরোপুরি তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না, সে চেষ্টা করলেও সমাজ তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যে সমাজের অন্যতম ভিত্তিটাই ধর্মীয় বিভাজনের অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী, তাই জোর করে আসা প্রকাশ করতে হচ্ছে, হিন্দু পরিবারের মুসলিম পুত্রবধূ হোক; সেটি কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নয়।

তাই ধর্মীয় বিভেদ আর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কাজকর্ম চিন্তাভাবনার পার্থক্য থাকবে, অথচ আশা করা হবে সব ধর্মের সমন্বয় হবে বা 'যত মত তত পথ'- কে মেনে নিয়ে সব ধর্মের মানুষ একাত্ম হয়ে যাবে,— তা হয় না। বড়জোর তা যাতে হিংস্র উগ্র বাষ্প ধারণ না করে— এখনকার ভারতের হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত মানুষ যেমন গরুর মাংস খেলে, রাখলে বা নিয়ে গেলেই কাউকে (মুসলিমকে) হত্যা করতে দ্বিধা করছে না। ধর্মীয় বিভেদের বাস্তবতার বাস্তবার পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত এইভাবে উগ্র ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডের তীব্র বিরোধিতা অবশ্যই করা দরকার।

কিন্তু মনে রাখা দরকার এই ধরনের ধর্মীয় বিভাজন থাকলে ওই ধরনের উগ্র হিংস্র ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বীজটিও থেকেই যায়। আপাতভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করলেও, বিশেষ সময়ে তা উগ্র রূপ ধারণ করবেই যেমন ধর্মীয় দাঙ্গার সময় বা বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার সময় বা ইসলাম ও আল্লার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে নির্বিচার নরহত্যা করার সময়। এসব করে সাধারন মানুষই— কিন্তু তাদের উসকানি দিয়ে বিভ্রান্ত করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, তাদের মৌলবাদী বা শাসকশ্রেণির প্রতিভূ যেনামেই ডাকা হোক না কেন।

ভারতের মত দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আছেন বলেই, নানাধরনের প্রচার আর কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁদের ধর্মীয় আবেগকে জাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে ভোটের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষে শাসন ক্ষমতায় আসা সম্ভব হয়েছে। ভোটদাতা এই সব কোটি কোটি হিন্দু কখনোই মুসলিমদের নিজের একান্ত আপন ভাবে নি। রাজনৈতিকভাবে উগ্র ধর্মীয় কাজকর্ম না থাকার ফলে, আগে এভাবে হয়তো হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতায় আসতে পারে নি, একইভাবে মুসলিমরা হিন্দু বা খ্রিস্টানদেরও আপনজন বলে ভাবে নি। তবু বন্ধু হিসেবে পাশাপাশি থেকেছে। কিন্তু যখনি কিছু লোক (মৌলবাদী) 'ইসলাম বিপন্ন' বলে জিগির তুলেছে, অমনি তাদের কিছুজন এমনকি আত্ম বলিদান করেও কাফেরদের নির্বিচারে হত্যা করাকে আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য ও বেহেস্তে যাওয়ার উপায় বলে বিশ্বাস করেছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী কিছু মানুষ খ্রিস্টান মিশনারি ও তাঁর শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মারাকে কিংবা গরুর সন্তান হিসেবে অর্থাৎ (বাছুর হিসেবে) নিজেকে ভেবে গরুর জন্য মুসলিমদের হত্যা করাকেও নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বিশ্বাস করেছে। ফলে এইভাবে নরহত্যার জন্য কোন অপরাধবোধ তাদের জাগে না। তাই এসব করতে তাদের হাত কাঁপে না। নানা ধর্ম বিশ্বাস টিকে থাকলে এই মানসিকতা এক সময় ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে পরিস্থিতি বিশেষে উগ্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকেই।

কেউ নিজেকে প্রকৃতই হিন্দু হিসেবে ভাবে, গোমাংস ভক্ষণকে চরম ধর্মবিরোধী কাজ হিসেবে মনে করে ও ঘৃণা করে, সে গোমাংস ভৎক্ষণাকারীদের প্রতি ঘৃণা ও তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেই। অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা সুপ্তভাবে থাকে। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি বিশেষে তা উগ্রহিংসা আকার ধারণ করতেই পারে। কেউ নিজেকে মুসলিম হিসেবে ভাবে ও মূর্তি পূজাকে চরম অধর্মীয় ইসলামবিরোধী বাদ হিসেবে মনে করে। সেও মূর্তিপূজকদের থেকে দূরত্ব ও তাদের প্রতি ঘৃণা মনের মধ্যে পোষন করেই। অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা হিংস্র বর্বর আকার ধারণ করতেই পারে। এই সময় বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে কিছু উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা,কখনো বা রাজনৈতিক নেতারা তথা শাসক শ্রেণির প্রতিনিধিরা,— যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে দু'একজন ধর্মবিশ্বাসীও ব্যক্তিগতভাবে এই বর্বরতার শিকার হতে পারে।

সব মিলিয়ে মানুষে মানুষে মানুষেরই তৈরি করা কৃত্রিম ধর্মীয় বিভাজন ও নানা ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস টিকে থাকলে, ধর্মকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা, হিংস্র, বর্বর, নৃশংস কাজকর্মের সম্ভাবনা ও ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখা হয়ই। বিশেষ একটি ধর্মে নিজের পরিচয় দেব, একই সঙ্গে অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে একাত্ম হব তা হয়না। সর্বধর্ম সমন্বয়, যত মত তত পথ, সব বিশ্বাসীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলে ওই সব সম্ভাবনাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় বা বিলম্বিত ও প্রশমিত করার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু ওই ধামার নীচে বুনো বেড়াল তার দাঁত-নখ নিয়ে ঠিকই থেকে যায়। তাই পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে সত্যিকারের সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য কৃত্রিম ওই ধর্ম পরিচয় আর অর্বাচীন (বিগত বড় জোর দু' হাজার বছরে বানানো) সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিলোপ সাধনই চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত (পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করাও)। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিও তাই। কয়েক দশক আগেও যা ছিল না, বর্তমানে পৃথিবীর অন্তত এক পঞ্চমাংশ মানুষই নাস্তিক ও ধর্মপরিচয়মুক্ত। এঁদের 'ধর্ম' মানবতাবাদ এবং আগামী সুস্থ সুন্দর পৃথিবীবাসীর একমাত্র ধর্মই হবে এই মানবতাবাদ।

গোমাতার দূষণ

বিজ্ঞানীরা বলছেন গোরুর অন্ত্রে এমন কিছু জীবাণুর উপস্থিতি যার ক্রিয়ায় খাদ্য বিয়োজনের পর উদগারে ও বাতকর্মে যে বায়ু নিঃসরণ হয় তা মিথেন গ্যাসে ভরপুর। উষ্ণায়নে যার ক্ষতিকর ভূমিকা কার্বন ডাই অক্সাইডের অন্তত ২০ গুণ বেশী। আমেদাবাদের 'স্পেশ অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার' জানিয়েছে যে ভারতে গবাদি পশু থেকে প্রতি বছর এক কোটি ৬০ লক্ষ টন মিথেন নিঃসরণ হচ্ছে। ভারতের গবাদি পশুরা রুগ্ন ও পুষ্টিহীন। তাই মিথেন নিঃসরণের মাত্রাও বেশী।

গোমাতার পদাঘাত

বাড়ির সামনেই সকালে হাঁটতে বেরিয়ে গান্ধীনগরের বিজেপি সাংসদ লীলাধর বাগেলা গোরুর লাথি খেয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে ও পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে হাসপাতালের আই সি ইউতে ভর্তি হয়েছিলেন।

তেতো চিনি

ভারতে আখ চাষ হয় ৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিশেষত পশ্চিম উত্তর প্রদেশে ও মহারাষ্ট্রে। ৫৩০ টি চিনিকল রয়েছে। দেশে চিনির চাহিদা ২.৫০ কোটি টন, উৎপন্ন হয়েছে ৩.২০ কোটি টন। অর্থাৎ ৭০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত। গতবছর কেজি প্রতি চিনির বাজার দর ছিল ৩৭ টাকা, এ বছর ২৬ টাকা। কৃষকদের কাছে কলগুলির বকেয়া রয়েছে ২২,০০০ কোটি টাকা।

- ➤ এখনবধি আবিস্কৃত প্রাচীনতম জীবাশ্ম পাওয়া গেছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক হিলে ৪৪ হাজার লক্ষ বছর আগের। দ্বিতীয় প্রাচীনতম জীবাশ্ম পাওয়া গেল ভারতের ওড়িশার কেন্দুঝড় জেলার চামপুয়াতে, ৪২ হাজার লক্ষ বছর আগের। আবিষ্কর্তা তিন ভূতাত্বিক-মালয়েশিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত মজুমদার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিস্রোতা চৌধুরী এবং চীনের বেজিং-র আকাদেমী অফ জিওলজিকাল সায়েন্সের ইউশেং ওয়াঙ।
- ➤ এভারেস্টে উঠলেন অরুণাচলের লোয়ার দিবাং উপত্যকার চল্লিশোর্ধা চার সন্তানের জননী মুরি লিঙ্গি। অরুণাচলে তিনে মেনা ও আনসু জানসেনপারের (পাঁচ বার উঠেছেন) পর তিনি তৃতীয় এভারেস্ট বিজয়িনী।
- ➤ এপ্রিলে দার্জিলিঙের চিড়িয়াখানায় একটি তুষার চিতা চারটি এবং একটি বাঘিনী তিনটি শাবকের জন্ম দেন, যার মধ্যে একটি সাদা বাঘ। আবারও দার্জিলিঙ জু থেকে চারটি রেড পান্ডাকে সিঙ্গালিলা ও নেওড়ার জঙ্গলে পুনর্বাসন করা হল।
- ➤ উত্তরপ্রদেশে চাষের খরচ জোগাতে ও লাভজনক দাম পেতে আখ চাষীদের নাভিশ্বাস উঠছে। তার উপর চিনিকলগুলি কোটি কোটি টাকা বাকি রেখেছে। মোদী যোগী সরকার নীরব। বেশ কয়েকজন আখ চাষীর মৃত্যু হয়েছে। বাগপত সহ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসন ভবনের সামনে আখ চাষীরা ধর্নায় বসেছেন।

অর্থনীতি

অর্থনীতির হালহকিকৎ

■ **এন.পিএ-র পরিমাণ :**

ভারতে ব্যাঙ্কগুলিতে 'ননপারফরমিং অ্যাসেট' (এন.পি.এ)'-র পরিমাণ (সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত)

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক	বেসরকারি ব্যাঙ্ক
৭.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা	১.০২ লক্ষ কোটি টাকা

পি অ্যান্ড বি, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে নীরব মোদি সহ অন্যদের পাইয়ে দেওয়ার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি ও আত্মসাতের পর দেখা গেল বেসরকারি আই.সি.আই.সি.আই ব্যাঙ্কের এম.ডি.ও সি.ইও চন্দা কোছর তার আত্মীয় পরিজনদের অনেক টাকা পয়সা পাইয়ে দিয়েছেন।

■ **ফাইটার প্লেনের বরাত :**

ভারতীয় বায়ুসেনা ৬ এপ্রিল ২০১৮ তে গ্লোবাল টেন্ডার করেছে ১১০টি ফাইটার প্লেন কেনার জন্য। যার বাজেট ১.১৫ লক্ষ কোটি (২০ বিলিয়ন ডলার)।

■ **ঘুরপথে ওয়ালমার্টের বাজার দখল :**

অন লাইনে পণ্য ক্রয় ও সরবারহের প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া ভারতীয় সংস্থা 'ফ্লিপকার্ট'কে ১৬০০ কোটি ডলারে কিনে (৭৭% মালিকানা) মার্কিন বহুজাতিক দানব 'ওয়ালমার্ট' ভারতীয় ই-কমার্স বাজারের একচেটিয়া অধিকার নেওয়ার দিকে এগিয়ে গেল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী 'আমাজন' কে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিল। এর বিরুদ্ধে সঙ্ঘ পরিবারের 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ', বিভিন্ন কৃষক সংগঠন বিক্ষোভ দেখাল।

■ **সর্ষে চাষে লোকসান :**

পশ্চিমবঙ্গে গত মরশুমে সরকারি উৎসাহদানে অনেক কৃষক ক্ষেতে সর্ষে বোনেন এবং হাইব্রিড বীজ, অনুকূল শীত প্রভৃতির কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত সর্ষের মানও ভাল হয়। কিন্তু সরকারি আধিকারিক-আড়ৎদার- ফোড়ে চক্রের চক্রান্তে সর্ষের দাম কমিয়ে ফেলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রকের হিসাবে সর্ষের মূল্য কুইন্টাল পিছু ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু চাষি পাছে ২,৮০০ থেকে ৩,২০০। কেন্দ্রের 'নাবার্ড' ও কৃষিমন্ত্রক এবং রাজ্যের কৃষি ও বাজার দপ্তর নিস্ক্রিয়।

■ **জি এস টিতে রাজ্যের লাভ :**

কেন্দ্রের জিএসটি চালু নিয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবচাইতে বেশি বিরোধিতা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যদিও সবার আগে সই করেছিল পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার। অন্যদিকে সিপিআই(এম) নেতা অসীম দাশগুপ্ত জি এস টি সূচনা উৎসবের অন্যতম অতিথি ছিলেন। অথচ বছর না ঘুরতেই সেন্ট্রাল জিএসটি কমিশনারেটের তথ্য বলছে যে জিএসটি লাগুতে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিকভাবে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে। পণ্য ও পরিষেবা খাতে কর আদায় বেড়েছে ১৪%।

■ **পেট্রল, ডিজেলের দাম বৃদ্ধিতে আখেরে রাজ্যের লাভ :**

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামবৃদ্ধি কারণে রাষ্ট্রীয় তেল সংস্থাগুলির কর্ণাটক নির্বাচনের পর থেকেই ক্রমাগত দামবৃদ্ধি পেট্রোপণ্য, পরিবহণ সহ সমস্ত শিল্পে, পণ্য পরিবহণে অতিরিক্ত খরচের কারণে নাভিঃশ্বাস উঠেছে। কংগ্রেস সহ বিরোধিরা প্রতিবাদ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এককাঠি উপরে মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তার দল পথে নেমে প্রতিদিন প্রতিবাদ করছে। অথচ অঙ্কের হিসাব বলছে তেলের দাম যত বাড়বে, রাজ্যের আখেরে তত লাভ। কোন দেশেই তেলের উপর এত কর ও সেস নেই। ভারতে প্রতি লিটার তেলে কর দিতে হয় ৪২%। এর উপর কেন্দ্র ও রাজ্যের সেস। রাজ্য প্রতি লিটার তেলে ২০% বিক্রয় কর লাভ করে। তার উপর প্রতিলিটার তেলে এক টাকা সেস। গত আর্থিক বছরে এভাবে রাজ্যের ভাঁড়ারে এসেছে ৬,০০০ কোটি টাকা। ওই বছরে এই মূল্য বৃদ্ধির ফলেই আয় বেড়েছে ২,০০০ কোটি টাকা।

■ **তেলের মহাযুদ্ধ :**

ওপেক ও রাশিয়ার তেলের দামবৃদ্ধি, ভেনেজুয়েলার অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে অপরিশোধিত তেলের সঙ্কট দাম বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্ব জ্বালানীর বাজারে ও অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণ আনতে ও বাজার ধরতে আসরে নেমেছেন বড় দাদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জুন থেকেই তারা প্রতিদিন ২৩ লক্ষ ব্যারেল তেল রফতানি করছে, যার ১৩ লক্ষই এশিয়া মহাদেশে। যার অন্যতম ক্রেতা চীন। ভারতও সুযোগ খুঁজছে। তাই দেখে রাশিয়া এবং সৌদি আরবসহ ওপেক দেশগুলি উৎপাদন ও রফতানি বাড়াতে চলেছে।

■ **এক লাফে পাঁচগুণ বেতন বৃদ্ধি :**

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ন্যায্য ডি.এ. পাচ্ছেন না। ওদিকে সরকারের মন্ত্রীদের সহকারীদের, যারা সব শাসক দলের কর্মী, মাসিক বেতন এক লাফে বেড়ে দুহাজার থেকে দশ হাজার টাকা হয়ে গেল।

■ **টাকার গতিমুখ :**

দেশের মানুষের টাকায় পুষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি আত্মসাৎ করে নিচ্ছে পুঁজিপতিরা সরকারি সহযোগিতায়। ৭০ দশকে শুরু এখন আম্বানী-মোদি জমানায় তা চূড়ান্ত অবস্থায়। আম্বানী-আদানী-ললিত মোদী-বিজয় মাল্যরা ব্যাঙ্কগুলিকে রক্তশূন্য করে দেবার পর কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭-এ সাধারণ মানুষের থেকে আয় করা ২ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কগুলিতে তোলেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নীরব মোদিরা আবার ব্যাঙ্কগুলিকে নিঃস্ব করে দেন। জানুয়ারী-মার্চ '১৮ ভারতের ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের লোকসান প্রায় ৫৩ হাজার কোটি টাকা। লোকসানের শীর্ষে নীরবখ্যাত পি এন বি। ১৩, ৪১৭ কোটি টাকা।

■ **রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলির সলিল সমাধি :**

দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করার কর্মসূচী চলছিল। মোদি শাসনে তা শেষ পর্যায়ে। লোকসানে চলা সংস্থা ৮২, ইউপিএ ও এনডিএ শাসনের শেষ এক দশকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মোট ক্ষতি ২.২৩ লক্ষ কোটি টাকা। বিলগ্নীকরণের জন্য চিহ্নিত ২৪টি সংস্থা। এর মধ্যে এই.পি.সি.এল. কে কিনে নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ও.এন.জি.সি.। এয়ার ইন্ডিয়া সহ বাকিদের বিক্রির জন্য সরকার খদ্দের খুঁজছে।

■ **বিদেশী লগ্নীতে টান :**

বিদেশি লগ্নী ২০১৬ তে ৪,৪০০ কোটি ডলার, ২০১৭ তে ৪,০০০ কোটি ডলার। নতুন প্রকল্পে লগ্নী ২০১৪-১৫ তে ৬,১০০ থেকে কমে ২০১৬-'১৭ তে ২,৬০০ কোটি ডলার। বিদেশীমুখী লগ্নী ২০১৬ তে ৫৭০ থেকে ২০১৭ তে ১,১৩০ কোটি ডলার।

■ **আখ চাষের জাঁতাকল :**

ব্রাজিলের পর বিশ্বে সর্বোচ্চ চিনি উৎপাদনকারী দেশ ভারত। বছরে প্রয়োজন ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন, উৎপাদন হয় ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। চিনি কলগুলিতে আখ চাষীদের বকেয়া টাকা ২২ হাজার কোটি, উত্তরপ্রদেশেই ১৩,০০০ কোটি, কেন্দ্র সরকার ৭,০০০ কোটি টাকা এর জন্য বরাদ্দ করেছেন। সরকার মাঝারি দানার চিনির দর ঠিক করেছেন সর্বনিম্ন ২৯ টাকা/কিগ্রা। প্রতি কিগ্রা চিনি প্রস্তুত করতে লাগে ৩৬ টাকা।

■ **মার্কিন চীন বাণিজ্য যুদ্ধ :**

ট্রাম্প ঘোষণা করলেন ৮১৮টি পণ্যে ২৫% হারে ৫,০০০ কোটি ডলারের চীনা পণ্যের উপর শুল্ক বসানো। চীনের পালটা ৬৫৯টি মার্কিন পণ্যে২৫% হারে ৫,০০০ কোটি ডলারের শুল্ক বসানো।

■ **ভারতীয় বাজারে চীনা প্লাবন :**

২০১৩-'১৪ ইউ পি এ জমানায় ভারতের আমদানিতে চীনের ভাগ ছিল ১১.৬%, ২০১৭-'১৮-র মোদি জমানায় তা ১৬.৬% ।আমদানি বৃদ্ধির হার ২০%। বাণিজ্য ঘাটতি ৪.২৮ লক্ষ টাকা। মোট বাণিজ্য ঘাটতির ৪০%। চীনা পণ্যের সঙ্গে টক্কর না দিতে পেরে মুখ থুবড়ে পড়ছে ওষুধ, বস্ত্র, সৌরবিদ্যুৎ, খেলনা প্রভৃতি শিল্প। দীপাবলির আলো থেকে দোলের রঙে ব্যবহৃত হচ্ছে চীনা পণ্য। ভারতের জীবনদায়ী ওষুধের, সোলার প্যানেলের এবং খেলনার ৯০%, সাইকেলের ৫৮% চীনের দখলে। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ. কোরিয়ার নামী ব্র্যান্ডের কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স ও ইলেকট্রিকাল পণ্য ও যন্ত্রপাতি বেশিরভাগই তৈরী চীনা কারখানায়।

■ **অর্থনীতির হিসেবনিকেষ :**

প্রবল দারিদ্র্য, বৈষম্য ও পশ্চাদপরতা থাকলেও সামগ্রিক অর্থনীতি হিসাবে ভারত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই তৃতীয় স্থানে। অথচ ভারতের ২০ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছেন। নীতি আয়োগ প্রদত্ত পরিসংখ্যান বলছে ভারতের গত চার আর্থিক বছরের গড় 'পার ক্যাপিটা নেট ন্যাশনাল ইনকাম (এন.এন.আই)' ৭৯,৮৮২ টাকা। গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি ৮.৬%। জনপ্রতি রোজগারে আই.এম.এফ.-র ২০০টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ১২৬। ভারতের অতি দরিদ্র, রোজগার প্রতিদিন ১.৯ ডলারের নীচে, মানুষের সংখ্যা ৭.৩ কোটি। গোয়ার জনপ্রতি জি.এস.ডি.পি. ৪,৬৬,৬৩২ টাকা; দিল্লীর ৩,৬৫, ৮৮২ টাকা; উত্তর প্রদেশের ৭২,৩০০ টাকা এবং বিহারের ৬৩,২০০ টাকা। ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্ব ব্যাঙ্ক নির্ধারিত ভারতের জনপ্রতি জিডিপি ৭,০৫৬ ডলার। ফ্রান্সের সামগ্রিক অর্থনীতি ভারতের চাইতে হ্রস্ব হলেও জন প্রতি জিডিপি ৪২,৭৭৯ ডলার, ব্রিটেনের ৪৩, ৮৭৭ ডলার; চীনের ১৬, ৮০৭ ডলার।

■ **মোদি সরকারের কয়েকটি বড় কীর্তি :**

সর্দার প্যাটেলের মূর্তি (খরচ আনুমানিক ৩০০০ কোটি টাকা), শিবাজীর মূর্তি (৩৫০০ কোটি টাকা), কুম্ভ মেলা (৪২০০ কোটি টাকা), চার বছরের সরকারি প্রচার (৪,৩০০ কোটি টাকা), বিভিন্ন দেশে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের বুকে জড়িয়ে ধরতে (১৫০০ কোটি টাকা)।

[সংকলন : বুনো রামনাথ]

➤ রসগোল্লা, মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া প্রভৃতির পর পুরুলিয়ার ছৌনাচের মুখোস, কুশমন্ডির কাঠের মুখোস, পটচিত্র, ডোকরাশিল্প এবং মাদুরকাঠি জি.আই.ট্যাগ পেল।

➤ দক্ষিণ অন্ধ্রের গভীর নালামালা জঙ্গলে বসবাসরত চেনচু জনবসতিদের গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে অভিনব বাইক অ্যাম্বুলেন্স চালু হল।

➤ অসম মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণে কোন আদিবাসী-উপজাতি প্রার্থীকে না নেওয়ার 'জাতীয় ঐক্য মঞ্চ', 'অল তিয়া স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন', কোচ-রাজবংশী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন', 'ছুতিয়া জাতি সম্মেলন' প্রভৃতি নয়টি সংগঠন ২৭ এপ্রিল অসম বন্ধ পালন করল।

➤ ঝাড়খন্ডের রাঁচী, খুন্তী, সেরাইকেলা-খারসয়ান, সিমদেগা জেলায় ১০০-র বেশি আদিবাসী গ্রাম জোসেফ পূর্তির নেতৃত্বে পাতালগাদি আন্দোলন শুরু করে স্বশাসিত হতে চাইছে।

➤ আফ্রিকার অন্যতম প্রাণ ভোমরা লেক ভিক্টোরিয়া, যা কেনিয়া, উগান্ডা ও তানজানিয়া তিনটি দেশ জুড়ে রয়েছে, বুরুন্ডি ও রুয়াণ্ডা অবধি যার অববাহিকা বিস্তৃত, ক্রমশ শুকিয়ে যেতে চলেছে। ইতিমধ্যে এর জীব বৈচিত্র্যের মধ্যে ৬৫১ টি অবলুপ্তির পথে। লেকের জলাভূমি দখল করে কৃষি কাজ ও ঘর বাড়ি নির্মাণ, অতিরিক্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে মাছধরা, বাঁধ দেওয়া, কেমিক্যাল ছড়ানো; বর্জ্য ফেলা; লেক সংলগ্ন অধিবাসীদের পরিবেশ, বর্জ্য প্রভৃতি নিয়ে অসচেতনতা এর কারণ।

➤ 'দ্য নিউ ইন্টারন্যাশনাল কনজারভেশন ফর নেচার'-র তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ৮০ লক্ষ টন প্লাস্টিক সমুদ্রে জমা হয়ে ১৫ কোটি টন মজুত হয়ে গেছে।

কবিতা

মিছিলের মাঝপথে

মুঁকুল বসু

পবিত্রতার মিছিলে অনেকের সাথে
আমিও ছিলাম যৌবনের কুঞ্জবন ছেড়ে;
মৌসুমী বায়ু যেমন সাগরের মাতৃ স্নেহে থেকে
অবিরল প্রেম ঝরায় মৃত্তিকায়, অভিসারের আগে।

এখন আমাকে তোমরা ফিরে যাবার রাস্তা করে দাও......
বুঝে গেছি, অনেকেই কিছু-কিছু পারে, সবকিছু কেউই পারে না।
যেমন রাবন স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে পারেনি,
ফ্রয়েডিও তত্ত্বও মনভূমির সব রহস্য খুঁজে পায় না।

আবার স্বয়ং ভগবানও অগুনতি ব্যর্থতার স্তুপ।
তিনিও পৃথিবীর সব প্রেমিক-প্রেমিকাকে ফুলশয্যা দিতে পারেননি।
পারেননি, সব নারীকে জননী জন্মের আনন্দ দিতে;
জ্বালাতে পারেননি, বৃক্ষলতায় গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুলের রং-মশাল।

সেই কবে থেকে তারা সব, পথ হেঁটে চলেছে....
শুধু বংশ পরম্পরা নয়, বীজ থেকে অঙ্কুরের উদ্গম নয়,
একজনের হাত থেকে চলমানতার পতাকা ঝরে পড়ে গেলে,
আরেকজন তুলে নিয়ে মিছিলের সামনে আসে শক্ত হাতে।

।। এ দেশ তোমার নয়.....।।

উৎসর্গ : আসিফা বানো

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

মভ রঙ নয়। জাফরান ফুলের মত গাঢ়।
বাদামি চুলের ঢালে রূপোলি নদীর
ফিতে বেঁধে উড়ে যাচ্ছো মেঘে মেঘে,
এ দেশ তোমার নয়।
আজন্ম বেড়ে ওঠা পাহাড়ের কোল,
ফিকে রঙ মাশরুমে উড়ে আসা মৌমাছি
ঘোড়ার কেশরে রোদেলা দিনের এই খেলা
এসব তোমার নয়!
দ্যাখো,শান্ত হ্রদের জল থেকে আবার উঠেছে চাঁদ
চিনারের পাতায় পাতায় জল জোছনা মেখে
গুর্জররা গাইছে দুশো বছর আগেকার গান
পাহাড়ি তরাই থেকে টিংলিং ঘন্টা বাজিয়ে
নেমে আসছে ভেড়ার পাল
গ্রীষ্মের ছায়ায় ছায়ায় চারণভূমিতে ওরা পেতে দিচ্ছে
সময়ের আরো দূর তারাদের রূপো-নীল জমিন
মাটি কি কেনা যায় মরা আত্মার দামে?
খেলছো যে এতদিন এই ঢের!
জেনে রাখো, এ দেশ তোমার নয়!
ছাইরঙ এ এক অদ্ভুত দেশ, পশুরা দুপায়ে হাঁটে।
ঘাড় কামড়ে টেনে নেয় বোবা-কালা পাথরের থানে
কাঁচা মাংস খাওয়ার আগে ও পরে
শুধু জয়ধ্বনি দাও, অন্ধ দেবতার,
ছুটে আসবে পশুরাই
উলু দিয়ে এয়োতিরা দুধ ঢেলে দেবে
ধর্মের রঙে ঢেকে অশোকের চাকা, মিছিল সাজাবে
পুরুষ দন্ড ঢেকে জ্যান্ত পশুরা হেঁটে যাবে মিছিলে
দেখতে পাবে না ওরা, জাফরান-তারা ফুলে
ঢেকে আছে ঘুমোনোর মাটি... তোমার দেশ....

একটি গানের কথা

রেহান কৌশিক

মেডিকেলের অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের

বিচ্ছু ছেলেরা অনশনে আছে, মুখে কিছু বলছে না
বড্ডো বেয়াড়া ওই ছেলেগুলো মুখে কিছু তুলছে না...
তবে কি শাসক, কারফিউ হবে, মোতায়েন হবে সেনা!

এরকম সব না-বলা কথারা কতটা বিপজ্জনক
কেউ না জানুক, জানে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের শাসক...
চুপ-করে থাকা মুহূর্তরাই একদিন দাবানল
আর জ্বলে ওঠা আগুনের শিখা স্বপ্নের সম্বল...
জানে জানে জানে, সব্বাই জানে, চোখ তবু খুলছে না
ছেলেরাও আছে অনড় দাবিতে মুখে কিছু তুলছে না...

কারা বলে আজ বসন্ত নেই, আঁধারের মরসুম?
শিমুলে-পলাশে জেগে আছে পথ, রাত্রিরা নির্ঘুম...
চির-স্পর্ধার বারুদ এখনো মাখেনি বৃষ্টি-জল
স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছে তাই বেয়াড়া ছেলের দল!
এ সময় আজ নাছোড়বান্দা, সন্ত্রাসে ভাঙবে না
প্রতিরোধ গ'ড়ে পেরোবেই পথ, কিছুতেই থামবে না...

সাহিত্য

পোষ্য

মূলরচনা : ভগবতী চরণ বর্মা   ভাষান্তর : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

[**ভগবতী চরণ বর্মা** (জন্ম : ৩০-০৮-১৯০৩ এবং মৃত্যু : ০৫-১০-১৯৮১) হিন্দী সাহিত্য জগতের এক প্রসিদ্ধ সাহিত্যকার। মূলত: ঔপন্যাসিক হলেও কবিতা, গীত ও ছোটগল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। সাম্যবাদে বিশ্বাসী বর্মাজীর লিখনশৈলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তার নির্মম ব্যঙ্গ। ১৯৬১ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও ১৯৭১ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।
ভাষান্তরিত গল্পটি 'কুঁয়র সাহেব কী কুত্তা' নামে রাজপাল প্রকাশন দ্বারা প্রকাশিত ''মেরীপ্রিয় বহুনিয়াঁ'' গ্রন্থে সংকলিত। গল্পটি বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী 'রাজপাল এ্যান্ড সন্স' প্রকাশন সংস্থা দিল্লীর কাছে ঋণী।]

আপনার কাছে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ থাকে তাহলে আপনি মনের আনন্দে কুকুর পুষতে পারেন। আর শুধু কুকুরই বা কেন? ঘোড়া, হাতি, বাঘ, ভালুক সব কিছুই পুষতে পারেন। এমন কি আপনি মনে করলে আপনার বাড়িটাকে চিড়িয়াখানায় পরিণত করলেই বা আপত্তি করছে কে? এসব কথা বলার কারণ আর কিছুই নয়। একদিন হরিশ আমার কাছে কুমার সাহেবের কুকুর পোষা নিয়ে অত্যন্ত বাজে বাজে মন্তব্য করছিল। এমনিতেই ওর গান্ধীবাদ থেকে শুরু করে সাম্যবাদ, মার্কসবাদ যে কোনও কিছু নিয়েই লম্বা লম্বা ভাষণ আমার বিরক্তির কারণ হতো। তার তুলনায় নিরঞ্জনকে আমার বেশ ভাল লাগতো। নিরঞ্জন ছিল এক রোগা-পাতলা নব্য যুবক। তিন বছর হলো বি.এ.পাস করেছে কিন্তু এখনো একটা চাকরি জোটাতে পারেনি। তবে সদা হাস্যমুখ এবং পরিশ্রম করতে ভালবাসে। কুমার সাহেবের কুকুর পোষা নিয়ে ওর বক্তব্যটা বরং ভাল লেগেছিল। একদিন সে কুমার সাহেবের হাভেলি ফেরৎ আমার এখানে এসেছিল। সম্ভবতঃ কোনও একটা চাকরির সন্ধানে সে সেখানে গিয়েছিল। যাহোক আমাকে খুব গম্ভীরভাবে বলেছিল 'পরমেশ্বরীদা, খুব ভাল হতো ভগবান যদি আমাকে কুমার সাহেবের কুকুর করে পৃথিবীতে পাঠাতেন। আজকের এই পরিস্থিতিতে কম সে কম তিনবেলা ভাল ভাল খাবার তো পেতাম। মাংস, দুধ, বিস্কুট আরো কত কী! এছাড়া আমার দেখাশোনা করার জন্য একটা চাকর একজন ডাক্তার। আর সবচেয়ে বড় কথা সময়ে-অসময়ে কুমার সাহেব ও কুমার সাহেবের মুখ চেটেও দিতে পারতাম।'

নিরঞ্জনের শেষ কথাটা অবশ্য খুব একটা ভাল লাগেনি। হয়তো তার জন্য ওকে কিছু বলতামও। কিন্তু ওর বয়েসের কথা ভেবে ওকে কিছু আর বলিনি। সত্যি কুমার সাহেব খুব সৌখিন আর প্রচুর অর্থের মালিক। মস্ত জমিদারি আছে দেহাত প্রদেশে। ওনার সবচেয়ে প্রিয় শখ হলো কুকুর পোষা। একটু ধেড়ে ইঁদুরের সাইজ থেকে একেবারে গাধার আকৃতির নানারকম কুকুর কুমার সাহেবের হাভেলিতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। আর তাদের কতরকমের রং, লোম-লেজের বাহার, আর চেহারা। এ কথা বলাই বাহুল্য যে মানুষের মধ্যে যেমন বিলেতের লোকেদের গুরুত্ব। একইরকমভাবে পে-ডিগ্রিতে কুকুরদের মধ্যেও বিলায়তি অর্থাৎ সাগরপাড়ের সারমেয় কুলের অত্যন্ত মর্যাদা। একথা জেনে অবাক হবেন না যে কুমার সাহেবের প্রায় খান চল্লিশেক কুকুর আছে যার সবকটিই জাহাজে করে সাতসমুদ্র পার করে হিন্দুস্থানের মাটিকে পবিত্র করতে এসেছে। গড়ে এদের প্রত্যেকটির দাম ন্যূনতম পক্ষে হাজার টাকা।

কুমার সাহেব আমার একজন ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং স্বভাবটিও বড় ভাল। উনি প্রায়ই আমাকে ওনার হাভেলিতে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করতেন। এমন ধনী লোকের নিমন্ত্রণ পেতে কার না ভাল লাগে! তাই নিমন্ত্রণ পেয়ে সেবার আর দোনামোনা করিনি। সে সময় ওনার হাভেলির অতিথিশালায় আরও কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন। এক-একজনের এক-এক রকম মেজাজ। এক-এক রকম চাল-চলন। কেউ কেউ নিজেরাই বেশ বড়লোক। কেউ আবার সেই সব ধনী ব্যক্তিদের কৃপাপ্রার্থী। সারাদিন ধরে গাল-গল্প, তাস-দাবা-পাশা খেলা। সকালে বিকেলে একটু হাঁটাহাঁটি সব মিলিয়ে দারুণ মজায় সময় কাটছিল।

একদিন বিকালে চা খেতে খেতে কুকুর নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। কুমার সাহেবকে যদিও কবি বলা যায় না। তবুও ওনার মনের মধ্যে যে একটা কবিত্বভাব মাঝে মাঝে উঁকি দেয় তা অস্বীকার করা যায়না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উনি বলে উঠলেন 'ওঃ কুকুরের মত প্রভুভক্ত জীব সংসারে আর নেই। পশু হলেও এ বিষয়ে মানুষের অনেক উঁচুতে তার স্থান।' এই বলে তিনি তার প্রিয় অ্যালসেশিয়ানটির মাথায় হাত রাখলেন। কুকুরদের মধ্যে এটি আবার তার সবচেয়ে প্রিয়। সবসময় তার কাছে কাছে থাকে। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন 'সত্যি বলতে কী ককুরের মত বন্ধুও এই বিশ্ব-সংসারে আর কেউ নেই। যখন সর্বত্র ফাঁকা ফাঁকা লাগে, যখন এমন একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যায়না তাকে আপনি আপনার নিজের লোক বলে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারেন। সেই সময় এই একটি জীবকেই আপনি আপনার পাশটিতে দেখতে পাবেন। যে সবসময় আপনাকে অনুসরণ করে চলেছে। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে সংসারে সবচেয়ে স্বার্থপর এবং নেমকহারাম যদি কেউ হয় তো সে মানুষ।''

কুমার সাহেবের বলা শেষ হতেই তার পাশের ভদ্রজন বলে উঠলেন 'সে আর বলতে! একথা একেবারেই সত্যি যে মানুষের

চেয়ে বড় বেইমান পৃথিবীতে আর নেই। আপনি তার যত ভালই করুন না। কেন সে নেমকহারামি করবেই। বছরখানেক আগের কথা, আমি সেদিন একটু বেশীই পান করে ফেলেছিলাম। তা মাঝে মাঝেই আমার একটু বেশী হয়ে যায়। তা শুনুন মশাইরা এই একটু বেশী পান করার প্রভাবে আমি আমার পরিচারকের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে ওকে একটু মারধোর করে ফেলি। না বন্দুক-তলোয়ার দিয়ে তো আর মারিনি। হাত দিয়েই মেরেছিলাম। তো তাতেই ব্যাটা একটু জখম হয়ে গেল। যাহোক আমি তাকে ওষুধ-বিষুধ দিয়ে সুস্থও করে দিলাম। আর সে ব্যাটা কংগ্রেসদের কথায় আমার নামে থানায় রিপোর্ট লেখাতে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি বলে দিয়েছিলাম যে থানায় যাওয়ার কথা যদি আমার কানে আসে তাহলে শরীর থেকে একেবারে চামড়া ছাড়িয়ে নেব। তারপর ও ব্যাটার আর থানায় যাওয়ার সাহস হয়নি। ভাবুন একবার ব্যাটা আমার নুন খেয়ে জীবনধারণ করে আর আমি একটু গায়ে হাত দিয়েছি বলে—,তাও কখন না যখন আমি একটু বেশী পান করে ফেলি। তাতেই এই! তুই একবার অন্নদাতার কথা ভাবলি না? কি আর করা যাবে। বেইমানি করাইতো মানুষের চরিত্র।'

দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জন তার কাহিনী শুরু করল। 'আরে ভাই আমি তো বুঝেই পাইনা যে এদের নিয়ে কী করা যায়? যত দিন যাচ্ছে মানুষের নেমকহারামি বেড়েই চলেছে। এই একমাসও হয়নি আমার মহালে কমিশনার সাহেব পরিদর্শনে এসেছিলেন। সে সময় খেত বোনার কাজ পুরোদমে চলছিল। প্রচুর লোক বেগারী খাটছিল। তা কমিশনার সাহেবের মত একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি আমার অতিথি। তার খাতিরদারিতো করতে হবেই। আশপাশের সব জমিদাররাই রয়েছে। তো সেই খাতিরদারিতে আমি এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে বেগারদের সেদিনের খোরাকি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তা এ আর এমন কথা কী? একদিন না খেলে কেউ মরে যায় না। তা সাহস দেখুন এদের! পরদিন কমিশনার সাহেব যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন এক শালা বেগারখাটা ক্ষেত থেকে বুক চিতিয়ে উঠে এসে আমার নামে তার কাছে নালিশ করে দিল। নেহাৎ আমার নামে নালিশ তাই কমিশনার সাহেব তা শুনেও শুনলেন না। চলে গেলেন নাহলে...'

বাকিরা উৎকণ্ঠার সাথে জিজ্ঞাসা করল 'তারপর কী হল?'

'কি আর হবে, কমিশনার সাহেব চলে যাবার পর আমার লোকেরা তাকে এমন ধোলাই দিয়েছিল যে শালা পনের দিন খাটিয়া ছেড়ে উঠতেই পারেনি। তারপর দিয়েছি শালাকে জমি থেকে বেদখল করে। এখন কোথাও বাটি হাতে ভিক্ষা করে হয়তো। বলে হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি। বাকিরাও সে হাসিতে সঙ্গ দিল।

'এতক্ষণ অমি কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম কিন্তু এবার আর থাকতে পারলাম না। বেশ একটু ঝাঁঝের সাথেই বলে উঠলাম। একেবারে সঠিক বলেছেন। মানুষই সবচেয়ে বড় বেইমান। নাহলে সারাদিন মুখবুঁজে যে পরিচারক প্রভুর সেবা করে যায় তাকে বিনা অপরাধে মার খেতে হবে কেন? সারাদিন রোদ-জল গায়ে মেখে মালিকের জমিতে ধান বুনে খোরাকিটুকুও পাবে না কেন? অথচ মুস্কিল আশান সব মানুষকেই একইরকম হাড়-মাংস দিয়েছেন, বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়েছেন। তার চোখে সব মানুষই সমান। কিন্তু সব মানুষ সমান অধিকার পায়নি। আপনারা যখন নিজেদের ঐ পরিচারক বা বেগারখাটার জায়গায় বসাবেন একমাত্র তখনই ওদের ব্যথা-যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবেন। নচেৎ নয়। কিন্তু আপনারা তো তা করবেন না। সামান্য করুনা পাওয়ার জন্য আপনারা আপনাদের থেকে বড়লোকেদের গোলামী আর মোসাহেবী করবেন। সত্যি কথা বলতে কী কেবল আপনাদের জন্যই সাম্যবাদের প্রচার,...'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কুমার সাহেব আমার কনুইতে ঠেলা দিয়ে ইশারায় আমায় থামিয়ে দিলেন। তার মধ্যেই আমার কথার প্রভাবে চা-চক্রে নিরবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিতে লাগল।

পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য কুমারসাহেব বলে উঠলেন 'পরমেশ্বরীবাবু আসলে আমাদের কথার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে ধাতস্থ করতে পারেন নি। তাই উচিৎ-অনুচিৎ কিছু কথা বলে ফেলেছেন। ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না।'

এরপর আর কোনও কথা হলোনা। চা-চক্রের মেজাজটাই বিগড়ে গেল। তারপর এক এক করে সকলে উঠে পড়ল। তারপর এদিক ওদিক সব ছড়িয়ে পড়ল। আমি কেবল সেখানে একা বসে ভাবতে লাগলাম।

আমি যে কী ভাবছিলাম, বহুক্ষণ ধরে ভাবছিলাম, এসব কিছুই আমার আর খেয়াল নেই। সম্বিত ফেরে কুমার সাহেবের ডাকে। তিনি এসে কোমল স্বরে আমায় বললেন, 'পরমেশ্বরীবাবু আমি জানি যে আমার বন্ধুদের দৃষ্টিকোণকে আপনি সমর্থন করেন না। এমনকি আমিও ওদের এই ভাবনার সাথে একমত নই। কিন্তু এটাও তো আপনাকে ভাবতে হবে যে হাসি-খুশির একটা সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করে কী আপনি ভাল কাজ করেছেন। আপনি কী মনে করেন যে আপনার এই কথায় তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হবে?'

কুমার সাহেবের কথায় যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল তা আমি অনুভব করলাম। আর তার কারণে আমি খুব লজ্জিতও হলাম। আমি তার হাত ধরে তার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিলাম। বললাম 'আসলে একজন বিবেক সম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমি সেই মুহূর্তে ওদের কথার প্রতিবাদ না করে পারিনি।'

সামান্য হেসে কুমার সাহেব বললেন, 'আপনি একদম ঠিক বলেছেন পরমেশ্বরীবাবু। মানুষ তো মানুষই। তাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার। আপনার রাগের যথেষ্ট কারণও আছে।' এরপর তিনি আমার হাত ধরে উঠিয়ে বললেন 'চলুন কিছুটা সময় বাইরে থেকে ঘুরে আসি।'

আশ্বিনের বিকেল। আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। কুমার সাহেব সাম্যবাদী সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। ওনার পিছন পিছন দুজন সিপাই বন্দুক নিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। ওনার প্রিয় অ্যালসেশিয়ান রাস্তায় আগে আগে চলছিল। সূর্যাস্তের গোধূলি আলোয় তখন এক দারুণ ভাল লাগার অনুভূতি।

ক্ষেত, বাগান পার করে আমরা গ্রামের পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করলাম। দেহাতী লোকজন কুমার সাহেবকে দেখেই জোড় হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে 'অন্নদাতা প্রণাম', বলে যাচ্ছিল। কুমার সাহেব আমার

সাথে কথা বলতে বলতে এমন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর যেন কোনও অস্তিত্বই নেই।

বেশ কিছুটা যাবার পর আমরা ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু কুমার সাহেবের অ্যালসেশিয়ান যে এর মধ্যে কোথায় আমাদের সঙ্গ ছাড়া হয়েছে আমরা কেউই তা খেয়াল করিনি। পল্লীতে ফিরে এসে আমরা এক বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী হলাম।

....

মেকু ধোপা, কুমার সাহেবের জমিদারির এক প্রজা। থাকে গ্রামের এক প্রান্তে। বয়সের ভারে না হলেও দারিদ্রতার কারণে হয়তো বা তার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। চেহারা এমন যে শরীরের ভিতরের সবকটা হাড় বাইরে থেকেই গোনা যায়। গ্রামের লোক সবসময় তাকে খালি একটা কৌপিন পরা অবস্থাতেই দেখে আসছে।

মেকুর পরিবার খুব ছোট নয়। তার বউ, চার সন্তান আর একটা গাধা। গাধার কিন্তু যত্ন-আত্তি কম ছিলনা। বরং তাদের পরিবারে গাধাটাই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর ছিল। নিজের আর একটি সন্তানের মতই সে মেকুর ভালবাসা পেত। ওই গাধা ছিল তার জীবিকার সহায়কও। রোজ সকালে বোঁচকা পিঠে বেরিয়ে পড়ত। আবার বিকেলে বোঁচকা নিয়ে ঘরে ফিরতো। সারাদিন নদী ঘাটের আশে পাশে চড়ে বেড়াত।

সে দিন ঘাট থেকে ফিরে মেকু গাধাটাকে খোঁটায় বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু কিভাবে যেন সে বাঁধন খুলে ফেলেছিল। হয়তো ভেবেছিল একটু সান্ধ্য ভ্রমণ করে নিলে হয়।

সেই কুমার সাহেবের অ্যালসেশিয়ানের নজর পড়েছিল ওর ওপর। একটা গাধার সান্ধ্য ভ্রমণের অধিকার নিয়ে সে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল বা সেটাকে সে ভাল চোখে দেখেনি। তাই সে গাধাটাকে তাড়া করে। গাধাটা ভয়ের চোটে বেশ খানিকটা দৌড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়তো বা তার মনে হয়েছিল এ পৃথিবীতে সকলেরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অধিকার আছে। তার ঈশ্বর যেন তাকে বলল পালিয়ে বেড়ানো ভীরুতার লক্ষণ। আর পৃথিবীতে ভীরুদের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।

গাধা খুব সোজা-সাপটা ভাবেই অ্যালসেশিয়ানের মুখোমুখি হল। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ভাবখানা এমন ছিল 'আরে মিঞা, আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি যে তুমি আমায় তাড়া করছ। আসলে তোমার উদ্দেশ্যটা কী? তোমার মালিক কুমার সাহেব আছেন তো আছেন। আমার ঈশ্বর তোমার মালিকের ভয়ে মোটেই ভীত নন।'

গাধা তো গাধাই। কিন্তু সিধে জার্মান থেকে আসা কুমার সাহেবের কুকুরের তার ব্যবহার মোটেই ভাল লাগল না। সে কুকুর হলেও জাতে সাহেব। পরাধীন দেশের ওপর অধিকারের গর্বে সে গর্বিত। অহিংসা মন্ত্রে তার এতটুকু বিশ্বাস নেই। গাধার এই অহিংস সত্যাগ্রহের প্রভাব তার ওপর এমন ভাবে পড়ল যেমন কংগ্রেসী ভলেন্টিয়ারদের রাস্তার ওপর বসে পড়ার প্রভাব লাঠিচার্জ করতে উদ্যত পুলিশের ওপর পড়ে। সে গাধার ওপর প্রবল বেগে চড়াও হল। কিন্তু গাধা তো পরাধীন দেশের মানুষ নয়। তার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আত্মরক্ষার কারণে সক্রিয় হয়ে উঠল। অ্যালসেশিয়ানের দাঁত তার শরীরে বেঁধবার আগেই নিখুঁত নিশানায় তার পিছনের ডান পা পূর্ণ শক্তিতে তড়িৎগতিতে কুকুরের মাথায় বাড়ি মারল। একটা তীব্র আর্তনাদ করে কুকুর ধরাশায়ী হল। তার মুখের ভিতর থেকে রক্তের ধারা বেড়িয়ে এল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। গ্রামের লোকজন সব দৌড়ে এল। ভীড় থেকে আওয়াজ উঠল 'আরে মেকুর গাধা কুমার সাহেবের কুকুরকে মেরে ফেলেছে।'

আমরা যখন ঘটনাস্থলে এসে পৌছলাম, দেখি অ্যালসেশিয়ান তার শেষ শ্বাস নিতে শুরু করেছে। কুমার সাহেবের গলা শুনে সে শেষবারের মত একবার কাতর দৃষ্টিকে কুমার সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল তারপর একবার আর্তনাদ করে চিরতরে চোখ বুঁজল।

গাধাটা সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। নিজের বিজয়গর্বে দীপ্ত ভঙ্গিতে। কুমার সাহেব লোকেদের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনলেন (যদিও কেউই ঘটনাটা চাক্ষুস করেনি) তারপর সিপাইদের কাছ থেকে একটা বন্দুক নিয়ে তার নলটা গাধার মাথায় ঠেকিয়ে দুটো গুলিই দেগে দিলেন। সাথে সাথে গাধাটা পড়ে গেল। কুকুরের দেহটা তুলে নিয়ে গেল লোকেরা। ধীরে ধীরে ভীড় হালকা হয়ে গেল। আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে।

সেখানেই আমি মেকুকে দেখতে পেলাম। শুধু মেকু কেন? ওর পরিবারের সকলকেই। গাধার মৃত্যুর খবর পেয়ে সব দৌড়তে দৌড়তে এসে মৃত গাধাকে ঘিরে কাঁদতে লাগল। মেকু গাধাটাকে জড়িয়ে এতটাই কাঁদছিল যে মনে হয়েছিল সত্যিই কোনও নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে। ওদের কান্নার আওয়াজে আশপাশের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল।

আমি ফিরে এলাম। কুমার সাহেব তার অতিথিদের নিয়ে বাগানে আসর বসিয়েছেন। বিলাতি মদের পেয়ালার ঠুন-ঠান আওয়াজ হচ্ছে। কুমার সাহেব তার সেক্রেটারিকে ডিকটেশান দিচ্ছিলেন 'পনের শো টাকা পাঠাচ্ছি। যে অ্যালসেশিয়ানের ছবি আপনি পাঠিয়েছিলেন সেটা কিনে অবিলম্বে আমাকে পাঠাবেন....।'

সে রাত্রে মেকুর ঝুপড়িতে উনান জ্বলেনি। সপরিবারে উপবাস। জানিনা তারপরে কি হয়েছিল।

- ➤ শতাব্দীর পর শতাব্দী বর্তমান কেরলের দক্ষিণ ওয়াইনাদ ফরেস্ট ডিভিশনের মেপ্পাদি পারাপ্পানপারার পাহাড় জঙ্গলে বাস করত তথাকথিত সভ্যজগতকে এড়িয়ে চলা চোলা নাইকার জনজাতিরা। এবারের প্রবল বর্ষণে পাহাড় ভেঙ্গে ধ্বস নেমে তাদের বসতি অঞ্চল নষ্ট হওয়ায় জনজাতির শেষ ৪২ জন সদস্য সমতলে নেমে এলেন।
- ➤ কোন কিছুতে কাজ না হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তর ভোটভার বা খসখস ঘাস লাগিয়ে দেখছেন মাটির ধারণ ক্ষমতা বাড়ছে, নদীর পাড় ভেঙ্গে জল সহজে ঢুকতে পারছে না।
- ➤ কৃষিঋণ মকুব, ন্যূনতম মজুরি, শ্রম আইন সংশোধন, ফসলের নাভজনক দাম, জমির পাট্টা প্রভৃতির দাবিতে লাখো কৃষক বামপন্থীদের নেতৃত্বে ভরিয়ে দিল দিল্লীর রাজপথ ৫ সেপ্টেম্বর।

ভ্রমণ

পুরুচোখে দেখা পুরুলিয়া

পার্থময় চট্টোপাধ্যায়

ধরিত্রীর বুক থেকে শীতের শেষ স্পর্শটাকে বেঁছে নিতে বড়ন্তি এসেছিলাম। বসন্তের শেষ কটা দিন প্রকৃতির রূপটাকে চেটে পুটে নিতে আমাদের এই মনপলাশ গ্রামে আসা। রাত ১১.০৫ নাগাদ হাওড়া থেকে আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে ভোর ৫টা নাগাদ আদ্রা স্টেশন এ পৌঁছলাম। সকালটা তখন ছিল রাত্রের অন্ধকারে ঢাকা। ৫.৩০ নাগাদ স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম ৪টে অটো, ১০টার মতো টাটা সুমো আর বোলেরো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। বড়ন্তি ৪০ কিমি হবে আদ্রা থেকে, সময় লাগে ১.৩০ থেকে ২ঘন্টা। ভাড়া অটোয় ৩৫০ টাকা আর গাড়ি ১২০০ টাকা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ১০ মিনিট পরে আমাদের সারথি কার্তিক মাহাতো একটা চায়ের দোকানে চায়ের বিরতি দিলো। চা পান করার পরে আবার চলা শুরু হলো। হালকা ঠান্ডা তারসাথে একটা নরম আলো। চলেছি জয়চন্ডী মায়ের দর্শনে।

আমি পলাশের বনে অনেক হেঁটেছি আর মুগ্ধ নয়নে তার রূপ দেখেছি। কিন্তু এখানে চলেছি তো চলেছি, অদ্ভূত ব্যাপার এটাই যে পলাশই যেন আজ আমার পিছু নিয়েছে। রাস্তার দুদিক থেকে আমায় যেন জাপ্টে ধরেছে। পলাশের কেন গন্ধ নেই? এর যদি গন্ধ থাকতো তবে যে এই জগতের প্রকৃতি পাগল মানুষগুলো সব উন্মাদ হতো। তাই হয়তো ঈশ্বর আমাদের পাগল করেই রেখেছে, উন্মাদ করেনি। কিন্তু আমি যে উন্মাদ হতেই চাই। জয়চন্ডী পাহাড়ের নিচে যখন গাড়ি থামলো তখন মনে হলো আজ সূর্যটাকে যেন আমরাই ঘুম থেকে টেনে তুললাম। দূরের পাহাড়ের কোল থেকে আড়ষ্ট শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। আমাদের ডাকে লজ্জায় আরও যেন লাল হয়ে গেছে। লাল মাটি, লাল গাছপালা তাই যেন আজ ওর মুখটা এত লাল। ওকি তবে পলাশের ধার করা রঙে আজ সেজেছে? যাক সূয্যিমামাকে আর না রাগিয়ে আমি তার থেকে বরং জয়চন্ডীর রূপ নিয়ে লিখি কারণ জানি একটু পরেই ওর স্পর্শে এই শরীর ঝলসে যাবে। কারণ এটা যে শেষের ফাধনে মাস, ওর তেজে হবে যে আমার সর্বনাশ। পাহাড়ের পরিবেশটা দারুণ সুন্দর। এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে জয়চন্ডী হিল রিসর্ট এ। ৮০০ ফুট উঁচু এই পাহাড়। কয়েকশো সিঁড়ি উঠে এখানে মা চন্ডীর মন্দির আছে। আমাদের গর্বের মানুষ সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশ' এই বিখ্যাত চলচ্চিত্র এইখানে তৈরি হয়। একটা সুন্দর লেক আছে এখানে। ডিসেম্বর এর শেষ থেকে জানুয়ারির শুরুতে এখানে পর্যটক মেলা হয়। ট্রেন এ এলে আদ্রা নেমে ৭কি ৮কিমি এর মধ্যে এই পাহাড় রঘুনাথপুর হয়ে যেতে হয়। আসানসোল ৪২ কিমি। এখান থেকে বড়ন্তি ৩০ কিমি হবে। বড়ন্তি যাবার পথে এখানে ভোরের আলোটাকে সাথে নিয়ে নিতে পারেন। বড়ন্তিতে হোটেলের চেক ইন টাইম সকাল দশটাতে, তাই এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতে পারেন।

এবার এগিয়ে চললাম মুরারদি লেকের পাড়ে গড়ন পাহাড়ের কোলে, পুরুলিয়ার জলপরী বড়ন্তি নামের একাট মিষ্টি গ্রামে। জয়চন্ডীকে ছুঁয়ে বড়ন্তিতে দুদিনের ডেরা বেঁধে ছিলাম।

জয়চন্ডী মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চললাম বড়ন্তির পথে। জয়চন্ডী পাহাড়টা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিলো। সামনে পলাশের পাহাড়, সূর্যের হলুদ ছটা লাল পলাশের গায়ে ঠোকর খেয়ে কমলা রঙে হোলি খেলছে। হঠাৎ একটা ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগলো, ডান পাশে চেয়ে দেখি বড়ন্তি লেক যার নাম মুরারদি। আমার দেওয়া নাম মুরারদিদি, আমার রূপালি দিদি। কেন! জল কোথায়! এতো গলানো রূপাধার। জলাধার নয় এটা। এর পাড় ধরে প্রায় ২কিমি গিয়ে মনপলাশ গ্রামে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ৯টা, দশটার আগে ঘর পাবো না, তাই আশপাশটা দেখতে বের হলাম। কি সুন্দর এই জঙ্গল আস্তানা আমার। ৩০ একর জমি নিয়ে এই Spangle Wings Resortটি। সদ্য ছয় মাসের পুরোনো এই স্থাপত্য। খুব সুন্দর, তিন তলা নিয়ে ১২টা ঘর তাতে ৪২ জন পর্যটক থাকতে পারবে। ভাড়া? খুবই কম এসি ডবল বেড রুম, ২০০০ টাকা। চার বেডেড রুম ৩,২০০ টাকা। আর একটা ডরমেটারি আছে ননএসি ৮ বেড ৩২০০। সারাদিনের খাবার খরচ ৩৫০ টাকা প্রতিদিন ও জন প্রতি। পলাশের তপোবন এই মনপলাশ গ্রাম। বড়ন্তি জঙ্গলের পাশেই এই

বাংলো। পেছনে এই বিশাল গলানো রুপোর তাল, জলাধার, খোলাও বলতে পারেন। তিনতলার উপর একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। যেখান থেকে বেলাশেষে সূর্যের স্নান এক অসাধারণ সৌন্দর্য এই নয়নে ধরা আছে। রোদের তাপটা আস্তে আস্তে চড়ছিলো, তাই ঢুকে পড়লাম পলাশের জঙ্গলে, পাতাহীন পলাশের ছায়ায়।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে একটা ছোট্ট ঘুম দিলাম, লাঞ্চ করে ২টো নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা ঘুরতে। টাটা সুমোয় ২০০০টাকা চুক্তিতে, এই বিষয়ে, মানে গড়পঞ্চকোট, বিরিঞ্চিনাথ, মাইথন ও পাঞ্চেত এর গল্প আলাদা ভাবে দেব, সন্ধ্যায় রিসর্ট এ ফিরে আলু পাকোড়া মুড়ি মাখা চা নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম ওয়াচ টাওয়ার-এ। মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পাহাড় জঙ্গল আর এই বিশাল জলাধারের রূপ দেখে পাগল হতে হয়। একটা মিষ্টি ঠান্ডা আমাদের হালকা কামড় দিচ্ছিলো। গড়ন পাহাড়টা মুরারদি জলাধারের বুকে স্থির ভাবে ঘুমিয়ে ছিল। বড়ন্তি জঙ্গলের থেকে নাম না জানা পাখির ডাক ভেসে আসছিলো। দূরের মনপলাশ গ্রামের ঘর বাড়ি আর লালমাটির রাস্তাটা টিম টিম করা হলুদ আলোয় বড্ডো বঞ্চিত মনে হচ্ছিলো। পাশের বিশাল বড়ন্তি খেলার মাঠটা হালকা কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছিলো। আমাদের গান বাজনার আসর শেষ হলো রাত ১০ টাতে।

রিসোর্টটি খালি ছিলোনা, প্রচুর ভ্রমণ পিপাসু মানুষ। আমরা সবার শেষে ডিনার এ বসলাম। ভালোই খাবার দাবার এই ৩৫০ টাকায়, রাত্রের নিস্তব্ধতা এর আগে এমন ভাবে কানে গাঁথে নি।

সকালে বেশ ঠান্ডা নিয়ে উঠলাম। ঘরের বাইরে এসে দেখলাম হোটেলের সামনে বড়ন্তি জঙ্গলের কোলে নাম না-জানা পাহাড়টা পেছনে কে বা কারা যেন আগুন জ্বালিয়েছে। পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে লাল রং চুঁইয়ে পড়ছে। ওয়াচ টাওয়ার-এ গিয়ে বুঝলাম ওটা সূর্য্যের জাগরণ মুহূর্ত। এই মুহূর্তটাকে একা ধরে রাখতে পারলাম না। ওই টাওয়ার তখন দখল করেছে সংসারের সমস্যায় জর্জরিত কিছু মানুষ। "কে সূর্য দেখে ওটাতো বেহালা টালিগঞ্জ কসবায় রোজই ওঠে, কিন্তু বৌমারা ১০ টার আগে ওঠেইনা।" খারাপ লাগলো এমনভাবে ঘোরার পেছনে টাকা নষ্ট করেন এনারা ভেবে। নিচে এসে আবার বিছানা নিলাম। কারণ মন থেকে তখন প্রকৃতির গন্ধ আর রূপটা মুছে গেছে। সেইদিন ছিল মেঘে ঢাকা পুরুলিয়া, সারাদিন গাড়িতে ঘুরলাম ঠান্ডা হাওয়ায় পাখা মেলে। আমরা রিসর্ট-এ ফিরে, মিষ্টি সন্ধ্যা, আর রাতের শীতলতায় ডুব দিলাম। কাল সকালে সবার আগে ওয়াচ টাওয়ার দখলের অঙ্গীকার মনে মনে নিয়ে বিছানা নিলাম।

খুব ভোর বেলায় উঠে বেরিয়ে পড়লাম, উদ্দেশ্য সামনের ওই নাম না-জানা পাহাড়টাকে ছোঁয়া। আজ দেখছি পাহাড়ের পেছনে রুপালি রঙের ছটা, মনে হয় গতকাল মেঘের আড়ালে সূর্য লাল রং ছড়িয়ে ছিল। আজ নীল আকাশে রূপালির খেলা। বড়ন্তি জঙ্গলের বেশ কিছুটা গিয়ে দেখি বেশ চওড়া লাল মাটির রাস্তা। সকালের বাঁশিওয়ালার দরকার নেই। যত ময়লা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরিস্কার রাস্তা, হঠাৎ দুজন কালো বিশাল দেহের মানুষ হাজির আমার সামনে। অবাক হয়ে এতো অন্ধকারে একা বেরিয়েছি কেন, আর কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলো। আমি আমার গন্তব্যের কথা বলতে ওনারা জানালো যে এই রাত্রে ওধারে না যাওয়াই ভালো কারণ তখন রাত তিনটে হবে, শুনেতো ভয়ে আমার শরীর অবশ হয়ে এলো, ওনাদের বাড়ি মনপলাশ গ্রামে, এখনো সরকারের স্বচ্ছ ভারত এর শ্লোগান ওনাদের কানে পৌঁছায় নি। ওনাদের ডেরায় এলাম, তখন দেড় ঘন্টা বাকি ভোরের আলো ফুটতে। গগন মুর্মু, আর মগন মুর্মু, দুই ভাই। আমায় উঠোনে খাটিয়া পেতে বসতে বললো। এবার এলো একটা ছোট্ট থালায় মুড়ি আর সোনার মতো চকচকে কাঁসার গেলাসে চা। আদা আর গুড় দিয়ে তৈরি এই চা, ভালো না লাগলেও চা-এ ছিল একটা অফুরন্ত ভালোবাসা। দু'গেলাস চা খেলাম, দেড় ঘন্টা আড্ডা দিলাম সঙ্গে কেন্দু পাতার নেশা। মগনের বৌ অনুরোধ করলো দুপুরের খাবার ওখানে যেন খাই। আমি জানালাম যে আজ এখুনি আমরা অযোধ্যা পাহাড় বেরোবো, সামনের শীতে এখানে আসবো, মুর্মু পরিবারের বাড়িতেই থাকবো এই অঙ্গীকার করে বেরিয়ে এলাম।

হোটেলে ঢুকলাম যখন, তখন সকাল হয়েছে সেই কালকের পরিবারটি আজও সেই টাওয়ার দখল করে গল্পে মশগুল। নিচ থেকে ওদের দেখে আমি ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন সারা মন জুড়ে সরলতার অনুভূতি আর সারা শরীর জুড়ে কেন্দু পাতার গন্ধ, আমি কেমন যেনো বন্য সৌন্দর্যের পূজারি ভাবছিলাম নিজেকে। মনপশাল আমায় দিয়েছে অনেক কিছু, দিয়েছে মাটির উনুন, কয়লার উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ, মুড়ি ভাজার গন্ধ, তুলসী মঞ্চ, গোবর লেপা উঠোন। আমি পারিনি কোনও কিছুই দিতে শুধু এক বুক ভালোবাসা দিয়েছি ওদের, তাই বার বার বলবো মনমাতাল, মনপলাশের এই সকাল।

পুরুলিয়া এই প্রথম এলাম, লোকের মুখে শোনা পুরুলিয়া আর এখন চোখে দেখা পুরুলিয়া, একদম আলাদা। রাস্তাগুলো ভিড়ে ঠাসা, গাড়ি ঘোড়ার ভিড়, দোকানপাট-এ ভরে আছে শহরটা। কিন্তু একটু

এগিয়ে এলাম, অযোধ্যা পাহাড়ে যাবার পথটাতো পাল্টায় নি! বরং আরও সুন্দর হয়েছে। কত ঝড় ঝাপ্টা গেছে এই রুক্ষ মাটির জেলাটার উপর দিয়ে। কত সালফার, কত কার্বন ঢুকেছে এর দেহতে! কিন্তু কিছুই পাল্টায়নি এই প্রতিবাদহীন প্রকৃতিতে। এখনো এখানে বসন্তে পাহাড়কে সাজিয়ে তোলে পলাশ শিমুল আর অশোক ফুলের দল। এখানো এখানে ভাসে সাঁওতালি গানের সুর। মাদলের আওয়াজ, মহুয়ার গন্ধের মাদকতা, এখনো সকাল সন্ধ্যা সূর্যের রঙের খেলা। এরাতো পালটায়নি নিজেদের আজও। সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়লাম আমাদের শেষ গন্তব্য পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। বড়ন্তি যদি হয় পুরুলিয়ার পার্বতী মা, অযোধ্যা পাহাড় আমার কাছে পুরুলিয়ার বাবা বিশ্বনাথ। প্রায় ১২০ কিমি এই পথ পেরোতে আট ঘন্টা লাগলো। এই অযোধ্যা পাহাড়ে হিল টপ এ পৌছালাম। খুব সুন্দর ৩৫০০ ফুট উঁচু এই স্থানটি। এখানে একটাSBI এর এটিএম কাউন্টার দেখতে পেলাম। তার পাশে নীহারিকা নামে একটি খুব সুন্দর রিসর্ট আছে। এটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে। থাকার ভাড়া ৮০০/- থেকে ২৫০০/ অবধি। এবার আমরা চললাম বামনী ফলস্ দেখতে। খুব সুন্দর এর পরিবেশটা। এক নির্জন প্রকৃতির বুকে দুরন্ত এক ছোট্ট ঝর্ণা। এই ঝর্ণাটা টপকে একটু উপরে উঠলেই এক অসাধারণ সুন্দর জায়গা। উঁচু থেকে নিচের এই জলাধার এতো সুন্দর দেখতে লাগছিলো যে মুখের শব্দ হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখানে খুঁজে পেলাম আমার প্রিয় কেন্দু গাছটাকে, তার পাশেই থোকা থোকা ফুল নিয়ে হাসতে দেখলাম মহুয়া গাছটাকে। মাকার মাহাতোর দোকানে বসে ওর হাতের ভেজা ছোলা শশা মাখা খেয়ে এবার চললাম আপার ড্যাম দেখতে। প্রায় দুই কিমি লম্বা সুন্দর রাস্তা ধরে গাড়ি ড্যামের উপর দিয়ে চালালাম। এখানে কোনো দোকান পাট নেই কিন্তু ড্যামের উপর প্রচুর পর্যটকের উপস্থিতি ছিল। চার দিক সবুজ আর সবুজ। ড্রাইভার তাড়া দিচ্ছিল। গাড়ির ড্রাইভার আমার হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়েছিলো এতক্ষণ। এবার দেখলাম ও ফিরে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। আবার

হিল টপে থামলাম। একটা দোকানে চায়ের বিরতি হলো। দোকানে ঢুকতেই দেখতে পেলাম তিনটে ছেলে এক কোণে বসে ড্রিংক করছে। আমার উপস্থিতি ওদের হয়তো পচ্ছন্দ হলোনা। ওদের চাউনিগুলো ভালো লাগলোনা, কিন্তু আমি সাহস করে চায়ের কাপ নিয়ে ওদেরই টেবিলের কাছের টেবিল-এ বসলাম। বন্দুকের নলের মতো ক্যামেরাটাকে টেবিলে রেখে আমিও ওদের দিকে তাকালাম। চেহারা দেখে যতটা ভয় লাগছিলো ওরা মনেতে যে খুব সাধাসিধে তা খানিক ক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম। মদের বোতলগুলো লুকিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ওখান থেকে উঠে পালালো। অমি দেখতে চেয়েছিলাম ওদের এই হিংস্র চাউনির শেষটা কোথায়, কি করে দেখি আমায়।

বুঝলাম চেহারায় এরা রুক্ষ হলেও হৃদয় এদের খুব নরম, ঠিক যেন মৌচাক, আঘাত না করলে কামড়ায়না, কিন্তু দেখলেই ভয় লাগে। এবার ড্রাইভার ও দোকানির তাড়া শুরু হলো। দোকানি থাকে এখান থেকে ১৩ কিমি দূরে বাঘমুন্ডি অঞ্চলে, যাবে সাইকেল চালিয়ে। একটা জিনিস অনুভব করলাম যে এখানকার গাড়ি ড্রাইভার থেকে শুরু করে লোকাল মানুষজন এখনো এই পাহাড়ের অন্ধকারটাতে বিশ্বাস করেনা। চা খেয়ে আর কোথাও না দাঁড়িয়ে সোজাপাহাড় থেকে নেমে এলাম, মাঝে ড্রাইভার এর আপত্তিকে উপেক্ষা করে একটা জায়গাতে গাড়ি থামালাম, কারণ সূর্য ডোবায় এই দৃশ্য ফেলে দিতে বা ছেড়ে দিতে পারলাম না। জায়গাটা একটা পাহাড়ের বাঁকে ছিল, ওখান থেকে নিচের সমতলে মেশার রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, যে পথ সবুজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা পিচ ঢালা কালো একটা বর্ডার এর মতো লাগছিলো, আর উপর থেকে মনে হচ্ছিলো জুলুকের থামবি পয়েন্ট থেকে আমার দেখা সেই জিগজ্যাগ রাস্তাটা। আর ফেলে আসা পাহাড়ের ওপর কারা যেন আগুন লাগিয়েছে। একটা লাল বড় থালার মতো সূর্যটা পাহাড়ের পেছনে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। পুরো পাহাড়টাকে যেন আগুনে জ্বালিয়ে দিছে। পলাশের রং যেন আরও ফেটে বের হচ্ছে। এবার আমি গাড়ির দায়িত্ব গণেশ মাহাতোকে দিয়ে একদম পেছনের সিটটাতে গিয়ে বসলাম। গাড়ি এগিয়ে চলল পুরুলিয়া শহরের দিকে। রাত্রি ন'টার বড়ন্তি রিসোর্ট-এ পৌছালাম। টাটা সুমোয় ভাড়া লাগলো ৪০০০ টাকা এক পিঠের এসি চালিয়ে। রিসর্টের পাশের মনপলাশ গ্রাম তখন জেগে কারণ পাশের পলাশ বন-এ তখন সাঁওতালি নাচ গানের আসর পুরোদমে জমে উঠেছে। রিসর্টে সবাই খুব আনন্দ করছে। এই দু'দিনের পরিচিত কিছু মানুষ আমাদের টানতে টানতে ওই আগে নিয়ে গেল। বয়সে আমরা প্রবীণ হলেও এখন তো সবাই নাচ গানের জগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছি তার পরিচয় কিছু মানুষ পেয়েছিলো।

আজ সকাল থেকে মনটা ভারী লাগছিলো, সকাল ৯টা-তে ঘর ছাড়তে হলো ব্রেকফাস্ট সেরে আবার পুরুলিয়ার পথে পাড়ি দিলাম, কারণ আমাদের ট্রেন রূপসী বাংলা দুপুর ৩.৩৮ মিনিটে ছাড়ার ছিল। ২১০০ টাকায় গাড়ি ঠিক হল। বাহনকে নিয়ে দুপুর ১টাতে স্টেশন পৌছালাম। সুন্দর ওয়েটিং রুমে দুঘন্টা কাটিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম, যথা সময় ট্রেন ছাড়লো। ছয় সাড়ে ছয় ঘন্টার পথ, শুরু হলো গানের আসর। কিছুক্ষণ এর মধ্যেই পুরো কামরা আমাদের সাথে মেতে

উঠলো। সময় এই ভাবে কেটে গেল কেউ বুঝতে পারলাম না, রাত্রি ৯টা তে সাঁতরাগাছি স্টেশন এ যখন নামছি তখন অনুভব করলাম এই ৬ ঘন্টায় ট্রেনের অনেকেরই মনে আমরা জায়গা করে নিয়েছি। একটা বাচ্চা মেয়ে ৪ বছর বয়স হবে, সিন্থেসাইজার বাজাতে পারে, আমায় হাতে ওর আধ খাওয়া প্রিয় ক্যাডবেরিটা দিয়ে গেল। আমি ওর দেওয়া মিষ্টি উপহার, সেটাকে এখনো যত্ন করে কাগজে মুড়িয়ে আমার ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। এই ভালোবাসা পথ ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায় বলুন!

পণ্যভূমে পুণ্যমেলা প্রাঙ্গণে

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

এ এক উল্টো পথ যাত্রা। লেখার শুরুতেই লাগে ঠেক। উল্টোপথ যাত্রা কেন? বদলির চাকুরিতে ঘুরতে ঘুরতে অবসরের দুবছর আগে পোষ্টিং হলো শিলিগুড়িতে। গৃহনগর না হলেও গৃহরাজ্য তো বটে। মনের সুখে অন্তত মাতৃভাষায় দুটো কথা বলা তো যাবে। তবু ঘরের টান যে বেজায়। তাই হাতে দুদিন ছুটি পেলেই—''মন চলো নিজ নিকেতনে।'' কিন্তু এবার যেন মনের উল্টো গ্রন্থিতে পড়ল টান। পরপর দুদিন ছুটি তার সাথে শনি ও রবি মিলে ছুটির জমার খাতায় পরপর চারদিন। তাই টান লাগলো আরো উজান পানে। অফিস ছুটির পর পিঠে ঝোলা নিয়ে বাহনের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম রাস্তার অপর পাড়ে।

—''কি দাদা বাড়ি যাচ্ছেন না?'' সহকর্মীদের অবাক জিজ্ঞাসা। হাসিমুখে ঘাড় নাড়লাম। ''তা চললেন কোথায়?'' ফের জিজ্ঞাসার মুখে। এবার আর 'হ্যাঁ' বা 'না' এ জবাব হয় না। বললাম 'পশ্চিমে হরিহর ক্ষেত্রের মেলা প্রাঙ্গণে।'' আবার প্রশ্ন ''সেটা আবার কোন খানে?'' জবাব দিলাম ''শোনপুর''। প্রত্যুত্তরে শুনলাম ''সত্যি দাদা আপনি পারেনও বটে!''

'হরিহর ক্ষেত্র মেলা।' সেই কবে পড়েছিলাম 'কালকূট'-এর 'পণ্যভূমে পুণ্য স্নান' তাও প্রায় বছর চল্লিশ আগে তো বটেই। পড়ার পর থেকেই মনের ভিতর আনচান। পুণ্যস্নান হোক বা না হোক যেতে হবে একবার সেই পণ্যভূমে। কিন্তু চাইলেই তো হয়না। গ্রন্থীতে টান লাগা চাই তো। সেই টান লাগলো এতদিনে। মনে হলো এই পাহাড়তলী থেকে তিলোত্তমা মহানগরীও যতদূর প্রায় ততটাই দূর সেই পুণ্য পণ্যভূমি। তবে আর দেরী কেন? মন আর পদযুগলের যুগলবন্দীতে বেড়িয়ে পড়লাম উজান পানে।

হাজিপুরে বাস থেকে নেমে দেখি কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে মেলা প্রাঙ্গণের দিকে। মানুষ আসছে রেলপথেও। একসময় জলপথেও আসতো প্রচুর পুণ্যার্থী মানুষ। হাজিপুর থেকে শোনপুর মটোরযানে বেশীক্ষণের পথ নয়। এই পথেই মিশে গেলাম জনতা-জনার্দনের ভীড়ে।

গঙ্গা আর গন্ডক নদীর সঙ্গমস্থল ঘিরে শোনপুর মেলা প্রাঙ্গণ। যার আর এক নাম হরিহর ক্ষেত্র মেলা। নামের মাঝেও আর এক সঙ্গম। হরি আর হরের মিলনক্ষেত্র এই শোনপুর। ফলে অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই শৈব আর বিষ্ণুপন্থীদের কাছে এ এক পরম তীর্থক্ষেত্র। যদিও আমি পুণ্যার্জনের তাগিদে আসিনি। এসেছি কাছ থেকে ভারতবর্ষের প্রকৃত গণদেবতাকে প্রত্যক্ষ করবো বলে। ভাবছিলাম সে কথা। ভাবতে ভাবতেই ভাবের ঘরে লাগে ঘোর।

সঙ্গম! ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ মেলাই দুটি নদীর সঙ্গমে হয় কেন? সে কি কোন প্রাচীন ভারতে নদীপথে যাওয়া-আসার সুবিধার জন্য। নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?

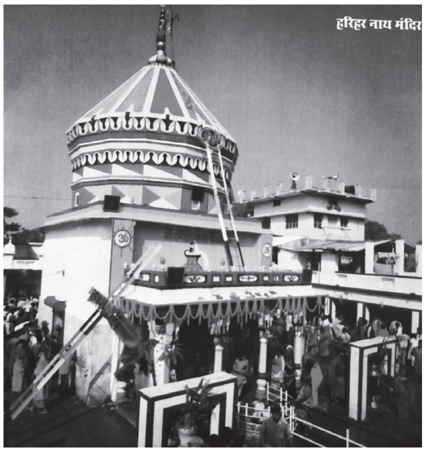

''বাবুজী কি বাঙালী নাকি?'' পরিস্কার মাতৃভাষায় প্রশ্ন শুনে ঘুরে তাকালাম প্রশ্নকর্তার দিকে। দেখলাম শশ্রু গুম্ফ যুক্ত সৌম্য দর্শন প্রৌঢ় এক ব্যক্তি। সম্মতিতে ঘাড় নাড়ালাম। প্রতিপ্রশ্ন করলাম 'আপনি?' বললেন ''হ্যাঁ যোগ ছিল কোনও এক কালে। তখন নাম ছিল ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য। তা সেসব অনেক কাল আগেই চুকে-বুকে গেছে। এখন আমি অনেকের কাছেই 'বাবাঠাকুর' নামে পরিচিত। বেশ লাগে নামটা বুঝলেন।'' বলে একটু হাসলেন তিনি।

উত্তরে বললাম ''সত্যি নামটা বেশ সুন্দর। কিন্তু এককালে বলছেন যে আপনি কি সন্ন্যাসী?''

''তা জানিনে। তবে বহুকাল হলো ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। পথে পথে ঘুরি,আর মেলায় এসে মিলি। তা থাকগে সে কথা। কি ভাবছিলেন নদীর দিকে তাকিয়ে?'' প্রশ্ন করলেন তিনি। ''ভাবছিলাম এ দেশের সব মেলাই নদী সঙ্গমে বসে কেন?''

''—বা! বোঝ মন যে জানে সন্ধান। বুঝলেন আমার মনেও উঠতো এ প্রশ্ন! তারপর এ মেলা -সে মেলা ঘুরতে ঘুরতে নিজের মত করে একটা উত্তর খুঁজে পেলাম। তবে তা আপনার পছন্দ হবে কিনা জানা নেই।'' ''—পছন্দ, অপছন্দ তো পরের ব্যাপার আগে উত্তরটাতো শুনি।'' জবাব দিলাম আমি।

বাবাঠাকুরের দুচোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল। বললেন শুধু নদী সঙ্গম বলছেন কেন? ধর্মীয় মেলার তিথি-নির্ঘন্ট এসব নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনা মনে?

চুপ করে থাকলাম। মনে হলো উনি নিজেই এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

''—এই সব মেলার পরম মুহূর্ত দেখবেন হয় কোনও পূর্ণিমা, নয় অমাবস্যায় আর নয়তো সংক্রান্তি। এগুলোও কিন্তু সঙ্গম। এক মুহূর্তের সাথে অন্য মুহূর্তের মিলন, তিথি-নক্ষত্রের মিলন। মিলন সঙ্গম তো কেবল দুটো নদীর মিলন নয়। এই নদী দুটি যে সভ্যতা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ভূভাগের উপর দিয়ে বাহিত হচ্ছে তার সব বৈশিষ্ট্যকে সে নিজের মধ্যে সমাহিত করে আমাদের উপহার দিচ্ছে অমৃত। সেই অমৃতই প্রতিভাত হয় মানুষের সাথে মানুষের মহামিলনে। এই অমৃত আবার এক প্রজন্ম অন্য প্রজন্মকে উত্তরাধিকার রূপে দান করছে। এসব নিয়েই সঙ্গম। আর এই শোনপুরের তো কথাই নেই। এখানে মানুষের শুধু নয় সমস্ত প্রাণীকুলেরই এক মহাসঙ্গম।'' অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন তিনি।

''—বাঃ, বেশ সুন্দর বলেছেন তো।'' মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। বললাম ''আপনিতো যে সে লোক নন! তা আপনার আখাড়া কোনদিকে?''

''—না বাবুজী আমি আখড়ার সাধু নই। আমিও আপনার মত ঘুরতে এসেছি এই মেলায়। প্রতি বছরই আসি। বড় ভাল লাগে জায়গাটাকে। এতবার আসতে আসতে অনেকের সাথেই জানা-চেনা হয়ে গেছে একটু-আধটু। কোনও ডেরায় একটু খেয়ে নিই। কোথাও বা একটু শুয়ে নিই।'' এরপর প্রতিপ্রশ্ন করেন বাবাঠাকুর। ''তা আপনি কোথায় ডেরা বেঁধেছেন?''

''—মেলা পরিক্রমা করে আমি আজই ফিরে যাবো পাটনা। সেখান থেকে কাল ধরবো বৈশালীর পথ।'' উত্তর দিলাম আমি।

উত্তর শুনে হাঁ হাঁ করে উঠলেন বাবাঠাকুর বললেন, ''তাই বললে হয় নাকি! একরাত্রি মেলায় না কাটালে না হবে পুণ্য না পাবেন পণ্য। মেলার পূর্ণ রূপকে বাগে আনবেন কি করে গো? চলুন সরকারী ব্যবস্থাপনাতেই থাকার জায়াগা আছে।''

ভালই লাগলো, বাবাঠাকুরের আন্তরিকতা। অনুগামী হয়ে গেলাম তার। চলতে চলতে বললাম তাকে ''মেলার মাহাত্মটা যদি একটু বলেন আমায়।''

''—কোন মাহাত্মটা শুনবেন? ধর্মীয় নাকি ঐতিহাসিক?'' হেসে বললাম— ''দুটোই, এমন কি যদি তার পরেও কিছু থেকে থাকে তবে তাও।''

''— বেশ তবে পুরাণ সূত্র ধরেই শুরু করছি। আমি কিন্তু আমার শোনা কথাই শোনাব। যুক্তি, তর্ক দিতে পারবোনা। কেননা আমি পন্ডিত নই, তাই প্রমাণ করার তাগিদও আমার নেই।''

পাছে উনি অপ্রতিভ হন, তাই বলে উঠি ''না, না, কোনও প্রমাণের আমার দরকার নেই।''

বাবাঠাকুর আমায় ভাল করে জরিপ করে নিলেন। বোধহয় আমার আগ্রহ কতটা নিখাদ সেটাই পরখ করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন—

''হরিহর ক্ষেত্র হল পুরাণ কথিত সেই স্থান যেখানে ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ হরি রাজা গজেন্দ্রকে দানব কুম্ভীরের হাত থেকে রক্ষন করেছিলেন। আর হর অর্থাৎ শিবের ক্ষেত্র রূপে শৈবদের পূণ্যতীর্থ রূপে আগে থেকেই পুরাণে এস্থানের উল্লেখ আছে। তাই এই স্থান হরিহরের সঙ্গম স্থল।

কথিত আছে যে গন্ধর্ব রাজা হু হু তার অনুপম দেহ লাবণ্যের জন্য অত্যন্ত খ্যাত ছিলেন। আর তা নিয়ে তার খুব গর্বও ছিল। একদিন অনেক গন্ধর্ব কন্যাদের নিয়ে সে নদীতে জলকেলি করতে এতটাই উন্মত্ত ছিল যে সেখানে পূজা-পাঠে মগ্ন এক ঋষিকে সে পদাঘাত করে। ঋষিবর ক্ষুণ্ণ হয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে বিফল হন। তখন তিনি ক্রোধবশে রাজাকে অভিসম্পাত করে বসেন। তৎক্ষণাৎ রাজা হরিহরের অনিন্দকান্তি রূপ অন্তর্হিত হয়ে এক ভয়াল কুম্ভীরের রূপ গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে শোনপুরের রাজা ইন্দ্রায়মন অগস্তমুনিকে চিনতে না পেরে অপমান করে বসলে মুনিবরের অভিসম্পাতে রাজা হস্তিতে রূপান্তরিত হন। তবে হস্তিতে রূপান্তরিত হলেও তার রাজাভাব বজায় থাকে। তিনি হন হস্তিযুথপতি রাজা গজেন্দ্র। একদিন রাজা গজেন্দ্র গন্ডক নদীতে স্নান করতে নামলে করাল কুম্ভীররূপী গর্ন্ধব রাজা হরিহরের মুখে পড়েন। দীর্ঘকাল ধরে দুজনের প্রবল যুদ্ধ চলে। অবশেষে গজেন্দ্রর প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়লে সে নদী থেকে একটি পদ্ম শুঁড়ে করে তুলে শ্রী হরিকে স্মরণ করেন। তাতে ভগবান বিষ্ণু প্রকট হন এবং চক্র দ্বারা করাল কুম্ভীরকে বধ করে গজেন্দ্রর প্রাণ রক্ষা করেন। রাজ ইন্দ্রায়মন পুনরায় মানব শরীর প্রাপ্ত হয়ে এই হরিহর ক্ষেত্রের মেলার প্রবর্তন করেন। গজরাজের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য এই স্থান গজগ্রহমোক্ষ নামেও পরিচিত। প্রত্যেক বছর এই মেলা কার্তিক পূর্ণিমায় শুরু হয়ে পরের পূর্ণিমায় শেষ হয়।'' অনেকক্ষণ কথা বলার পর থামলেন বাবাঠাকুর।

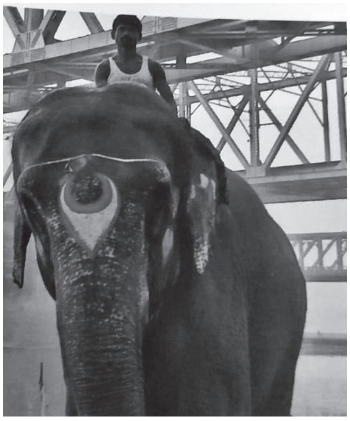

''—আর ইতিহাস?'' প্রশ্ন করলাম আমি।

''—সে সব পুঁথি-পত্র ঘাঁটলেই পাবেন। তবে এই মেলা যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র অত্যন্ত নিকটে হওয়ায় মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সেনা-বাহিনীর বেশীর ভাগ রণহস্তি, অশ্ব এই মেলা থেকেই সংগ্রহ করা হতো এমন সাক্ষ্য

ইতিহাসে আছে। সেই সময় থেকে ব্রিটিশ শাসনকালেও এই মেলা পশুমেলা রূপে ভারত বিখ্যাত ছিল। স্বাধীন ভারতেও সরকার এই মেলা থেকে হাতি কিনে দেশের নানা প্রান্তে এমন কি সুদূর আন্দামানেও প্রেরণ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষ এই মেলায় প্রচুর পশু কেনাবেচা করতো এবং এখনো করে।"

কথা বলতে বলতেই আমরা মেলার মূল প্রাঙ্গণে এসে পড়লাম। সত্যিই বেশ বড় মেলা। এতবড় মেলা আমি আগে দেখেছি বলে মনে করতে পারছিনা। বেশ একটু অবাক হয়ে গেছি। চমক ভাঙলো বাবাঠাকুরের কথায়। বললেন ''বাবুজী আগে থাকার ব্যবস্থাটা পাকা করবেন চলুন। বলে আমায় নিয়ে গিয়ে থামলেন একদম 'পর্যটন গ্রামের সামনে।" পর্যটন দপ্তরের অফিসে।

সুদৃশ্য কাপড় আর ত্রিপল দিয়ে আড়াল করা একটা স্থান। উঁকি মেরে দেখলাম সার দিয়ে ছোট ছোট তাঁবু পাতা আছে। সামনে একটু করে ছোট বারান্দায় লাল গালিচা তার ওপরে একটা ধারে আরাম কেদারা পাতা। কানাতের ভিতরে নিশ্চই থাকার ব্যবস্থা। বাবাঠাকুর তরতর করে অফিসের ভিতর ঢুকে গেলেন। দেখে মনে হল সরকারি কর্মচারীদের সাথে তার ভালই খাতির আছে। তারপর আমায় ডেকে পরিচয় দিলেন। মাত্র ১৫০০ টাকায় একটা গোটা দিন-রাত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এবার বাবাঠাকুর হাতজোড় করে বললেন ''এবার তবে আমি আসি বাবুজী। আপনার ভার আমি দিয়ে গেলাম এই নওল কিশোরজীকে। যে কোনও দরকারে আপনি নিঃসংকোচে ওনাকে জানাতে পারেন।" বলে ভীড়ের মাঝে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

নওল কিশোরজী আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন ''আইয়ে বাবুজী।" তারপর একটা টেন্টের সামনে নিয়ে গিয়ে কানাত তুলে ধরলেন। একটুকরো লাল কার্পেট পাতা বারান্দা পার হয়ে ভিতরে সুন্দর নাওয়া-খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা। আমার তো ধারনাই ছিলনা এইরকম ভীড়-ভাড় মেলার মধ্যে এমন সুন্দর থাকার ব্যবস্থা আছে। তবে বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার মত সময় আমার হাতে নেই। দিনের অনেকটাই অতিক্রান্ত। পরদিন বৈশালী ঘুরে পাটনা ফিরে যেতে হবে। তাই তাঁবুতে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিশে গেলাম মেলার ভীড়ে।

নওল কিশোরজীর কথামত মেলা দর্শনের শুরুতেই চলে গেলাম হরিহর নাথ মন্দির দর্শনে। হরিহর নাম হলেও এটি আসলে হরের অর্থাৎ শিবের মন্দির। পুণ্যার্থীরা স্নান করে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসে ভিতরে রূপোর নাগাচ্ছাদিত মাথায় ঢেলে চলেছে। মূর্তির বাকি অংশ লোহার গরাদ দেওয়া শক্ত খাঁচার মধ্যে। বেশ ভীড় হলেও চমৎকার দর্শন করা গেল। আমার চোখ খুঁজছিল বাবাঠাকুরকে। যদি এখানে তার দর্শন মেলে তাহলে আরো কিছু জানা যায়। না পেলাম না তাকে। অগত্যা ধরলাম এক পান্ডা মহারাজকে। তার কাছে শুনলাম যে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সীতার স্বয়ম্বর সভায় যাওয়ার পথে শিব পূজার উদ্দেশ্যে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কে জানে হবেও বা। আমার জানা রামায়ণের কোথাও এমন উল্লেখ নেই আর মন্দিরের গড়ন দেখেও কোথাও কোনও তেমন-প্রাচীনত্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। বেশ রঙচঙে, আধুনিক মন্দির। যাক সে কথা আমি এসেছি মেলায় গণদেবতা আর পণ্য সমগ্রতা দেখার জন্য। আনকথায় কাজ কী? প্রসাদী মিষ্টি নিয়ে এগোলাম সটান পণ্যভূমের উদ্দেশ্যে।

ভারতবর্ষ কেন, এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পশুমেলা হল এই শোনপুর মেলা। রাজস্থানের পুস্কর মেলা যেমন মূলত: উট বেচা কেনার জন্য বিখ্যাত তেমনি শোনপুরের খ্যাতি হাতি, ঘোড়া, কেনাবেচার জন্য। খোঁজ করছিলাম সেই মাতঙ্গ মহাপণ্যের। কিন্তু হতাশ হতে হল। নানারকম পশু দেখতে পেলেও হাতিদের দেখা পেলাম না। অথচ তাদের নিয়ে কি চমৎকারই না ছবি এঁকেছিলেন কালকূট তাঁর কলমের রেখায়। তবে হ্যাঁ ঘোড়া আছে বটে কিছু এই মেলায়। আর আছে গরু মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, হাঁস, মুরগী, আরো কত কী!

মাতঙ্গদের মত না হলেও কৌলিন্যে অশ্বকূলও কিছু কম যায়না। তাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কত কথায় ভরা আছে ইতিহাসের কত পাতা।

এই ছাউনিতে সার সার ঘোড়া রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তাদের কেউ পা ঠুকছে তো কেউ রেশমের গোছার মত লেজ ঝাড়া দিচ্ছে। ছাউনির পাশে থাকা বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গায় সাওয়ারি করে ঘোড়া পছন্দ করা হচ্ছে। মোবাইলে ফটো নিতে যেতেই হৈ হৈ করে এসে বাধা দিল কয়েকটা বাচ্চা ছেলে। ফটো নেওয়া যাবেনা। ফটো নিলে ওদের পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে। মেলায় ঘোরার মজায় তাল কাটলো ঘোড়ায় গোড়ায় এসে। ধমক দিলাম ছেলেগুলোকে। গোলমাল শুনে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলেন এক মধ্যবয়স্ক মানুষ। নালিশ জানালাম তাকেই। বহু দূর। কোলকাতা থেকে এসেছি মেলা ঘুরতে। মনের আনন্দে ছবি তুলছি কোথাও কোনও সমস্যা নেই এখন এ কি বেয়াদবী।

কোলকাতার নাম শুনে কিনা জানিনা উনি ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন ''বাবুজী কি পত্রকার নাকি?' বললাম পুরোপুরি নয়। সরকারী অফিসার তবে মাঝে মধ্যে পত্রকারিতাও করি।" উনি বাচ্চাগুলিকে সরিয়ে আমার হাত ধরে ছাউনির ভিতর নিয়ে একদম ঘোড়াদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'লিজিয়ে জিতনা মর্জি ফটো লিজিয়ে।'

জিজ্ঞাসা করলাম 'কি নাম, আপনার?'

—'সেলিম ভাই ঘোড়াওয়ালা' বলে হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, 'সেলিম মহম্মদ'। এরপর এক এক করে ঘোড়াদের নাম, ধাম, দাম সব বলতে লাগলেন।

'এ হচ্ছে 'সুলতান', দু সাল উমর দাম, ঢাইলাখ টাকা। এ হচ্ছে 'শাহজাদা!' দাম এক লাখ পঁচাত্তর হাজার'। আর একটাকে দেখিয়ে বললেন 'এ হ্যায় 'পদ্মা', এ ঘোড়া নয় ঘোড়ি এর দাম দশ লাখ।'

চমকে উঠলাম 'পদ্মার' দাম শুনে। বললাম 'এর এত দাম কেন?' হেসে জবাব দিলেন সেলিম ভাই। 'ইসকা বহুত গুন আছে বাবুজী।' এ জব্বর খেল জানে। কিন্তু ওকে আমি বেচবনা। ও আমার বেটি আছে। সব মেলাতে আমার সাথে ঘুমে। লোকে ওকে খরিদতে চায় আর দাম মালুম হতেই ভাগে বলে হা-হা কার হেসে উঠলেন তিনি। তারপর আদর করতে থাকেন পদ্মাকে।

বললাম 'সেলিম ভাই এত ঘোড়া নিয়ে এসেছেন, এত দামে সব বেচাকেনা হয়? এখন তো ঘোড়ার তেমন চলে নেই।'

—'হ্যাঁ বাবু, ব্যাপার আর আগের মত নেই। তোবে এখনো খরিদারি ভালোই হয়। খাস করকে এই দেহাত প্রদেশে। দেহাতে আভি ভি ঘোড়ে প্রেস্টিজ কী বাত আছে। আর ত্রিস, চল্লিশ হাজার সে ঘোড়া গরীব আদমী ভি খুব কেনে। তাদের কাজেও লাগে আর দেহাত প্রদেশে লোগ বিশওয়াস করে কি ঘর পর ঘোড়ে রহনে সে জীন, ভুত এসব আস-পাস সে থাকেনা। তারপর একটা বাচ্চাকে ডেকে বললেন 'এই ছোটু যা চায় লে কে আ।'

আমি নানা করলাম, শুনলেন না। জিজ্ঞাসা করলাম 'এবার বেচাকেনা কেমন হচ্ছে?'

শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেলিম ভাই বললেন, ''আচ্ছা ধান্দা' চলছিল বাবুজী। কিন্তু নসীব খারাপ। এখন এই মেলা বহত খারাপ হয়ে গেছে। আগে সাল থেকে আর আসবো কিনা সোচতে হবে।'

কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করলাম 'কেন?'

—চারদিন আগে দশ/বারো লাখ টাকার বিক্রি হলো। সেদিন এত ভীড় ছিল যে টাকা ব্যাঙ্কে ভেজাতে পারিনি। রাত্রি বেলায় আমাদের খাবারে নিদ কী গোলি মিলাকে হামে বেহস করে দিল। সালে লোগ সব টাকা চোরি করে নিল। বলে চুপ করে গেলেন সেলিম ভাই।

বড় ব্যথা পেলাম কথাটা শুনে। জিজ্ঞাসা করলাম 'পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন?'

আবার একটু হাসলেন সেলিম ভাই। বললেন 'ওসব ঝুটমুট কী ঝামেলা বাবুজী। রূপিয়া তো মিলবেনা। ফির পুলিশকে পেয়সা দিতে হবে। ধান্দা একদম খারাপ হয়ে যাবে। এসব কারণে বাচ্চাগুলোর মন খারাপ আছে। কেউ ছবি তুলতেই পয়সা মাঙ্গছে। কৌন জানে কিস ধান্দে কে কারণ কৌন ইধার আ রাহা হ্যায়।'

কথার মাঝেই চা এসে গেল। সেলিম ভাই বললেন, 'লিজিয়ে বাবুজী চায় পিজিয়ে।' দেখলাম একটা বড় ডেকচির ঢাকনার ওপর বেশ কয়েকটা ভাঁড়ে গরম চা। কিন্তু কেউ আমার হাতে ভাঁড় তুলে দিলনা। অর্থাৎ আমি যেন মনে না করি যে এতে কিছু মেশানো আছে। আমি একটা ভাঁড় তুলে নিতেই অন্যরা যে যার মত একটা করে ভাঁড় তুলে নিল।

বললাম 'খুব দুঃখ পেলাম এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে জেনে।' তারপর প্রশ্ন করলাম' 'ঘর কোথায় আপনার?'

—'আওরঙ্গবাদ। এই মেলা শেষ হলেই ফির রাজস্থান কে নাগৌড় যায়েঙ্গা। সেখান থেকে পুস্কর হয়ে ফির ছ মাহিনা বাদ ঘর লোটনা।' অনেকক্ষণ ধরে যে কথাটা মনের মধ্যে উসখুস করছিল এবার সেটা না জিজ্ঞাসা করে আর পারলাম না। বললাম 'শোনপুর মেলা তো হাতি কেনা-বেচার জন্য বিখ্যাত তা, হাতি কোথাও দেখছিনা তো।'

এবারে হা-হা করে হেসে উঠলেন সেলিমভাই। বললেন 'বাবুজী লোগ আভিভী ঘোড়ে খরিদে, লেকিন হাতি খরিদতে পারেনা। মেলা শুরুর দিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট দো হাতি মেলাতে নিয়ে আসে। মেলা শুরু হয়ে গেলে দুদিন পরে ওহ ফির ফোরেস্টে চোলে যায়।

এবার আমার বিদায় নেওয়ার পালা। বললাম 'সাবধানে থাকবেন সেলিমভাই।'

সেলিমভাই দুহাতের মধ্যে আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বললেন 'আপ ভি সাবধানী রাখিয়ে বাবুজী'।

বেরিয়ে পড়ার আগে বাচ্ছাগুলোকে ডাকলাম। বললাম 'খুব ভাল চা খাইয়েছিস।' তারপর একশো টাকার নোট বার করে দিতে যেতেই সব দৌড়ে পালালো। আমি একটাকে কোনওরকমে ধরে ওর মুঠোর মধ্যে দিয়ে বললাম 'মিঠায় খা লেনা।'

পশু ছাউনি থেকে বেরিয়ে এবার পথ ধরলাম জন-সমাগমের দিকে। যত সময় গড়াচ্ছে মেলায় মানুষও বাড়ছে তত। কত কিছু যে বিক্রি হচ্ছে তার শেষ নেই। সবথেকে বেশী বিক্রি খাবার। রাবড়ি জিলাপি আরো নানারকম মিঠাই। লিট্টি, চোখা, ঘুগনি, পাঁপড়, আচার। আরো কত কী! সেই সঙ্গে মেলার সনাতন আকর্ষণ সার্কাস ম্যাজিক, মৌত কী কুয়া, বিশাল নাগরদৌলা ও আরো নানারকম রাইড। পায়ে পায়ে পৌছে গেলাম বিহার পর্যটন দপ্তরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মঞ্চে। বেশ ভালো ভীড় আছে মন্ডপের মধ্যে। সামনের সারিতে কয়েকটা আসন ফাঁকা দেখে তার একটাতে বসে পড়লাম। সম্ভবতঃ অতিথিদের জন্য এই আসনগুলি সংরক্ষিত। মঞ্চের উপরে তখন বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েরা বিহারেরই নানারকম লোকগীতি, নৃত্য, পরিবেশন করছে। বেশ মন দিয়ে দেখছি। হঠাৎ একজন এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল 'বাবুজী আপকা পরিচয়?' আমি একটু হক চকিয়ে গেলাম। বুঝলাম এই আসনে বসে ভুল করে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে যেতেই তিনি হাত ধরে আমায় আশ্বস্ত করলেন। বললেন

'বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, কেবল আপকা পরিচয় দিজিয়ে।' অগত্যা দিলাম, পরিচয়। বুঝলাম ফের একটা ভুল করে বসলাম। সাথে সাথে ভদ্রলোক সঞ্চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন 'পবনজী ইয়ে বাবুমশাই কোলকাতা সে আয়ে হ্যাঁয়, হমারে মেলা দেখনে কে লিয়ে।'

ব্যাস পবনজী একেবারে মঞ্চের ওপরে ডেকে নিলেন আমায়। তাদের আজকের অনুষ্ঠানের এটাই নাকি চমক। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে অজানা অচেনা বিশেষত: অন্য রাজ্যের, দেশের লোকেদের মঞ্চের ওপর ডেকে নিয়ে তাদের মুখে মেলার অভিজ্ঞতা শোনা ।

পবনজী আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন মাইক্রোফোন। লাইটম্যান ফোকাস ফেললেন আমার ওপর। সকলের নজর আমার দিকে। আমিও

এই ফাঁকে নিজেকে একটু দেখে নিলাম। আমার পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর নীল জিনসের প্যান্ট। কাঁধে নীল রঙেরই শান্তি নিকেতনের একটা ঝোলা ব্যাগ। একেবারে টিপিক্যাল বাঙালি ভবঘুরে। আর ঠিক তখনি যেন আমার ওপর ভর করলেন কথকথার কথক ঠাকুর স্বয়ং 'কালকূট'। বলে না 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা শত ধারায় বয়।' ব্যস তার কথা দিয়েই দিব্যি কাটিয়ে দিলাম কিছুটা সময়। অবশ্যই নিজের মত করে হিন্দিতে। যখন থামলাম শুনতে পেলাম প্রচুর হাততালি। একটি ছোট্ট মেয়ে এসে হাতে একটা ফুলের তোড়া দিয়ে প্রণাম করলো আমায়। ফুলের তোড়াটা নিলেও প্রণামটা আমি অর্পণ করলাম কালকূটকেই। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উপহার পেলাম একটা ফোলিও ব্যাগ তার মধ্যে একটা প্যাড, পেন আর এক প্যাকেট শোনপুরের বিখ্যাত মিষ্টি শোন মিঠাই। এদের আন্তরিকতায় মন ভরে গেল।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা নামছে। আর আরো বেশী করে আলো ঝলমলে হয়ে উঠছে মেলা। আলোর মাঝেই উন্মোচিত হচ্ছে মেলার অন্ধকার জগৎও। প্রচুর লোকে ভীড় করে টিকিট কাটছে হিন্দী-ভোজপুরি রোমান্টিক নাচ-গানের লাইভ সো দেখতে। রাত যত বাড়বে তত আর্টিস্টদের প্রোগ্রাম খোলা-মেলা হতে থাকবে। সেই সাথে বাড়তে থাকবে টিকিটের দামও। এই অনুষ্ঠানের পোষাকী নাম 'থিয়েটার'।; হাতি দেখা হয়নি, দেখা হলোনা এই মেলার আর এক আকর্ষণ 'ভুতখেলি'। গঙ্গার তটের একেবারে সামনে পূর্ণিমার দিন আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর ভুতে ভর করা মানুষ আসে। তারপর নানারকম ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দিয়ে ভগত (ওঝারা) এদের ভূত ছাড়ায়।

ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম গজ গ্রহের মূর্তির সামনে। কালো পাথরের রঙ করা হস্তি কুম্ভীরের লড়াইয়ের ভঙ্গিতে মূর্তি। তাদের মাথার উপরে প্রকট হয়েছেন গরু বাহন স্বয়ং নারায়ণ। তাঁর হস্ত নিক্ষিপ্ত চক্রে মৃত্যুমুখে করাল কুম্ভীর। হাতি শুঁড়ে করে ধরে আছে একটি পদ্ম। তারপর পা চালালাম পর্যটন গ্রামের দিকে।

পরদিন ভোর হতেই শোনপুর ছেড়ে রওনা দেব বৈশালির দিকে। ভারতের প্রথম গণরাজ্য। যেখানে বুদ্ধদেব তার শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলে। সেই মাটি যেখানে সভানর্তকী আম্রপালি বুনেছিলেন কিংবদন্তির বীজ। সে গল্প অন্য কোনসময়ে।

মেঘালয় : স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটনে এক নতুন দৃষ্টান্ত

শুভময় দত্ত

আসম, অরুণাচল প্রদেশে শিক্ষামূলক ভ্রমণের পর উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য মেঘালয়ে যেতে হয়েছিল। অতীতে মেঘালয়ের নাম শুনেছি কিন্তু শিক্ষামূলক সমীক্ষার যে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন হল তা অনবদ্য। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেঘালয় এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। মেঘালয়ের সুস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও পর্যটন ব্যবস্থার এক প্রভাব রয়েছে। ১৯৭১ সালের প্রথমার্ধে রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার পর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। পার্বত্য সংকুল হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তবুও এলাকার মানুষজন সবকিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। অতীতে বিভিন্ন

রাজ্য ভ্রমণের কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকলেও মেঘালয়ের মতো এতটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাজ্য দেখিনি। পর্যটন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই এই রাজ্যের অর্থনীতির প্রতিপালন হচ্ছে। শিলং, চেরাপুঞ্জি, গারো ও খাসি হিল অঞ্চলের পর্যটনকেন্দ্র গুলি সকলের কাছেই চিত্তাকর্ষক।

নানা ভাষা - নানা পরিধানকে উপজীব্য করেই গড়ে উঠেছে এখানকার কৃষ্টি সংস্কৃতি। খাসি, গারো, কোচ এবং রাভা জনজাতির লোকেদের সংখ্যাই বেশি। পাশাপাশি অন্যান্য উপজাতি অর্ন্তভুক্ত মনুষ্যবর্গের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। উপজাতিভুক্ত জনগণের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কিছু সংখ্যক মানুষ এখানে বসবাস করছেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসম থেকে অনেকেই জীবন জীবিকা নির্বাহ কল্পে শিলং ও তার পাশ্ববর্তী এলাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আছেন বেশ কিছু নেপালী।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র : মেঘালয় রাজ্য মূলত তিনটি বিভাগে বিভক্ত—জয়েন্তিয়া হিল ডিভিশন, খাসি হিল ডিভিশন, গারো হিল ডিভিশন। উক্ত তিনটি শ্রেণির মধ্যে প্রত্যেকটি ডিভিশনের অধীনস্ত জেলা রয়েছে। ১১টি জেলা রয়েছে সর্বমোট-পশ্চিম জয়েন্তিয়া হিল অঞ্চল (জোয়াই), পূঃ জয়েন্তিরা হিল অঞ্চল (খেলিয়েরিয়াত), পূর্ব খাসি হিল অঞ্চল (শিলং), পশ্চিম খাসি হিল অঞ্চল (নঙপেইন), দক্ষিণ-পশ্চিম খাসি হিল অঞ্চল (মউখরয়াত), রাই-ভোই (নংপোহ), উত্তর গারো হিল অঞ্চল (রেগুবেলপায়া) পশ্চিম গারো হিল অঞ্চল (উইলিয়াম নগর) দক্ষিণ গারো হিল অঞ্চল (বাঘমারা), পশ্চিম গারো হিল (তুরা) দক্ষিণ-পশ্চিম গারো হিল অঞ্চল (আম্পতি)। তথ্যানুযায়ী প্রায় প্রতিটি জেলাতেই অঞ্চল ভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে-১৩৯ টি, তার মধ্যে ১০৮ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (Primary Health centre) পরিকাঠামোগতভাবে উন্নত, কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র আবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে আলাদা নজর দেওয়া হয়েছে। দূরত্বজনিত

বহুশ্রমের পর আমাদের এক সদস্যার শারীরিক পরিস্থিতি অবনতি হলে আমাদের পরিচালক নিজস্ব দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে খাসি পার্বত্য অঞ্চলের এক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। প্রথম দিকে আমাদের এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দেখে বড়ো হাসপাতাল বলে মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরই ভুল ভাঙল। মেঘালয়ের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র যে এতটাই উন্নত তা ধারণার বাইরে। ডাক্তার, নার্স', কর্মচারিদের ব্যবহার অত্যন্ত নম্র ও মার্জিত। বহির্বিভাগ, অভ্যন্তরীণ বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা বিদ্যমান, একজন স্বাস্থ্য আধিকারিক তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। দ্রুতই বেড মিলে গেল। বিনামূল্যে সমস্ত ওষুধের ব্যবস্থা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই রয়েছে এবং যা বেশ গুণগত মান সম্পন্ন। ব্যক্তিবিশেষে থাকে আলাদা বুঝিয়ে দেওয়ার লোক, প্রায় সমস্ত বিভাগই রয়েছে এখানে। শিশু, প্রসূতি, চর্ম ও সাধারণ বিভাগের পরিকাঠামো বেশ উন্নত। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অসংখ্য মানুষের জমায়েত সত্ত্বেও পরিবেশ কোলাহল মুক্ত। যা নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার এক বিরল দৃষ্টান্ত। ঘন্টা দুই পর কর্তৃপক্ষ আমাদের সদস্যাকে ছেড়ে দিলেন। সমস্ত মেঘালয়ের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো প্রায় একই রকম, সরকারিভাবে প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩০ টি বেডের অনুমোদন রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে এই সংখ্যা আরও বেশি। জেলা ভিত্তিক বা শহরকেন্দ্রিক বড়ো বেসরকারি হাসপাতাল থাকলেও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের গ্রামীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC) ভরসা জোগায়।

পর্যটনে মেঘালয় :

কেবল মেঘালয় নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল পর্যটন শিল্প। চেরাপুঞ্জি, ডাউকি, মশমাই গুহা, এশিয়ার পরিচ্ছন্ন গ্রাম, লিভিং রুটব্রিজ, প্রচুর ঝর্ণাধারা, অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র, খ্রিস্টান উপাসনালয়, মউপলাং বনাঞ্চল সহ প্রচুর জায়গা। একেবারে সভ্যতার ঊষালগ্নের বেশকিছু নিদর্শন দেখা যায়। ঔপনিবেশিক স্থাপত্যকলার এক আশ্চর্য চিত্রপট এই রাজ্যে পরিলক্ষিত হয়। সমাধি, সৌধ, খ্রিস্টান উপাসনালয় সমূহে পশ্চিমি স্থাপত্যের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়। তবে, পর্যটন শিল্পের ব্যবসা বর্তমানে প্রভাবশালী ও বিত্তবানশ্রেণির হাতে ন্যস্ত হওয়াতে একটা শ্রেণির ব্যবসায়ীরা যারা আর্থিকভাবে অনগ্রসর তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।

ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় প্রভাব :—

একটা সময় উত্তর পূর্ব ভারতে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে দুটি ক্ষেত্রে যার প্রভাব পড়েছে বেশি, তা হল - ধর্ম এবং শিক্ষার। এই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারি বা ইভানজেলিকানদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। ধীরে ধীরে তৈরি হতে লাগল ধর্মীয় চর্চা ও শিক্ষাচর্চাকেন্দ্র। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রৌটেস্টান্ট উভয় ধর্মমতই রয়েছে। তাদের নিজের উপসানালয় গুলিও দেখা যায় মেঘালয়ে। খ্রিস্টান উপাসনালয় গুলি ইউরোপীয় স্থাপত্য কলার বিবিধ দিক অনুসরণ করে নির্মিত। ঔপনিবেশিক অধ্যায়ের থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা অনগ্রসর এলাকা গুলিতে জলকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি ধর্মান্তর শুরু করেন। পাশাপাশি শুরু হয়ে মিশনারি অনুসারী বিদ্যাচর্চা। ততদিনে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকরা এই অঞ্চলে জাঁকিয়ে বসেছিল। গারোসহ উপজাতিদের বিদ্রোহগুলি অস্তমিত।

মেঘালয়ে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই মিশনারিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপজাতিদের অধিকাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সংস্কার, লোকরীতি, পোশাক আজও বিদ্যমান। অবসর বিনোদনের জন্য তারা এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালনা করে থাকে।

কৃষি ও অর্থনীতি :

সাধারণভাবে মেঘালয়ের মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং পরিশ্রমী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কীভাবে পাহাড়ের গায়ে বসবাস করছে। নিত্য দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজে লিপ্ত হচ্ছে। প্রধানত ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতির চল দেখা যায়। ফুল-ফল বিক্রি করেও অনেকে জীবন অতিবাহিত করছেন। পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য ও হস্তশিল্পের মাধমেও রোজগার করে প্রচুর পরিবার বেঁচে রয়েছে। অনেকে যুক্ত পর্যটন শিল্পে।

শিক্ষা বিস্তার :

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেঘালয় অগ্রগতি ঘটিয়েছে। জাতীয় মানের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষাতেও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনির্ভাসিটিতে বিশ্বমানের গবেষণা চলছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিচালিত জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উপর পাঠক্রম চলছে। শিক্ষাপ্রসার, জলকল্যাণের দিক দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকাও উল্লেখ্য। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই সমগ্র ভারতের শিক্ষার্থীরা এই রাজ্যে পড়াশোনা করতে

আসে। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে চলছে দীর্ঘদিন। তাই সরকারি ও বেসরকারি বেশীরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যম হল ইংরেজি। আঞ্চলিক ভাষাতেও শিক্ষাদান চলে।

শিলং শহর :

রাজ্য হিসেবে মেঘালয় উন্নয়নশীল। একদা পাহাড়ের রাণী শিলং শহর হিসেবে বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বেড়ে শহর এখন ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। খাসিরা মূল বাসিন্দা হলেও প্রচুর বাঙালিও পাঞ্জাবি রয়েছেন। জনসংখ্যা বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি। ব্যবসা মূলত মাড়োয়ারিদের দখলে। বেকার খাসি যুবকরদের মধ্যে তাই ক্ষোভ রয়েছে।

লাগামহীন বাড়িঘর তৈরি পার্বত্য অঞ্চলে বিপজ্জনক। দূষণমুক্ত রাখতে পৌরব্যবস্থার কৃতিত্ব রয়েছে। নিকাশি নালার সংস্কার আরও ভালোভাবে হওয়া দরকার। পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে। পৌরব্যবস্থা এখন বিত্তবান, ক্ষমতাসীনদের দখলে। কাজেই জলকল্যাণে কতটুকু কাজ দুনীর্তিমুক্ত ভাবে হয় তা বলা শক্ত। তবে ক্ষমতার পালাবদলের পর পরিস্থিত কোন দিকে বাঁক নিয়েছে এই ব্যাপারে অনুপুঙ্খ যাচাই প্রয়োজন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এই শহরকেও গ্রাস করেছে, G.S.T-এর প্রণয়নে মূল্যবৃদ্ধি বেড়েছে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি :

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি বরাবরই জাতীয় চরিত্রের রূপ থেকে আলাদা। আঞ্চলিক দলগুলি নিয়ন্তাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে সাময়িক পরিস্থিতির নিরিখে গেরুয়া আধিপত্যবাদ ক্রমশ জাল বিস্তার করেছে। আঞ্চলিক দল ভাঙিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসা, পেশিশক্তির প্রদর্শনে হিংসাত্মক রাজনীতির চরিত্র সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে জনসমক্ষে এসেছে। গতবছরের প্রথমার্ধে প্রত্যক্ষ করেছিলাম অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এখন আঞ্চলিক দল N.P.P কে সমর্থন করে বি.জে.পি তার আধিপত্য স্থাপন করতে চাইছে। তবে একচেটিয়া গৈরিকিকরণ আদৌ উত্তর-পূর্বে কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে এবং শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সমাজ সংস্কৃতি গঠনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করবে তা অদূরভবিষ্যৎ বলবে। বলাবাহুল্য যে বি.জে.পি- সর্ন্তপণে তার সংগঠনকে মেঘালয়ে ঢেলে সাজিয়েছে তার আভাস গতবছরই পেয়েছিলাম। এখন তো নতুন করে মেঘালয়ে জাতিগত অসন্তোষ শুরু হয়েছে।

উপসংহার : চলমান জনজীবনে ঘাত-অভিঘাতকে সম্বল করে মেঘালয়বাসী তাদের পথে এগিয়ে চলছে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে মেঘালয় থেকে অনেক কিছুই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। ভালো-মন্দ মিলিয়ে সমাজ-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পর্যটনে মেঘালয়ের যে বিকাশ ও ব্যাপ্তি ভারতে, তা বিবেচনার বিষয়। ভবিষ্যতে এই রাজ্য শান্তি সুস্থিতিতে নজির তৈরি করবে এই প্রত্যাশাই সকলের থাকবে।

- ➤ মহাকাশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ। চাঁদে পা রেখেছে কবেই। লাল গ্রহে অবতরণ করে সমীক্ষা চালাচ্ছে মঙ্গলযান 'কিওরিসিটি'। এবার নয় কোটি মাইল দূরে সূর্যের দিকে নাসার ডেল্টা-৪ রকেটে করে পাড়ি জমাল মহাকাশযান 'পার্কার সোলার প্রোব'। আপাতত তাপরোধী বর্ম পরে সূর্যের ৩৯ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ চালাবে।
- ➤ বিশ্বের ৩৪ তম এবং ভারতের ১১ তম ও উচ্চতম ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ হিসাবে স্বীকৃতি পেল ২,৯৩১ বর্গ কি.মি. আয়তনের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ (কে.বি.আর.)' যার কোর এরিয়া ১,৭৯৪ বর্গ কি.মি.-র 'কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক'। পশ্চিম সিকিমে অবস্থিত এই অরণ্যে রয়েছে সাড়ে চার হাজার প্রজাতির ফুলগাছ, ৪২৪ প্রজাতির ওষধি বৃক্ষ, ৩৬ ধরনের রডোড্রেনডন, ১১ রকমের ওকগাছ ইত্যাদি। রয়েছে লালপান্ডা, তুষার চিতা, মেঘলা চিতা, কালো ভল্লুক, নানা ধরনের হরিণ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি।
- ➤ হিন্দুত্ববাদী আততায়ীদের গুলিতে প্রয়াতা গৌরীলঙ্কেশ আজ ভারত জুড়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃত্যুর বর্ষপূর্তিতে ৫ সেপ্টেম্বর '১৮ ব্যাঙ্গালুরুর বুকে 'আই অ্যাম গৌরী' ফেস্টুন নিয়ে দৃপ্ত মিছিল হল রাজভবন অভিমুখে। তাতে অংশ নিলেন স্বামী অগ্নিবেশ, গৌরীর সহোদরা কবিথা লঙ্কেশ, অভিনেতা প্রকাশ রাজ, মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শেতলবাদ। একই দিনে গৌরীর 'পত্রিকে'-র পুনর্জাগরণ ঘটাতে প্রকাশিত হল সাপ্তাহিত কন্নড় ট্যাবলয়েড 'নয়া পথ'।
- ➤ এক ঐতিহাসিক আইন বলে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাকরঁ-র সরকার স্কুলে মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, স্মার্ট ওয়াচ সহ ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস ব্যবহার নিষিদ্ধ করল। তাদের আশা এর ফলে শিশু-কিশোরদের স্কুলের মধ্যে অমনোযোগিতা ও অপরকে আক্রমণ করার মনোভাব কমবে, ক্লাসের ফাঁকে খেলাধূলা, দেহচর্চা প্রভৃতি শারীরিক কার্যকলাপ বাড়বে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিংসাশ্রয়ী ও বিকৃত যৌন ভিডিও, সিনেমা, ছবি, বক্তব্য প্রভৃতি আদান-প্রদান কমবে।
- ➤ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দশটি দেশের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন স্ট্যাফাইলোকক্কাস এপিডারমিডিস্ বা এম.আর.এস.এ বাগ হাসপাতাল ওয়ার্ড থেকে সংক্রামিত হচ্ছে যা প্রচলিত কোন অ্যান্টিবায়োটিক মারতে পারছে না।

শিল্প-সংস্কৃতি

জনতার সাহিত্য উৎসব
বস্তার সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (কলকাতা চ্যাপ্টার -২০১৮)

মৃদুল কান্তি সরকার

হাঁসদা শোভেন্দ্র শেখর এখন কলকাতায়, কলকাতায় এখন ঝাড়খন্ডের জসিন্তা কেরকেট্টা, রিনচিন, হরিপ্রিয়া শৈবম, মুম্বাইয়ের ইড়াভি, অন্ধ্রের কুট্টি রেবতী, ভিসু রিচা কোচা এবং আরো অনেকেই। এঁরা বিশেষ জনগোষ্ঠী বা অন্য ভাষা বা ধর্ম সংস্কৃতির প্রচারের কাজে নয়, এসেছেন নানা সংস্কৃতি—ঐতিহ্যের, বৈচিত্র ও ঐক্যের কথা বলতে—এসেছেন জীবনের কথা বলতে।

বিগত কয়েক দশক যাবৎ, রাষ্ট্র একদিকে তার বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক শিল্পীর স্বাধীনতায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে, অন্যদিকে, সাহিত্য থেকে রাষ্ট্র এবং তার সান্নিধ্যে থাকা ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে সমালোচনা অথবা যে কোন ধরনের বিরোধাভাসকে মুছে ফেলতে সদা তৎপর। এই প্রয়াসেরই অংশ হিসাবে একদিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে স্কুলের পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের সৃষ্টি, কখনো কলম ছাড়তে, তো কখনো বা দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, এমনকি সরাসরি হত্যাও করা হয়েছে মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী সাহিত্যিক ও যুক্তিবাদী লেখকদের। ফলস্বরূপ নিজেদের কলমের মাধ্যমে যে সমস্ত শিল্পী প্রকাশ্যে এনেছেন দলিত, মুসলমান ও আদিবাসী সমাজের যন্ত্রণার কথা, ব্যক্ত করেছেন নারী স্বাধীনতা, সমকামীদের স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষার দাবি, ফুটিয়ে তুলেছেন গোর্খাল্যান্ড, কাশ্মীর অথবা উত্তর পূর্ব ভারতের একাধিক প্রদেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও তাদের জাতিসত্ত্ব আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ের কথা। সাহিত্যের এমন সংকটের মুহূর্তেও একাধিক সাহিত্যিক তাঁদের কলমের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত দ্রোহ ঘোষণা করেছেন। লিখেছেন প্রান্তিক সেই সমস্ত মানুষের কথা, যাঁদের কথা রাষ্ট্র শুনতে অথবা শোনাতে চায় না। এমনই একাধিক সাহিত্যিককে সম্মান জানাতে এবং তাদের সাহিত্যকর্ম উদ্‌যাপনের লক্ষে, বাস্তার সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (কলকাতা চ্যাপ্টার)-এর উদ্যোগে আয়োজিত জনতার সাহিত্য উৎসব ২৪ ও ২৫ মার্চ ২০১৮ দেখার, শোনার সুযোগ হয়েছিল বেলেঘাটার সুকান্ত মঞ্চে (ফুলবাগান)। মঞ্চে তেমন আলোর ঝলকানি নেই পুরোনো ফ্যানগুলো ঢিমে তালে চললেও ঘর্ঘর শব্দের কর্কশতা নেই। ৫০০ লাল-সবুজ চেয়ারে সবটাই পরিপূর্ণ। আর পাঁচটলিট ফেস্ট-এর মতো ঝাঁ চকচকে সাজানো গোছানো ধরনের বাইরে এই অনুষ্ঠান। এটা জয়পুর লিটারির ফেস্টিভাল নয়, এখানে তেমন সেলেব (Celebs), বাজে বকবকানি, মনভোলানো আলোচনা সভার বা সামরিক যুদ্ধ অভিযান প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করতে আসা নয়, এটা এক সাধারণের সভা। আয়োজকদের অধিকাংশই ইউনিভার্সিটির ছাত্র, গবেষক আর পড়ুয়ার দল। প্রথম দিন ২৪ মার্চ বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হল দিব্যকলম, ঋষভ, রণিতা, নবোত্তমা অভিজ্ঞানের গানের দল ‘আল-অন’-এর কোরাস গণসঙ্গীত দিয়ে। দিনের প্রথম পর্বের বিষয় ‘বাচ্চারা কেউ ঝামেলা কোরো না’। শিশু সাহিত্যের চেনা ছক ভেঙে ছোটোদের জন্য আদ্যন্ত রাজনৈতিক গল্প। লেখক, রাজনৈতিক সংস্কৃতিক কর্মী‘রিনচিন’ যার গল্পের প্রোটাগনিস্টরা সকলেই পাহাড় জঙ্গলের গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে শহরে কাগজ কুড়ানি বস্তিতে থাকা মধ্যপ্রদেশের ‘পরাধি’ উপজাতির ছোট্ট মেয়ে রেঞ্চু, আদিবাসী লড়াকু শিশু মাটি, রঙ পেনসিল দিয়ে আঁকার খাতা রাঙিয়ে দিতে চাওয়া সাবরি’রা সকলেই তাদের অদম্য জেদকে পুঁজি করে সমাজে টিকে থাকতে চায়। রিনচিন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসীদের জীবন সংগ্রামের কথা বলেন। নাগাল্যান্ডের লেখক ‘ভিসু রিতা কোচা’ তাঁর Suki’s Magic Box, A Bucket of Rain, Echos of Spring নিয়ে নাগা লোককথা, মুখে মুখে ঘোরা গল্পের কথা বললেন। বামপন্থী নাট্যকর্মী ‘অঙ্কুর’ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায়, নাটক মাত্রেই তার চলন হবে ভারিক্কি ও শহুরে অ্যাকাডেমিক বুদ্ধিজীবী ধাঁচের, এমন নয়। পরের বিষয় ‘কবিতা দিলাম তোমায় আজকে ছুটি’, সঞ্চালনায় নন্দিনী ধর। অংশ নিলেন ঝাড়খন্ডের মনোহরপুরের প্রত্যন্তগ্রামের আদিবাসী মেয়ে জসিন্তা কেরকেট্টা, ইনশাহ মালিক ও চন্দ্রমোহন এস। জসিন্তার কবিতা জানান দেয় রাষ্ট্র নির্ধারিত উন্নয়ন এর কোপে উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসী পরিবারের ক্ষোভ, খনিজ উত্তোলন ও বাঁধ প্রকল্পের ফলে বিষিয়ে যাওয়া জল-জঙ্গল-জামিনের কথা। জসিন্তার জনহিতার্থে কবিতাটি শুনুন—

আমার পোষা কুকুরকে
শুধু এই জন্যই মারা হয়েছিল
কারণ ও বিপদ দেখে ঘেউ ঘেউ করেছিল।
ওকে মারার আগে ওরা
পাগল ঘোষণা করেছিল
আর আমাকে নকশাল
জনহিতার্থে.....For the sake of public interest.

কাশ্মীরি কবি ইনশাহ মালিক তার কবিতা সিরিজ A Poem of Death উল্লেখ করেন। কাশ্মীরি যুবকদের প্রতিদিনের হত্যাকান্ডে ভারতীয় সেনারা যেভাবে রাষ্ট্রের মান্যতা পায়, যুক্তি সাজায় ইনশাহ তার বিরোধিতার কথা বলে। চন্দ্রমোহন এস প্যান্থার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত কবি। দলিতের পাশাপাশি আদিবাসী, মুসলিম নারী, এমনকি গৈরিক ফ্যাসিবাদের নির্মম সমালোচক চন্দ্রমোহন বলেন এদেশে

মুসলিমদের সারাক্ষণ তাঁদের দেশ ভক্তির পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়, দলিতদের প্রমাণ করতে হয় মেধা।

আম্বেদকারপন্থী নারীবাদী মারাঠি কবি ছায়া কোরে গাওকার বললেন, কন্যাভ্রুণ হত্যা থেকে দিল্লির জ্যোতি সিং-এর ধর্ষণ কথা। ছায়ার অস্ত্র কলম, না লিখলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। সকলেরই কিছু না কিছু রয়েছে, আমার কাছে কলম। পরের বিষয় 'হায় হক্ হামারি' সঞ্চালনায় রিনচিন। মুসলিম মাত্রেই অসহায়, পরিবারের নিপীড়িত, প্রচলিত সমাজ সম্পর্কে একমাত্রিক ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে হাসিনা খান বললেন। কাশ্মীর উপত্যকার লেখক সাহানাজ বশির তাঁর Half Mother উপন্যাসের গল্প শোনায়। Scattered soul-এর ১৩টি গল্পের ১টি গল্পে অস্ত্র ছেড়ে দেওয়া প্রাক্তন যোদ্ধার কথা যার আর কোনদিন স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয় না...। ট্রানজিস্টারের শব্দকেও ভ্রম হয় ওয়াকি-টকি বলে, মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়ায় মহল্লায়। একটু সময় বিরতি দিয়ে শুরু হল 'কালাদাস দহারিয়ার' গানের দল 'রেলা'র গান। গন্ডি ভাষায় রেলা শব্দের অর্থ জনগণের বিপ্লবী সমাবেশ। ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, কর্ণাটক, কেরালা ও উত্তরাখন্ডের বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক দল ও গবেষকদের নিয়ে যৌথমঞ্চ 'রেলা'। কেউ গান করেন কেউ বা পথনাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেন লিঙ্গবৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষের কথা, শ্রমিকশ্রেণির অধিকারের কথা। ছোট্ট দুটি মেয়ে পায়ে তাল ঠুকে ঠুকে গান গায়, বাদ্য বাদকের দলের কোরাস এক অনবদ্য রোমহর্ষক মুগ্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি করে সারা হল জুড়ে। প্রত্যেক দর্শকের হাততালি দিয়ে তাল ঠোকা এক মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছিল।।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম পর্বের আলোচনা, 'আমার শরীর আমার মন, দূর হটো রাজ শাসন,' সঞ্চালক নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত, অংশ নিলেন ইরাভি, হরিপ্রিয়া সইবাম, হাঁসদা শোমেন্দ্র শেখর, কুট্টি রেবতি। 'ইরাভি' ছদ্মনামে লেখেন মুম্বাই-এর নারীবাদী ও কুইয়ার (queer) আন্দোলনের কর্মী 'স্মৃতি'। No outlaws in the gender galaxy- এর লেখিকা সম্পাদনা করেন সমকামী ও উভকামী মহিলা এবং রূপান্তরকামীদের সংগঠন 'লেবিয়া' (Labia) কালেকটিভ প্রকাশিত পত্রিকা 'স্ক্রিপ্ট'। 'আমার যোনি আমার নিজের যুদ্ধক্ষেত্র, আমার শরীরের প্রতি ইঞ্চি, প্রতি অন্ধকার আমার নিজের,' মণিপুরে রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন বা নারী শরীরে রাষ্ট্র ও সমাজের দখলদারি— অন্তর্নিহিত পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র কলম ধরেন কবি হরিপ্রিয়া শৈবম। সামাজিক আক্রমণ বা প্রবল সমালোচনাকে উড়িয়ে দিয়ে নারীবাদী রাজনৈতিক বিশ্বাসে অটল হরিপ্রিয়া। 'মুলইগল' (স্তন) বইটি লিখে প্রবল সামাজিক রোষের মুখে পড়েন তামিল কবি 'কুট্টি রেবতী'। সমস্ত বিধিনিষেধকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নারী শরীর যে শুধুই ভোগপণ্য, বা শুধুই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র অথবা ক্ষমতা প্রদর্শনের যুদ্ধক্ষেত্র নয় তা প্রমাণ করে চলেছেন তার লেখনির মাধ্যমে।

হাঁসদা শোভেন্দ্র শেখরের বেড়ে ওঠা সুবর্ণরেখা নদীতীরের ঘাটশিলা (Bronze Town) শহরে। পড়াশোনা মুসাবনি গ্রামের স্কুলে, জামশেদপুর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে জঙ্গল ঘেরা Copper Mines অঞ্চলে। ২০১৪ সালে প্রথম উপন্যাস The Mysterious Ailments of Rupi Baskey বছর বাদে সাহিত্য একাডেমির যুব পুরস্কার পায়। কি লেখা ছিল বইতে—ছিল এক আদিবাসী পরিবারের কাহিনী যার প্রেক্ষাপটে রয়েছে পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্য হয়ে ওঠার গল্প। ২০১৫ সালে দ্বিতীয় বই 'The Adivasi will not dance' বই প্রকাশ হতেই আদিবাসী ইনটেলেকচুয়াল সমাজে হইচই শুরু হয়ে গেল। ঝাড়খন্ড সরকারের প্রশাসন তাঁকে সাসপেন্ড করল চাকরি থেকে। পাকুড় হসপিটালে মেডিক্যাল অফিসারের চাকরিটি তাঁর আর থাকল না। সামাজিক বয়কটের নিদান ঘোষণাও হল আদিবাসী সমাজে।

বইটির একটি গল্পে সোভেন্দ্র এইরকম বাক্য দিয়ে গল্পটি লিখছেন— 'November is the month of migration, it is about a Santal woman, Talamai, who migrates to West Bengal during the paddy harvest season. She stoically agrees to have sex with a police man at a Railway station in exchange for Rs. 50& two cold pakodas... She knows the routine.... She knows everything is done by the Man...in less than 10 minutes the work is done.তালামাইয়ের এই গল্প দারিদ্র্যের কথা বলে, ক্ষুধার কথা বলে, বলে চরম হতাশার কথা— রাষ্ট্রের আগ্রাসন ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রচরিত্র ফুটে ওঠে ব্যঞ্জনায়। যৌন সম্পর্ক ঘিরে কোন ফ্যান্টাসি নয় বরং নির্মম বাস্তব হাজির করে 'তালামাই'। 'দ্য আদিবাসী উইল নট ডান্স' এর শেষগল্পে আদিবাসীদের উৎখাতকারী উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করতে আসা রাষ্ট্রপতির বোতাম টেপা পুতুল হতে। চিৎকার করে প্রতিবাদ করে বলে সে, 'আমাদের তো কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকল না, ফসল তৈরির মাঠ থাকল না। কি করে এই Power plant-কে আমাদের ভাল বলব! আর আমরা আদিবাসীরা কিভাবে নাচব-গাইব- কেমন করেই বা সুখে থাকব।'

পরের পর্বে 'চিত্ত প্রসাদের আঁকায় কৃষক সংগ্রাম' উপস্থাপনা করলেন অশোক ভৌমিক— আর জেল চিত্র দেখালেন মুম্বাইয়ের অরুণ ফেডেরা। শেষ পর্বে 'ইতর বাংলা সাহিত্যে গ্রাম শহরের অন্তজনের কথা' বললেন আনসারুদ্দিন, কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, দীপক কুমার রায়। আফসার আহমেদ অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁদের মাঠে-ঘাটের অভিজ্ঞতা অন্ত্যজদের গোষ্ঠীজীবনের জীবনচর্চা নিয়ে বললেন। দীপক কুমার রায় দোতারা চেয়ে নিয়ে ভাওয়াইয়া গান ধরলেন। অন্যন্য এক অভিজ্ঞতা লাভ হল এই দু'দিনে। অভিনন্দন বস্তার সলিডারিটি'র কর্মকর্তাদের।

➤ ভূতাত্ত্বিক ও গবেষকরা তথাকথিত প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম ধাত্রীগৃহ বর্তমান হরিয়ানার রাখিগারিতে খনন করে প্রাপ্ত দেহাবশেষগুলির ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখেছেন তারা প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় জনজাতি এবং ইরাণের প্রাচীন কৃষি ও পশুচারক জনজাতির মিশ্রণ যা সঙ্ঘ পরিবারের 'ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ববাদী প্রাচীন উত্তর গোলার্ধীয় জাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত।

চিঠিপত্র, রিপোর্ট

Citizens' Statement on Police Violence Against Sterlite Protestors in Thoothukudi

Police violence in Thoothukudi has left several people dead and many more injured. Not only was this tragedy totally avoidable, it appears that the Police have even given hot pursuit and shot at women and others in fishing hamlets like Theresepuram. The sheer brutality of the police action reminds one of the manner in which the Jallikattu protests were dealt with.

The Government of Tamil Nadu, Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change, the Tamil Nadu Pollution Control Board and the Thoothukudi District Administration are squarely responsible for allowing the situation to get to this unfortunate state by allowing Vedanta Sterlite to violate environmental and land use planning laws with impunity for over two decades.

The people who died are just ordinary people who have been forced to take to the streets, and march to the Collectorate to demand action from an administration that has systematically and for decades failed to enforce the law on Sterlite. The District Collector, the chairperson and member secretary of Tamil Nadu Pollution Control Board, the Secretaries holding the environment portfolios in the central and state governments, the ministers of environment at the state and centre, and the chief minister of Tamil Nadu need to account for their inaction in the face of overwhelming evidence of illegalities, environmental harm and damage to public health.

This is not the first time that Sterlite's pollution and the impunity it enjoys has been the cause of public anger in Thoothukudi. In 2013, the Supreme Court of India curiously found the company guilty of misrepresentation, unlicensed operation and polluting the environment, but allowed the company to operate after paying a small fine as it felt India needed the copper.

The company failed to reform its ways even after this narrow judicial escape. The regulators - TNPCB and Ministry of Environment and Forests - too continued their cosy relationship with Sterlite ignoring blatant violations of statutory conditions and clear indications of pollution. It is a known fact that the state and central governments have allowed Sterlite to operate with lower-than-required chimney stacks, thereby exposing lakhs of residents to higher levels of toxic pollutants.

It has ignored the tentative findings of a government medical college's health study that reported higher incidence of certain health problems among the villagers living around the factory.

Let us not forget that for the second time in two months more than a lakh residents of this coastal town have taken to the streets with one clear demand: Immediate and Complete Shutdown of Sterlite. The state government and the district administration should also be blamed for failing to appreciate the depth of resentment among the people of Thoothukudi to Sterlite's illegal and polluting operations and the betrayal by the State of its people.

The Government of Tamil Nadu has lost its moral right to govern, and should at the very least ensure that the senior ministers who failed to read the signs properly and take preventive action resign. But before anything else, the Government of Tamil Nadu should have the decency to declare an end to the toxic terrorism unleashed by Sterlite and permanently close down the polluting unit.

Signed:

Henri Tiphagne, Advocate & National Working Secretary, Human Rights Defenders' Alert - India (HRDA), Executive Director, People's Watch

Justice D Hariparanthaman (Retd.)

MG Devasahayam, IAS (Retd.)

Vetri Maaran, Filmmaker

Charu Govindan, Voices of People

Dr. VVasanthi Devi, Former Vice-Chancellor, Manormanium Sundaranar University

Chandra Mohan, Arappor lyakkam

G Sundarrajan, Poovulagin Nanbargal

Nityanand Jayaraman, Writer and Social Activist

V. Geetha, Writer and Publisher, Chennai

Prema Revathi, Writer, Publisher and Actor, Chennai

Piyush Manush, Salem Citizen's Forum

A Mangai, Professor

VArasu, Professor

R Rathindran Prasad, Filmmaker

Divya Bharathi, Filmmaker

Sofia Ashraf, Writer and Rapper

Kavitha Muralidharan, Journalist, Chennai

Sujata Mody, President, Penn Thozhilalargal Sangam

M. Subbu, Tamil Maanila Kattida Thozhilalar

Sangam (TMKTS)
Dr. Rakhal Gaitonde, Public Health Researcher
Swarna Rajagopalan, Gender Equality Activist
Nadika Nadja, Writer, Chennai
L Ramakrishnan, Queer & Women's Rights activist
Ashley Tellis, LGBT activist
Srijith Sundaram, Theatre practitioner, Kattiyakkari
Amirtharaj Stephen, Photographers for Environment & Peace collective
Anushka Meenakshi, Filmmaker
Iswar Srikumar, Filmmaker
Archanaa Seker, Writer and Activist
Satyarupa Shekhar, Social Activist
Om Prakash Singh, Social Activist
Bharat Nayak, Founding Member & Editorial Director, The Logical Indian
Shweta Narayan, Environmental Researcher and Activist
Dharmesh Shah, Environmental Activist & Public Policy Researcher
Pooja Kumar, Chennai Solidarity Group
K Saravanan, Fisherman
Aiswarya Rao, Public Health and Disability Rights Activist
Balaji Sampath, Activist and Educator
Kaber Vasuki, Writer and Musician
Shravan Krishnan, Animals Rights Activist
Sudha Ramamurthy, Persons with Disabilities Rights Activist
Subathra, Arappor lyakkam
AR Dileep Srinivasan, The New Face of Society
Kavitha Rajendran, Coordinator - People's Platform Against Fascism
Ram Vaitheeswaran, Filmmaker
Mythri Prasad, Associate Fellow, Institute for Human Development
Sudipto Mondal, Journalist, Bangalore
Suseela Anand , Advocate
Sandeep K, Cinematographer
Elangovan kulandaivelu, COO, Zinnea
Gurumoorthy M, AID India Bangalore Chapter and Entrepreneur
Rajkumar Sivasamy, Bangalore
Steevez Rodriguez, Photographer
Venkatachandrika R., IT Engineer
Rahul Muralidharan, Researcher, Chennai
T Venkat, Independent Journalist, Chennai
Annapoorni Devaraja, Classical Dancer
Lakshmi Premkumar, Activist, Delhi,
Delfina Kanchana Sundar, Independent Researcher, Chennai
Namithaa Jayasankar, Queer Femme Activist
Samyuktha PC, Chennai, Theatre Director
Satwik Gade, Illustrator
Aparnaaa Nagesh, Founder, High Kicks dance ensemble
Ravindra Vijay, Actor
Akhil Al Hassan, Entrepreneur
Janani Sathviga, Pune
Sonal Jain, Social Entrepreneur
Pradeep Kuttuva, Researcher, Chennai
Pazhani Aarya, Researcher
M.Shreela, Law student
Amba Salelkar, Advocate, Chennai
Chenthil Nathan, Translator, Chennai
Ramya Sadasivam, Artist
Smitha Sadasivan, Member, Disability Rights Alliance, India
Gayatri Nair, Photographer
Nilakantan RS, Data Scientist
Dr. Anbudorai, Psychiatrist

Trade Uuions Meet to Counter Trade and Investment Liberalisation

MEDIA RELEASE : 20 April 2018

Bengaluru: Trade Unions representing workers in Information Technology (IT), Steel, Health-care, Water, Coal, Automotive, Transport, Banking and Insurance met in Bengaluru from 17-18 April for a National Workshop on *'Trade and Investment Liberalisation: Impacts on Workers in India'*. The workshop was organised by the Forum against FTAs, Public Services International (PSI), Third World Network (TWN) and Transnational Institute (TNI).

The workshop focussed on how India's engagement with Free Trade Agreements (FTAs) has undermined not just national development and sovereignty but also the creation of decent jobs and provision of quality public services. The opening panel (which included **Vijay Bhaskar** of All India Trade Union Congress (AITUC), **KN Umesh** of Centre of Indian Trade Unions (CITU), **Sanjyot Vadhavkar** of Hind Mazdoor Sabha (HMS), and S Q **Zama** of the Indian National Trade

Union Congress (INTUC) along with senior journalist **TK Rajalakshmi** from Frontline) discussed the impacts of deregulation and privatisation of the Indian economy on workers. Heightened competition has resulted in job losses, contractualisation and a downward spiral of wages. New proposals from the National Democratic Alliance (NDA) such as Fixed Term Employment (FTE) are part of the regressive agenda to dilute labour rights and decent work under the *'ease of doing business'* framework.

Prof. **Biswajit Dhar,** from Jawaharlal Nehru University (JNU) analysed the trajectory of global trade from the creation of the World Trade Organisation (WTO), proliferation of Free Trade Agreements (FTAs) and to the current challenge of mega FTAs. He explained that with global inequality at record levels, rising joblessness and the GDP to wage gap widening, neoliberal policies are facing a crisis of legitimacy. *"Despite the popular backlash against austerity and mega-FTAs as we have seen in Europe, and mounting evidence that the benefits of neoliberalism have accrued to the elite, the Asia Pacific region remains the hub of global trade,"* said Dhar. Based on his research Dhar provided evidence to show that in virtually all of India's FTAs, except with Singapore, India is facing a negative trade balance, i.e imports are increasing while exports are stagnating. For example the trade deficit with China increased from 1.5 US$ billion in 2004 to a whopping 53 US$ billion by 2017. In that context he argued that it does not make economic sense for India to be part of the mega FTA, RCEP (Regional Cooperation Economic Partnership) with China and 14 other countries. He underlined that the current trade architecture, by imposing binding commitments on India has resulted in a substantive loss of policy space, thereby undermining the possibility of an industrial policy that can address the jobs crisis and foster broad based national development.

Prof **Satyaki Roy,** from the Institute for Studies in Industrial Development (ISID) spoke of the fallacy of integration into the global economy through Global Value Chains (GVCs). GVCs are now the dominant framework in global production processes with some 80% of global trade being organised through these complex disaggregated networks. *'India's integration into GVCs at lower levels of production has undermined sustainable industrialisation. The result is a dependence on imports for domestic production in most sectors and a huge trade deficit. As industries are unsustainable, possibilities of decent work are undermined",* said Roy.

Public services are projected to be multi trillion dollar industries and emerging and lower-income countries are expected to drive this explosive growth. What this means is that developing countries, including India are the target of Transnational Corporations (TNCs) in these sectors. The privatisation of public services is a necessary step to create markets in sectors such as water, healthcare and waste management. But this process is not without contestation, as unions and social movements oppose privatisation and demand strict regulation of private providers. In these contestations, FTAs are a tool for TNCs to rig the game in their favour and impose the primacy of the free market logic on governments, lock-in privatisation and undermine popular demands to legislate and reverse privatisation.

As the corporate sector gains dominance in healthcare provision, profits are soaring. At the same time, there is a race to the bottom in terms of working conditions, wages and quality of services, with patients facing unethical practices and escalating costs. However, unions are able to fight back. The recent success of the struggle of nurses representing the United Nurses Association (UNA) at the Maharaja Angoran Hospital in Delhi was welcomed by the workshop (http://www.world-psi.org/en/striking-nurses-win-delhi-india).

The new arena for corporate profiteering: the digital economy where digital monopolies are aiming to block future avenues for regulation as well as have a free hand over big data was discussed. Precarious labour is disguised as flexible labour in what is called the 'gig' economy. As data and algorithms gain a central role in the IT sector, workers get alienated from the production process in the industry. The resultant de-skilling of the workforce further contributes to the existing trend of decreasing share of wages in GDP, thus furthering inequality.

As FTAs entrench a legal framework of rights for foreign investors, they are also setting up pro corporate judicial mechanisms through the secretive international arbitration courts called the Investor State Dispute Settlement (ISDS) mechanism. As TNCs promote a system where only they can raise claims against governments, progressive governments and people's movements are demanding a system in the United Nations (UN) where TNCs are held accountable for human rights violations, including along their value chains. A draft of the UN binding treaty on TNCs and Human Rights will be presented at the UN Human Rights Council in October 2018.The workshop also explored the possibilities for the ILO's tripartite mechanism to be used to raise claims against corporations for trade related impacts on workers.

The workshop concluded that the free trade agenda is driven by TNCs and their lobbies and the push for

'new generation' FTAs represent the era of deep liberalisation. They will effectively close democratic policy spaces that are required by Governments to promote, respect, protect and fulfil human rights and provide quality public services and goods essential for a life in dignity. In the concluding strategy sessions, the unions decided to take forward various plans including conducting regional meetings across the country and also collaborate with progressive unions in the Asia Pacific region to create an Asia wide network of Trade Unions for Trade Justice. A meeting to begin this process will be held in Singapore in May 2018 at the sidelines of the upcoming RCEP Trade Negotiations Round.

Unions that participated in the workshop include All India Trade Union Congress (AITUC), Centre of Indian Trade Unions (CITU), Hind Mazdoor Sabha (HMS), Indian National Trade Union Congress (INTUC), Steel, Metal and Engineering Workers Federation of India (SMEFI), Steel Workers Federation of India (SWFI), Chemical Mazdoor Panchayat (CMP), Working Peoples Trade Union Council (WPTUC), Volvo Workers Union, Bangalore, Nagpur Municipal Corporation Employees (NMCE), United Nurses Association (UNA), Mumbai Mahanagar Karmachari Mahasangh (MMKM), Forum for Information Technology Employees (FITE), Karnataka and Tamil Nadu, National Organisation of Government Employees (NOGE), All India National Life Insurance Employees Federation (AINLIEF) and Delhi Transport Corporation Employees Congress (DTCEC).

Groups such as All India people's Forum (AIPF), Industrial global union, Center for Financial Accountability (CFA), Doctors Association for Social Equality - Tamil Nadu, IT for Change, and Bharath Gyan Vigyan Samithi (BGVS), Karnataka also participated.

For more information contact:
Susana Barria, Public Services International (PSI). 9958812915. susana.barria@world-psi.org

Joint Statement condemning arrest of activists and public intellectuals

We, the undersigned, are shocked by the serial raids across the country on the homes of activists and public intellectuals who are critical of the government and the ruling party at the Centre. The arrests of prominent activists and intellectuals Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves, Gautam Navlakha, Varavara Rao, Arun Ferreira, Kranthi Tekula and others, are nothing but an attempt by the government to strike terror among those who are fighting for justice for the marginalised. This is also an attempt by the BJP to invent a false enemy and engage in scaremongering in order to polarise the 2019 elections in its favour. Already, the government and the media houses close to the BJP have been trying to spin a false narrative of a Maoist conspiracy since June, 2018. Terms like "urban naxals" are invented in order to stifle any criticism of the government. We have learnt that the Delhi Police, after having arrested Sudha Bharadwaj, waited for Republic TV to arrive before taking her to the court. This simply shows that the arrests are incomplete without the accompanying sensationalist media propaganda to demonise activists, human rights defenders and intellectuals.

The so-called raids carried out on the houses of these activists are aimed at creating a spectacle, as the writings and views of these intellectuals are already publicly known and are well documented. This seems like a conspiracy to divert attention from the gravity of the Sanatan Sanstha conspiracy to carry out serial bomb attacks on Eid and Ganesh Chaturthi! The same Sanatan Sanstha was also involved in the murder of Gauri Lankesh, as per the ongoing investigations by Karnataka police. Today's arrests have been carried out in order to give cover to the murderers of Gauri Lankesh. People like Sudha Bharadwaj, Gautam Navlakha and others who have been arrested are friends of the people who have dedicated their entire lives to the betterment of the Indian public. By arresting them, the BJP is only exposing its insecurities and its intolerance to any dissent or criticism of its policies.

The arrests should be seen in continuation with the recent attacks on pro-justice voices such as Swami Agnivesh, Umar Khalid and many other student activists from Delhi to Lucknow. A BJP lawmaker from Karnataka even advocated the murder of "intellectuals." Both the arrests and the physical attacks on justice loving people must be seen in a series of attempts to stifle dissent and deny social justice.

We demand immediate release of the arrested individuals, dropping of all false and malicious charges, as these arrests are politically motivated and unjustified.

[Shehla Rashid Shora, former Vice-President, JNU Students' Union, Mohit Pandey, former President, JNU Students' Union.; Paranjoy Guha Thakurta, Author, Journalist, Publisher. ; Neha Dixit, Journalist.; Jignesh Mevani, MLA Vadgam, Gujarat.; Sanam Sutirath Wazir, Human Rights Activist; Nakul Singh Sawhney, Documentary Filmmaker; Teesta Setalvad, Journalist and Social Activist; Harish Iyer, Equal Rights Activist; Swami Agnivesh, Arya Samaj, Social Activist.]

Solidarity to the Students Movement in Bangladesh

Over the past week or so schoolchildren and university students in Bangladesh have been demanding road safety, rule of law and justice. It has been reported that in the presence of the police, members of the student and youth wings of the ruling Awami League, the Bangladesh Chattra League and Jubo League, have been attacking unarmed young protesters, as well as journalists and photographers. It is also reported that several hundred protesters are being arbitrarily detained and subjected to police remand, including a pregnant woman. Freedoms of expression association and assembly are being unlawfully and arbitrarily suppressed.

In the late evening of Sunday 5 August 2018, internationally and nationally renowned photographer, academic and human rights activist, Shahidul Alam, was unlawfully abducted from his home, allegedly by law enforcement personnel, and without an arrest warrant. Yesterday, he was produced before the Dhaka Additional Chief Metropolitan Magistrate's Court, where the Detective Branch of Police submitted a prayer for ten days' remand. The Chief Metropolitan Magistrate, Asaduzzaman Noor, has granted seven days' remand in a case filed against him under Section 57 of the Information and Communication Technology (ICT) Act 2006 (amended in 2009 & 2013). As he was being carried into the court room, he is reported to have said to journalists present, "I was hit. They washed my blood-stained clothes and then made me wear them again". He is also reported to have said: 'I was not given access to any lawyer during detention' His alleged crime was taking photographs of the brutal attacks on peacefully protesting students and exercising his freedom of opinion in an interview to an international television channel.

It has been further reported widely in the media that numerous innocent students are being subjected to torture in police custody and remand as well as various forms of harassment and intimidation whereas those allegedly responsible for imposing violence upon a non-political and peaceful movement of the young students are enjoying impunity.

We the undersigned strongly condemn such repression by the government, including arbitrary police remand under the repressive ICT Act against him. We demand that the Government investigate allegations of unlawful arrest and torture and immediately and unconditionally facilitate Shahidul Alam's release and punish those responsible for his alleged abduction and torture. If anything he has done is considered against the law charges could be brought in the due process, but nothing justifies unlawful abduction, arbitrary remand and especially unconstitutional torture in custody. We also demand that the government stop repression of students, academics, journalists and human rights activists immediately, release all who have been arbitrarily detained and take every step to ensure road safety, freedom of speech, freedom of movement and freedom of association for all, without discrimination.

1. Dr Hameeda Hossain Email: singalipandodo@gmail.com, Human Rights Defender
2. Bashirul Haq <bha_arch@yahoo.com>, Architect
3. Dr Zafrullah Chowdhury Email: zaf.chowdhury@gmail.com, Physician and Health Rights Activist
4. Shaheen Anam Email: shaheen1anam@yahoo.com, Human Rights Defender
5. Barrister Raja Devashish Roy, Lawyer, <droywangza@gmail.com>
6. Dr Iftekhar Zaman <edtib@ti-bangladesh.org>, Executive Director, Transparency International Bangladesh
7. Dr. Badiul Alam Majumdar Email: badiulm@gmail.com, Secretary, SHUJON
8. M Hafizuddin Khan Email: m.hafizuddin.khan@gmail.com, Chairperson, SHUJON
9. Mahfuz Ullah Email: mahfuz.1950@gmail.com, Media Professional, writer, researcher & environmentalist
10. Barrister Manzoor Hasan OBE <mhasan56@yahoo.com>, Executive Director, Centre for Peace and Justice, BRAC University
11. Dr Chowdhury Abrar crabrar@gmail.com, Professor, Department of International Relations, University of Dhaka
12. Lubna Marium <kanchendzonga@gmail.com>, Artistic Director, Shadhona 13. Professor Dr Naila Z. Khan naila.z.khan@gmail.com, Paediatrician 14.Robaet Ferdous robaet.ferdous@gmail.com, Academic, University of Dhaka
15. Dr. Shahnaz Huda, shahnazhuda@yahoo.com, Professor of Law, University of Dhaka
16. Dr. Ali Riaz, ariaz@ilstu.edu, Professor of Political Science, Illinois State University, USA
17. Dr. Amena Mohsin, amenanabeel@gmail.com, Professor, Department of International Relations, University of Dhaka
18. Dr Anu Muhammad, anubd10@gmail.com, Professor, Department of Economics, Jahangimagar University,

19. Khushi Kabir, kabirkhushi210@qmail.com, Coordinator, Nijera Kori
20. Professor Dr Perween Hasan, perweenhasan@qmail.com, Vice-Chancellor, Central Women's University
21. Dr Firdous Azim, azim.firdous02@qmail.com, Professor, Department of English, BRAC University
22. Farida Akhter, kachuripana@qmail.com, Executive Director, UBINIG (Policy Research for Development Alternative)
23. Dr Elora Halim Chowdhury, Professors Chair, Women's, Gender, and Sexuality Studies Department, University of Massachusetts, USA
24. Sheepa Hafiza, Human Rights Deferfder, Ain O Shalish Kendra
25. Md. Nur Khan Iiton61@yahoo.co.uk, Human Rights Activist
26. Adilur Rahman Khan, Advocate, Supreme Court of Bangladesh, Email: adilkhan.rahman@gmail.com
27. Dr Asif Nazrul, <asifnazrul@gmail.com>, Professor, Department of Law, University of Dhaka
28. Syeda Rizwana Hasan, <rizwana1968@gmail.com>, Advocate, Supreme Court of Bangladesh
29. Dr. Sumaiya Khair, <skhair@gmail.com>, Professor, Department of Law, University of Dhaka
30. Rina Roy, rinaroyi 959@gmail.com>, Rights Activist
31. Dr. Shapan Adnan, <amsa127@gmail.com>, Economist
32. Dr Azfar Hussain, <azfarhussain1 @gmail.com>, Associate Professor, Liberal Studies/Interdisciplinary Studies, Grand Valley State University, Michigan, USA
33. ASM Nasiruddin Elan, asm.elan66@gmail.com, Human Rights Defender
34. Arup Rahee, <aruprahee@gmail.com>, Singer, Lyricist and Cultural Activist
35. Hana Shams Ahmed, Email: hana.s.ahmed@gmail.com, PhD Student, York University, Canada
36. Leesa Gazi, leesaqazi@qmail.com, Cultural Activist and Theatre Practitioner
37. Ashraf Kaiser, ashraf@tbwabenchmark.com, Journalist
38. Anusheh Anadil, anusheh.anadil@qmail.com, Musician and Cultural Activist
39. Delwar Hussain, <delwar_h@hotmail.com>, Researcher, UK
40. Ilira Dewan, <ilira.dewan@gmail.com>, Indigenous People's Rights Activist
41. Maheen Sultan, <sulthuq@bol-online.com>, Women's Rights Activist
42. Dina Siddiqi, <dmsiddiqi@gmail.com>, Academic
43. Tarek Omar Chowdhury, otc1960@gmail.com, Writer
44. Mirza Taslima Sultana, shouptikpgmail.com, Academic
45. Zakir Hossain, zhossain@agni.com, Coordinator, Nagorik Uddyog
46. Ziaur Rahman, ziaiitm@gmail.com, Lawyer
47. Nasrin Siraj Annie, nasrinsirai@yahoo.com, PhD Student and Filmmaker
48. Syed Sultan Uddin Ahmed, ssultanua@yahoo.com, Bangladesh Institute of Labour Studies
49. Dr. Tasnim Azim, azim.tasnim@gmail.com, Immunologist and Health Rights Activist
50. Dr M Muzaherul Hug, <muzahenjl@hotmail.com>, Professor of Forensic Medicine
51. Dr Seuty Sabur, <seutysabur@gmail.com>, Academic, BRAC University
52. Wasfia Nazreen, wasfia.nazreen@gmail.com, Mountaineer
53. Lamiya Morshed, <lamiya.morshed1@gmail.com>, Social Activist
54. Dina Hossain, <dinahossain1@gmail.com>, Filmmaker
55. Cynthia Farid, <cynthiafarid@gmail.com>, Advocate, Supreme Court
56. Tasaffy Hossain, <tasaffy@gmail.com>, Rights Activist
57. MasudKhan, <masud@legalcirclebd.com>, Lawyer, The Legal Circle
58. Muktasree Chakma, <junanjuni@gmail.com>, Women's Rights Activist
59. Tasmiah Afrin Mou, Filmmaker
60. Dr Elora Shehabuddin, Associate Professor of Humanities and Political Science, Rice University, Texas, USA
61. Rashad Al, Resident Senior Fellow Institute for Strategic Dialogue, UK <Ra@ISDglobal.org>
62. Enamul Hogue, Photographer / Filmmaker / Artist, UK, E-mail: info@enamul.co.uk
63. Shahadat Hossain, <shahadat.docu@gmail.com>, Filmmaker
64. Khandaker Sumon, k.m.sumon@gmail.com, Filmmaker
65. Sohini Alam, sohinialam@yahoo.com, Musician
66. Manjida Ahamed, <manjida.ahamed@gmail.com>, PhD Student, Middlesex University, London
67. Ali Ahmed Ziauddin, aliahmedziauddin@gmail.com, Freedom Fighter and Writer
68. Rezaur Rahman Lenin, rezalawreview@gmail.com, Human Rights Defender
69. Shireen P Huq, shireenhuq@gmail.com, Women's Rights Activist

খবরাখবর

- মধ্যপ্রদেশের মানড্‌লা জেলার চুটকাতে প্রস্তাবিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে চুটকা, তাঁতিঘাট ও কনুদা, তিনটি আদিবাসী গ্রাম থেকে ৬০০ টি পরিবারের উচ্ছেদ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুফল নিয়ে এন.পি.এ.আদিবাসীদের নিয়ে প্রতিবাদ করছে।
- **কন্যাশ্রীর পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ছুটের বাড়বাড়ন্ত**

জেলা	তফসিলি	জনজাতি	তফসিলি	জনজাতি
	(২০১৪-'১৫)%		(২০১৫-'১৭)%	
আলিপুরদুয়ার	৩.৪৯	১৩.০৭	১৪.৫৮	২২.০৫
বীরভূম	৫.৫১	১১.২৬	১৪.০০	১৮.৫৬
হুগলি	৫.৪৫	২.৬৮	১৪.২৩	১৭.৯৭
পূর্ব মেদিনীপুর	৩.৯৯	৩.৭৩	১০.৬৮	৬.৫১
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৬.৮৫	১৫.৯৫	১৪.৪৮	২১.৫৮

- মহারাষ্ট্রের কোঙ্কনের রত্নগিরিতে সৌদি আরবের পেট্রোকেমিক্যাল দানব 'সাউদি অ্যারামকো' ভারতীয় তেল সংস্থাগুলিকে নিয়ে সংশোধনাগার নির্মাণের বিরোধিতা করছেন কৃষক, স্থানীয় মানুষ ও পরিবেশ কর্মীরা।
- ১৭ এপ্রিলের কালবৈশাখীর দাপটে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৮ জন মানুষ মারা যান, ক্ষতিগ্রস্ত হন ৪,৫০০ জন। ১৬০৫ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, দেড় হাজারের মত গাছ ভেঙে পড়েছে।
- দেশজুড়ে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ও দলিত বিরোধী প্রচার ও কর্মকান্ডের আবহে পাঞ্জাবের ফাগোয়ারা, কপূরথালা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর এবং এম.বি.এস.নগরে বর্ণহিন্দু ও দলিতদের মধ্যে জাত দাঙ্গা শুরু হয়।
- তার 'ফুট সোলজার অফ দ্য কনস্টিটিউশন' গ্রন্থের জন্য সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদকে 'র‍্যাডিক্যাল দেশী পাবলিকেশন' ও 'ইন্ডিয়ানস্ এ ব্রড ফর প্লুরালিস্ট ইন্ডিয়া' কানাডার সারেতে সম্মাননা জানাল।
- ১৬ এপ্রিল মধ্যরাতে ওড়িশার ঝড়শুগুদা জেলায় হাওড়া মুম্বাই মেলের ধাক্কায় চারটি হাতীর মৃত্যু হল।
- ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল্ড কাস্টস্-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান পি.এল.পুনিয়া জানিয়েছেন যে চতুরতার সাথে ছত্তিশগড়ের রমন সরকার 'এস.সি/এস.টি.অ্যাক্ট'কে লঘু করে দিচ্ছে।
- আন্দামানে লবণজলের কুমীরের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় নভেম্বর'১৭ থেকে হ্যাভলক দ্বীপ, ওয়ানদুর সৈকত, করবিন কোভ সৈকত প্রভৃতিতে জলক্রীড়া বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই অঞ্চল গুলিতে বেশ কিছু কুমীর ধরা পড়েছে। ১৯৮৬-২০০৪ অবধি দু'দশকে যেখানে ২২টি কুমীরের আক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। আয়লা ঝড় ও জলোচ্ছাসে আন্দামানের বিপুল ম্যানগ্রোভ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি হয়েছে। তাই কি নিজেদের বাসস্থান ও খাদ্য হারিয়ে লবণজলের প্রাণীরা খাদ্য ও বাসস্থানের সন্ধানে মানুষের কাছাকাছি চলে আসছে?
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভারন্‌মেন্টাল স্টাডিজের গবেষকরা সেপ্টেম্বর '১৬ থেকে সেপ্টেম্বর '১৭-র মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণার বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পানীয় জল ও মিড ডে মিলের রান্নার জলের নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছেন আর্সেনিকের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার চাইতে বেশি, কোথাও ৬০ গুণ বেশি।
- আন্তর্জাতিক সোলার ইনোভেশন কাউন্সিলের বিজ্ঞানীরা এক ধরনের জ্বালানিবিহীন বালব তৈরি করেছেন (সূর্যজ্যোতি) যা অল্পসূর্যালোক সংগ্রহ করেই জ্বলবে এবং খরচ মাত্র ১০০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত পার্ব্বত্যাঞ্চল প্রভৃতিতে পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হচ্ছে।
- মার্কিন-ভারতীয় উদ্যোগপতি ভেঙ্কট শ্রীনিবাসন কৃত্রিম বুদ্ধি ভিত্তিক (এ.আই) সফটওয়ার তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে সহজে ইংরেজি লেখা যাবে এবং ভারতের আটটি রাজ্যের ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন।
- মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ছড়িয়ে থাকা ২০ লক্ষ গোন্ড উপজাতি মানুষের কথ্য ভাষাকে লিখিত অভিধান তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন 'সি জি নেট-স্বর' সংস্থা।
- উত্তরপ্রদেশের চিনিকলগুলি আখ চাষীদের টাকা দিচ্ছে না। বাকির পরিমাণ ৮,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অতীতের বুয়া-বাবুয়া সরকারের মত বর্তমান যোগী সরকারও নীরব।
- দেশজুড়ে ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ষণ, দলিত ও সংখ্যালঘু হত্যার প্রতিবাদে নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফরে ছাত্রছাত্রী সহ প্রবাসী ভারতীয়রা বিক্ষোভ দেখান। লন্ডনে আম্বেদকরপন্থী, রামদাসিয়া, বাল্মীকি, অ্যান্টি-কাস্ট ডিসক্রিমেশন এলায়েন্স, কাস্ট ওয়াচ ইউ.কে . প্রমুখ সংগঠন লন্ডনে তুমুল বিক্ষোভ দেখালে মোদি উত্তর লন্ডনের চকফার্মে আম্বেদকরের বসবাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করেন।
- অসমের লখিমপুরে দেখা মিলল অ্যাটলাস মথের। বিশ্বের সব চাইতে বড় প্রজাতির মথ। ডানা মেললে ১১ ইঞ্চি।
- দেশের সেরা পঞ্চায়েতের শিরোপা পেল দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমার দিগম্বরপুর। সারা দেশের এক হাজার মডেল পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রকল্প তৈরি এবং তার রূপায়ণ ও টাকা খরচের দক্ষতার জন্য পাথর প্রতিমার দিগম্বরপুর প্রথম হয়েছে। পিছনে ফেলেছে কর্ণাটক ও সিকিমকে।
- আলাদা গোর্খাল্যান্ডের দাবি জোরদার করতে দেশবিদেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা গোর্খাদের একজোট হওয়ার ডাক দিল 'ন্যাশনাল গোর্খাল্যান্ড কমিটি'। ২১ এপ্রিল দার্জিলিঙের গোর্খা দুঃখ নিবারণী সমিতির হলে এক অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সেনা জেনারেল শক্তি গুরুং এর নেতৃত্বে ফের আলাদা রাজ্যের দাবি তোলা হয়। প্রকাশ করা হয় দার্জিলিঙ পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স নিয়ে প্রস্তাবিত গোর্খাল্যান্ডের মানচিত্র।
- পেট্রপন্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেস, বাম সহ বিরোধী দলগুলি ১০ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধ পালন করল।

➤ কেরলে এক ক্যাথলিক চার্চে বিশপের দ্বারা এক সন্ন্যাসিনীর বারংবার ধর্ষণের ঘটনা উঠে আসার পরও প্রভাবশালী চার্চ এবং পুলিশ-প্রশাসন-রাজনীতিকদের একাংশ ঐ ধর্ষিতা সন্ন্যাসিনীকেই মানসিক নির্যাতন করায় ব্যাপক জনবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে কেরলের আরেকটি চার্চে কুয়োর মধ্যে পাওয়া গেছে রক্তাক্ত এক সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ। আয়ারল্যান্ড, জার্মানী সহ বিভিন্ন দেশে চার্চের মধ্যে সন্ন্যাসীদের দ্বারা শিশু, নারী ও নানদের একের পর এক যৌন নির্যাতনের বিস্তৃত ইতিহাস বেরিয়ে আসায় ভ্যাটিকান বিড়ম্বনায় পড়েছে। দেখা যাচ্ছে সব ধর্মেই বাবা রাম রহিম, আশারাম বাপু, রজনীশদের সংখ্যা প্রচুর।

➤ পোলিওর পর এবার দেশকে ২০২০ সালের মধ্যে হাম ও রুবেলা মুক্ত করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর ও ইউনিসেফ নয় মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী ৪১ কোটি ভারতীয় শিশুকে একটি হাম ও রুবেলা টীকা একসাথে দেওয়ার কর্মসূচী নিয়েছে।

পোস্তার পর মাঝেরহাট ব্রীজ ভাঙ্গা আরেকটি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের জ্বলন্ত উদারণ

➤ জনপ্রিয় মহল্লা ক্লিনিক নির্মাণ, গরীব বস্তী ও ঝুপড়িবাসীদের পাট্টা দান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে যথাক্রমে ২৩% ও ১৩% জিডিপি বরাদ্দ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পরিবেশ আমূল পাল্টে ফেলার পর অরবিন্দ কেজরিয়ালের নেতৃত্ব দিল্লীর আপ সরকার দিল্লীবাসীর ঘরে গিয়ে সামান্য খরচে ঝঞ্ঝাটমুক্ত ভাবে ৪০টি প্রয়োজনীয় সরকারি নথি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

➤ বাংলাদেশ ও ভারতের সাঁওতালদের যৌথ প্রচেষ্টার আগষ্ট '১৮ থেকে উইকিপিডিয়া ফাউণ্ডেশন 'সাঁওতালি উইকিপিডিয়া' চালু করল।

➤ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে চালু হল 'এইচ আই ভি এইডস্ (প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৭

দুর্গাপুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ডি.এ.পাচ্ছেন না। রাজ্যের কর ও সেস সহ পেট্রোপণ্যের মূল্য আকাশ ছোঁয়া। রাজ্যের ব্রীজ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কলেজ, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বেহাল। এখন আর লন্ডন, গোয়া, সুইজারল্যান্ড, দ: আফ্রিকা করার কথা শোনা যায় না। কয়েক বছরের মধ্যে রাস্তার মোড়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত কোঁকাচ্ছে। মাত্র তিন কোটি টাকার অভাবে মাঝেরহাটের মত গুরুত্বপূর্ণ সেতু বছরের পর বছর সারাই না হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। মারা যান পুস্তকপ্রেমী সৌমেন বাগ ও কয়েকজন শ্রমিক। হতাহতের পাশাপাশি মেট্রোর কাজ বন্ধ হয় যায়, ধাক্কা খায় পরিবহন ও বন্দর পরিষেবা। কলকাতা ও দ: ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ অভাবনীয় দুর্ভোগের শিকার হন।

তাতে কি যায় আসে। এসেছে শরৎ, বাঙালীর পুজো। আসছে ভোট। রয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের বিচরণভূমি পাড়ার ক্লাব। তাই এই পুজো আর ক্লাবের মিশেলটা চমৎকারভাবে বুঝতে পেরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি দলীয় মঞ্চ থেকে আপনার-আমার অর্থ থেকে প্রায় ২৫ হাজার ক্লাবকে পুজো উদযাপন করতে ২৮ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। তার সাথে লাইসেন্স ফি মকুব, বিদ্যুতে ছাড় ২৩%। সত্যিই এগিয়ে বাংলা!

প্রাপ্তিস্থান :

● পাতিরাম, ঠিকঠিকানা, বুক মার্ক, একুশে, পিপলস্ বুক সোসাইটি, বইচিত্র, ধ্যানবিন্দু, পাভলভ ইনস্টিটিউট, মনীষা; কলেজস্ট্রীট ● এস.কে.বুকস্; উল্টোডাঙ্গা ● বইওয়ালা; যাদবপুর ● প্রগ্রেসিভ বুক স্টল; রাসবিহারী ● কোলে বুক স্টল; বি.বা.দি.বাগ ● ঘুম নেই; সরসুনা ● পশ্চিমবঙ্গ গণসাংস্কৃতিক পরিষদ; ক্রীক রো ● ফামা; বেলেঘাটা ● নাগরিক মঞ্চ; আনন্দপুর, কলকাতা ● দেবাঞ্জলি; মাথাভাঙ্গা ● গণবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা; কোচবিহার ● সুমন গোস্বামী; আলিপুর দুয়ার কোর্ট ● জাতিশ্বর ভারতী, লার্নি পয়েন্ট, ওরিয়েন্টাল বুক স্টল; জলপাইগুড়ি ● দি বুকস্, হাকিমপাড়া; শিলিগুড়ি ● ধানসিড়ি, মোহনবাটি; রায়গঞ্জ ● অন্নপূর্ণা, বুকল্যাণ্ডস; বালুরঘাট ● রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়; গঙ্গারামপুর ● রূপান্তরের পথে; মালদা ● বিশ্বাস বুক স্টল; বহরমপুর ● কোরাস নাট্য গোষ্ঠী; কান্দী ● পত্রিকালয়, ম্যাগাজিন কর্ণার; সিউড়ি ● সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন ● শ্যাম বুক স্টল; আসানসোল ● জয়া বুক স্টল, বি জোন; দুর্গাপুর ● খোয়াই, সাহিত্য পরিষদ, অপুর স্টল; বর্ধমান ● প্রয়াস মল্লভূম, লোকপুর; বাঁকুড়া ● হংসরাজ; বিষ্ণুপুর ● দি বুক হাউস; কৃষ্ণনগর ● কপি সেন্টার; রাণাঘাট ● বিশুদার বুক স্টল; চাকদা স্টেশন ● বিজ্ঞানের দরবার; কাঁচড়াপাড়া ● সনৎ রায় চৌধুরী, ফুলপুকুর; চুঁচুড়া ● রেলওয়ে স্টেশন বুক স্টল,শ্রীরামপুর, বারাসাত, খড়দহ, সোনারপুর, উলুবেড়িয়া ● সরস্বতী বুক স্টল; নৈহাটী ● বাণীবিতান, ডায়মণ্ডহারবার ● যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা; ক্যানিং ● শ্রমজীবী হাসপাতাল; বেলুড়, সরবেরিয়া, শ্রীরামপুর, কোপাই, উখরা ও ব্যারাকপুর ● ভালোপাহাড়, বান্দোয়ান; পুরুলিয়া ● শ্যামল ভট্টাচার্য্য, অখাউড়া; আগরতলা ● রোশনি; জামসেদপুর ● লিটল ম্যাগাজিন মেলা ● লিটল ম্যাগাজিন হাট, রাণু ছায়া মঞ্চ, অকাদেমী চত্বর, প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবার।

কার্টুনের দুনিয়ায়

You guys in Berlin had a terrific wall

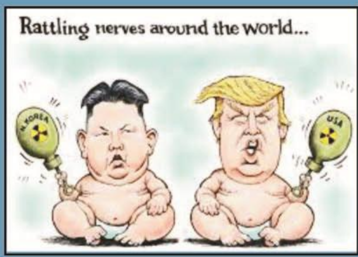
Rattling nerves around the world...

MAKE AMERICA GRATE
(it's Teeth)

USA

OPENING PARTNERSHIP...

BUT DIDI, I HAVE BATTED ALL MY LIFE, LEFT HANDED!
NO MARX NO LEFT IN POSCHIM BONGO

PM CHOWK
NAMO CHAI
RAHUL DOODH
AMMA IDLI SAMBAAR
ANNA-DIDI KHICHDI

CORRUPTION FREE INDIA
CLEAN INDIA

বিশ্বকাপ ফুটবল, এশিয়াড ....

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে অরণি সেন কর্তৃক ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন ২৫২৬৫০৫০ থেকে মুদ্রিত

e-mail : ssunnayan@gmail.com || Website : www.ssu2011.com

₹ ৩০